স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ

সংকলন ও সম্পাদনা

অভিজিৎ সেন   অভিজিৎ ভট্টাচার্য

বিকল্প

বিকল্প প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৪। মার্চ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক : দময়ন্তী বসু সিং। বিকল্প প্রকাশনী
১ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

হরফবিন্যাস : পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রণ : বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্য ক্রিয়েশন
২৪বি/১বি ড. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৪



সূচিপত্র

সংকলন প্রসঙ্গে

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবন্ধের কোনো সংকলন এতদিন কেন প্রকাশিত হয়নি সেটা আমাদের কাছে একটা বিস্ময় ছিল। নিজেরা যখন একটা সংকলন গ্রন্থের কথা ভাবছিলাম সেই সময়ই বিকল্প প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীমতী দময়ন্তী বসু সিং বইটি ছাপাবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই সংকলনটির প্রকাশ সম্ভব হল। মুদ্রণের ব্যাপারে অনেক পরিশ্রম করেছেন শ্রী কার্তিক জানা। তাঁর প্রতি রইল সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। কিছু লেখার ফটোকপি আমরা পেয়েছি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর আরকাইভের মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ থেকে। ছিন্নপ্রায় ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা থেকে হাতে কপি করার পরিশ্রমের এতে অনেকটা লাঘব হয়েছে।

যোগ্যতর সম্পাদকের হাতে পড়লে হয়ত এই বইটির শ্রী-বৃদ্ধি হতো। তবে এই প্রথমবার স্বর্ণকুমারী দেবীর নানা-বিষয়িণী প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ভবিষ্যতে হয়ত অন্য কেউ স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধ-সমগ্র প্রকাশে আগ্রহী হবেন—এটাই আমাদের আশা।

বর্তমান সংকলনে আমরা মূল বানান অক্ষুণ্ণ রেখেছি, শুধুমাত্র কোনো কোনো জায়গায় লেখিকা-ব্যবহৃত যতিচিহ্নে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধের সঙ্গে মূল রেখাচিত্র রাখা সম্ভবপর হল না, আমাদের ধারণা মূল রচনাপাঠের রসাস্বাদনে এর ফলে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। সম্পাদকদ্বয়ের অক্ষমতা ও অনবধানজনিত কিছু ত্রুটি থেকে গেল, কোনো মনোযোগী পাঠক সে-ব্যাপারে তাঁর সহৃদয় মতামত জানালে আমরা বাধিত হবো।

কলকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮

অভিজিৎ সেন
অভিজিৎ ভট্টাচার্য

স্বর্ণকুমারী ও তাঁর সময়

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারীর জন্ম আনুমানিক ১৮৫৫ সালে। শিক্ষা—ঠাকুর পরিবারের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিধি মেনে, গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে—এবং বিবাহোত্তর কালে বোম্বাইয়ে দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে থেকে। শৈশবের শিক্ষককুলের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বেদজ্ঞ পন্ডিত ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সুদীর্ঘকালের সম্পাদক অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, যাঁর কাছে জ্ঞানদানন্দিনী সহ ঠাকুর পরিবারের শিশুকন্যা ও পুত্রবধূরা পড়তেন সংস্কৃত, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠ নিতেন বাঙলা সাহিত্যের এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে পরিচয় ঘটে ইংরাজী সাহিত্যের। বিবাহ—১৮৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে, যিনি তখন রামতনু লাহিড়ীর উদ্দীপনায় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে পিতা জয়চন্দ্র ঘোষাল-কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত। পরবর্তী সময়ে জানকীনাথ পেশায় হয়ে ওঠেন একজন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু থেকে তার অন্যতম কর্ণধার। বিয়ের সময়ে স্বর্ণকুমারীর বয়স ছিল ১৩ বছর এবং জানকীনাথের ২৭। বিয়ের একবছরের মধ্যে প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ীর জন্ম, ১৮৬৮-তে, ১৮৭১-এ জন্ম জ্যোৎস্নানাথের, ১৮৭২-এ সরলা এবং ১৮৭৪-এ সর্বকনিষ্ঠা উর্মিলা, সে মাত্র ছয় বছর বয়সে ১৮৮০ সালে মারা যায় এবং জানকীনাথকে বিলেতে আইনের পাঠ অসমাপ্ত রেখে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। এর পরে ১৮৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ। ১৮৮৬-তে 'সখি-সমিতি' এবং মহিলা শিল্পমেলার পত্তন, ১৮৯০-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে স্বর্ণকুমারীর যোগদান।[১]

এইসব ঘটনা পরম্পরায় লেখক স্বর্ণকুমারীর আত্মপ্রকাশ, যার সূচনা তাঁর শৈশবেই। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে প্রকাশ, শৈশবে অন্তঃপুরশিক্ষার সময়েই স্বর্ণকুমারী মাঝেমধ্যেই একটা দুটো গল্প-কবিতা লিখে দেখাতে যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। পরবর্তীকালে জানকীনাথ ঘোষালের উৎসাহে এবং বিবাহোত্তর কালে বোম্বাই বাসের সময়ে ইংরাজী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধিলাভে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যচর্চার সূচনা। যদিও তাঁর সেই লেখক হিসেবে পরিচিতি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সুখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মতন প্রশ্নাতীত ছিল না। বরং গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কখনোই 'সাধারণ'-এর সীমা লঙ্ঘন করতে পারেননি। যদিও তাঁর উপন্যাস 'কাহাকে?'-র ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদ *An Unfinished Song*-এর বিক্রয়সংখ্যা তার এই 'সাধারণ' পরিচিতির সঙ্গে মেলে না। তবে এই বিক্রি কতটা সাহিত্যগুণের জন্য আর কতটা 'an Indian

lady' পরিচিতির জন্য তা আজ বোঝা দুষ্কর। তবে এই অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিরক্ত ছিলেন, তিনি মনে করতেন স্বর্ণকুমারী তাঁর 'ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন', অর্থাৎ ঠাকুর পরিবারের 'নাম ডোবাচ্ছেন' আর কি ![২]

রবীন্দ্রনাথ যাই মনে করুন, বা স্বর্ণকুমারীর বইয়ের এদেশে বা বিদেশে বিক্রিসংখ্যা যাই হোক না কেন, তাঁর গল্প, উপন্যাস বা কবিতা কোনোদিনই তাঁকে একজন 'প্রতিভাধর' সাহিত্যিক পরিচিতি এনে দেয়নি। আর ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। উনিশ শতকে 'আধুনিকতা'র বিকাশের পর্যায়ের মধ্যে উদ্ভূত জ্ঞানচর্চার প্রায় সব শাখাতেই [এর পরে এক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন (discipline) শব্দটি ব্যবহার করা হবে, কারণ, 'শাখা' শব্দটি discipline-এর উপযুক্ত পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়] পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। কোন বিষয়ে না লিখেছেন স্বর্ণকুমারী— বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে গিয়ে চলে গেছেন নৃতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে ; অথচ এর কোনো বিষয়েই তাঁর কোনো বৈধ প্রশিক্ষণ ছিল না। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি পড়লে কিন্তু মনে হয় কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানবিদেরই লেখা। একই কথা নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁর লেখা অন্তত ৭০টি প্রবন্ধ, যা 'ভারতী'-সহ সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি লেখক স্বর্ণকুমারীর বহুধাবিভক্ত প্রতিভা, বা বলা ভালো, আবেগতাড়িত জ্ঞানচর্চার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ এই ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে একজন বঙ্গমহিলার সামাজিক অবস্থান ও অবদানের সাক্ষ্য বহন করে। আর সেই অবস্থানকে খতিয়ে দেখার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধগুলির মাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা নিয়ে এই সংকলন।

২

স্বর্ণকুমারীর লেখক পরিচিতি এবং বিষয় নির্বাচনের পশ্চাদপট অনুসন্ধান করতে হলে তৎকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা এবং সেই সমাজে স্বর্ণকুমারীর অবস্থান, দুটোকেই খতিয়ে দেখতে হবে। উনিশ শতকের বাঙলা তথাকথিত 'নবজাগরণ' এবং 'আধুনিকতার' বিস্তারের কাল। উপনিবেশের বিস্তার যেহেতু শুরু হয়েছিল বাঙলা থেকে, সেইজন্য—'নবজাগরণ', 'আধুনিকতা' এসব শব্দগুলির পুনঃপুনঃ প্রয়োগ এবং প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালের সঙ্গে উপনিবেশের ভেদরেখা টেনে ভালো/খারাপ, বর্বরোচিত/সভ্য এসব বিপরীত পদের ব্যবহার এবং তার প্রতি অটল বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে উনিশ শতকের প্রথমভাগেই বাঙলার পরিচিতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

বাঙলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং তার সঙ্গে ছাপাখানা, মিশনারী শিক্ষা এবং পরে ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষা, এইসব মিলে বাঙলায় 'আধুনিক' সংস্কৃতির সূচনা। কোম্পানির ক্ষমতা দখলের দুই দশকের মধ্যে ১৭৭৮ সালে চার্লস্ উইলকিন্‌স্ এবং পঞ্চানন কর্মকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বাঙলা হরফ বিন্যাস সম্ভব হলে বাঙলা ছাপার পথ খুলে যায়। সেই বিশেষ ঘটনাকে বাঙলায় আধুনিকতার সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে বা হয়ে থাকে।[৩] এর পরে ১৮০০ সালে

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, তারপরে একে একে হিন্দু স্কুল, স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) এবং স্কুল সোস'ইটি (১৮১৮)—এসবের মধ্য দিয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে 'আধুনিক', 'বিজ্ঞান-সম্মত' এবং 'উপযোগিতাবাদী' শিক্ষাব্যবস্থা, বাঙলা ও বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার পথ ও পরিমিতি নির্ধারণ করে দেয়।

বিজ্ঞানশিক্ষা ও তার বিস্তার

একদিকে ইউরোপীয় মিশনারী ও অন্যদিকে কোম্পানির সরকারের প্রচেষ্টায় নূতন শিক্ষাব্যবস্থার শুরুতেই বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বেশি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল 'হিন্দুসমাজের মধ্যেকার কুসংস্কার দূর করা' এবং 'এদেশীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনন ও বিচারশক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করা'। এ ব্যাপারে গোড়াতেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন। মিশন থেকে ছাপানো বাঙলা বইয়ের অনেকটা জুড়েই ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক বই। পরে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয় স্কুল বুক সোসাইটি। কিন্তু ১৮১৮ পর্যন্ত এই সমস্ত উদ্যোগই প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বাঁধা-ধরা গণ্ডির বাইরে বিশেষ বেরোতে পারেনি। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে, জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিকপত্র 'দিগ্‌দর্শন', যাতে বাঙলা ভাষায় প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করা হয়। স্কুল বুক সোসাইটির পাঠক্রমের বাইরে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের প্রয়াস এখান থেকেই শুরু হয়। আর তখন থেকেই সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রগুলি সাধারণ বাঙালি পাঠকদের মধ্যে 'আধুনিক' বৈজ্ঞানিক মনন এবং যুক্তিনির্ভর বিচারশক্তির বিকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়।[৪]

এই বিজ্ঞান-জনপ্রিয়করণের প্রথম পর্যায়ে কাগজগুলোর ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র পশ্চিম থেকে আমদানি করা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য পরিবেশন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ক্রমে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের উদ্যোগে তার দেশীয়করণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। গোড়াতেই, রামমোহন রায়ের, ধর্মীয়-সামাজিক অবস্থার যুক্তিনির্ভর 'ব্যাখান'-এর প্রচেষ্টা এবং তারপরে ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক প্রচারিত 'ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধানের জন্য পদার্থবিদ্যা পাঠ'-এর আবশ্যিকতার তত্ত্ব, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার দেশীয়করণের রাস্তাই শুধুমাত্র প্রশস্ত করে না, তা পশ্চিমের নির্ভেজাল অনুকৃতির অভিযোগের কবল থেকেও তাকে কিছুটা মুক্ত করে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন গুপ্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাঙলায় বিজ্ঞানচর্চার শুরুতে পরিভাষা নিয়ে যে জটিল সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল, তারও কিছুটা সুরাহা হয়। যদিও মেকলের তত্ত্ব-মোতাবেক অধিকাংশ বাঙালী বুদ্ধিজীবিই মনে করতেন, বাঙলা ভাষা যে কোনো জ্ঞানচর্চার পক্ষেই উপযুক্ত নয়। তবুও তাঁদেরই এক অংশ সেই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৮৫১ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটির পরিকাঠামোর বাইরে বাঙলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা চালু রাখার জন্য তৈরি হয় ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি। এই কমিটি প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে (১৮২২-৯১) দায়িত্ব

দেয় এমন একটি পত্রিকা প্রকাশ করার যাতে খ্রিষ্টিয় জ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডলের বাইরে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে সক্ষম হবে। সেই সূত্র ধরে একই বছরে প্রকাশ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার। যার প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধে স্পষ্ট করে বলা হয়, শুধুমাত্র *বিদ্বজ্জন ছাড়াও সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত মানুষ এবং শিশুদের বোধগম্য এমন রচনা* এতে প্রকাশিত হবে, যাতে আধুনিক 'ডিসিপ্লিন' সম্পর্কে সকলেই অবহিত হতে পারে এবং এর সমস্ত শাখাতেই জ্ঞানচর্চা করতে পারে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর প্রকাশ বিজ্ঞান সহ 'আধুনিক' জ্ঞানচর্চার সমস্ত ডিসিপ্লিনের জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টার এক বিশেষ মুহূর্ত। রাজেন্দ্রলাল 'কমিটি'-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণাপত্রের সবকিছুই মেনেছিলেন, শুধুমাত্র একটি ছাড়া ; কমিটির প্রথম মিটিঙের প্রস্তাব ছিল ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চার বিবিধ শাখার অনুবাদ প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল শুধুমাত্র অনুবাদের মধ্যে তাকে সীমিত রাখেননি ; পরিবর্তে, এই পত্রিকায় তিনি ঘটিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানের দেশীয়করণ। সে নৃতত্ত্ব, সঙ্গীতবিজ্ঞান বা ভূগোলচর্চা যে শাখাতেই হোক না কেন। উপনিবেশে 'আধুনিক' জ্ঞানচর্চার রীতিনীতি এবং তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—দেশীয়করণের প্রচেষ্টা এবং ডিসিপ্লিনের উদ্ভব—এ-সবই এই পত্রিকা থেকে সুন্দরভাবে ধরা যায়।[৫]

'বিবিধার্থে'র আগেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যা ফ্রোনোলজিস্ট জর্জ কোম্ব-এর প্রবন্ধ 'Essay on Constitution of Man'-এর অনুকৃতি। কিন্তু দেশীয়করণের ফলে তা হয়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ। জ্ঞানচর্চায় দেশীয়করণের এইসব রীতিনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল', প্রথমে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়ে পরে ১৮৫৪ সালে পুস্তকাকারে ছাপা হয়। Physical Geography এদেশে সম্পূর্ণ নূতন শাখা, রাজেন্দ্রলাল স্বভাবতই তাঁর রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন ইউরোপের ভূগোল চর্চার ডিসিপ্লিন থেকে। কিন্তু 'প্রাকৃত ভূগোল'-এ সমস্ত স্থানিক বর্ণনা এবং আশপাশ থেকে উদাহরণ চয়ন করে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণভাবেই দেশজ।

বিজ্ঞানচর্চার এই ক্রম ধরেই ১৮৭০-এর গোড়া থেকে প্রচুর পত্রপত্রিকা দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা শুরু করে। ক্রমে দেশীয় বিজ্ঞানচর্চার প্রশ্নটিও জড়িয়ে পরে, সেই সূত্র ধরে আয়ুর্বেদের মতন সম্পূর্ণ এদেশীয় বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়ে যায়। যাতে একদিকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, আবার অন্যদিকে দেশীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে 'প্রাচ্যবাদী' তত্ত্ব এবং হিন্দুত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে পরে আরো বৃহত্তর ও জটিল এক সমস্যাপট সৃষ্টি করে। তবে, নিছক জ্ঞানচর্চাই হোক, আর হিন্দুত্ব বা প্রাচ্যবাদের ধ্বজা তোলার জন্যই হোক, শ্রীরামপুর মিশন, রাজেন্দ্রলাল প্রমুখ থেকে যার সূত্রপাত, সেই দেশীয় ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চার ধারা বিশ শতকের 'জাতীয়তাবাদী' আন্দোলনের সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

স্ত্রীশিক্ষা এবং মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন

বাঙলায় 'আধুনিকতা'র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের যে বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে তার মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্তঃপুরে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন অন্যতম। রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণের প্রচেষ্টা এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনদের বহুবিবাহ রোধ এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে উদ্যোগ ঔপনিবেশিক বাঙলায় পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ পরিবর্তন এবং দ্বন্দ্বের সূচনা করে। মনু-প্রবর্তিত অনড় হিন্দু সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল গোঁড়া হিন্দুদের কাছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো সংস্কারের কথা বিবেচনাও হিন্দুসমাজের প্রতি আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। শাসকপক্ষের সমর্থনে সতীদাহর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ যাও-বা সহজ হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত সহবাস সম্মতি বিধি-র প্রশ্নে রক্ষণশীলরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'সমাচার চন্দ্রিকা', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সহ রক্ষণশীলদের প্রতিনিধিস্থানীয় কাগজপত্রগুলো এসব সংস্কারের প্রশ্নে সমালোচনা-মুখর হয়ে ওঠে। যাই হোক, ১৮৬০-এর দশক পর্যন্ত এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাসটা আমাদের জানা, এবং এও জানা, সরকারি-অনুমোদনের পক্ষে, আদতে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থীদের মধ্যে সংঘাতে শেষ অবধি সংস্কারপন্থীদেরই জয় হল। আপাতত অন্য সমস্ত বিষয়গুলিকে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি দেখা যাক।

উপনিবেশের পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই মিশনারীরা এদেশের মেয়েদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হলেও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে তাদের সেই প্রচেষ্টা কিছুমাত্র সফল হয়নি। ১৮৩০-এর পর থেকে ঔপনিবেশিক 'আধুনিকতা'য় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের 'অগ্রণী' অংশের প্রচেষ্টায় এবং তারপরে, ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। 'আধুনিকতা'-উদ্ভূত দ্রুত পরিবর্তনশীল পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পরে। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ১৮৪৬ সালে বারাসতে প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হয়, কিন্তু সেই স্কুল বেশিদিন চলেনি। এরপরে ১৮৪৯ সালে কলকাতায় তৈরী হয় বেথুন স্কুল,[৬] এর পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে সরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতা ও মফস্বলে বহুসংখ্যক স্ত্রী-শিক্ষায়তন তৈরী হয়। ১৮৭০-এর মধ্যে মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়াটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হিসেবে আর চিহ্নিত হতে থাকে না, অথচ ১৮৪৯-৫০ সালেই তা ছিল সমালোচনা ও ক্যারিকেচারের বিষয়।[৭]

উপনিবেশের মধ্যে উদ্ভূত 'আধুনিক' পরিবারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে পারিবারিক ব্যবস্থার উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের জন্যই মূলত স্ত্রীশিক্ষা চালু হয়েছিল। যার মধ্যে উচ্চশিক্ষা বা পেশাগত শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। শুধুমাত্র লিখতে-পড়তে জানা, হিসেব রাখা আর সন্তান-পালনের স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন—এই ছিল স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সংস্কারকদের প্রাথমিক প্রচার। কিন্তু ২০/৩০ বছরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকলো, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ এবং বিশেষ করে চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্নাতক হওয়া এবং কাদম্বিনীর

চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নতুন একটা সমস্যা তৈরী করল। কিন্তু সে সমস্যার সমাধানও হয়েছিল খুব সহজে—। সে-কথায় পরে আসছি।

স্ত্রীশিক্ষার গোড়া থেকেই তার বিরুদ্ধাচরণও যেমন ছিল, তেমনি সংস্কারপন্থীদের নিজেদের মধ্যেও ছিল বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রচারক ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ তারাও মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বা পেশাগত শিক্ষায় ঢুকতে দিতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ছিল। সমাজসংস্কারকদের অগ্রগণ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি থেকে একমাত্র তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনীকে ১৮৫১ সালে বেথুন স্কুলে ছাত্রীর অভাবপূরণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার পরে সেই প্রজন্মের কোনো মেয়ে আর স্কুলে যায়নি। সংস্কারকদের এত প্রচার সত্ত্বেও ২০ বছরেও বেথুন স্কুলের উন্নতি কিছুমাত্র হয়নি, ১৮৭১-৭২-এর Public Instruction-এর *Report*-এ দেখা যাচ্ছে বেথুন স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা কমছে এবং মেয়েরা শুধুমাত্র বাঙলা ভাষাও বিশেষ ভালো শিখছে না, সেই *Report*-এ স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ মেয়েদের অন্তঃপুরচারিকার দুরবস্থা ঘুচিয়ে তাদের শিক্ষা এবং সামাজিক মেলামেশার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেও তা নিঃশর্ত ছিল না। সমাজের বাইরে মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে ব্রাহ্ম-সংস্কারকরা যথেষ্ট কুণ্ঠাবোধ করতেন। আসলে ব্রাহ্মসমাজ মেয়েদের জন্য 'সর্বশ্রেষ্ঠ' যে ব্যবস্থাটা করেছিল, তা হল কাপড় পড়ার কায়দা পাল্টানো, মেয়েদের পড়াশুনার সঙ্গে বৈধব্য-যোগের সংস্কার থেকে মুক্ত করা আর ব্রাহ্মসমাজ নামক এক বৃহত্তর পরিবারের মধ্যে তার মেলামেশার জায়গা করে দেওয়া। প্রাক্-ঔপনিবেশিক অবস্থার তুলনায় এই অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রগতির সূচক, কিন্তু তা কখনোই 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' নয়—কিন্তু এই অবস্থাকেই 'স্ত্রী স্বাধীনতা' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা এবং এখান থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব আর এক নতুন ও জটিল সমস্যাপটের সৃষ্টি করেছিল।

মেয়েদের ইস্কুলে পাঠানো নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদের একটা নিষ্পত্তি করেন কেশবচন্দ্র সেন, ১৮৬৪ সালে তাঁর অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করে। ১৮৬৬ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে 'বামাবোধিনী সভা'।[৮] এর মধ্যে সমাজজীবনে বিবিধ পরিবর্তনের ফলে অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারটা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক 'উদারপন্থী'রও মনে ধরে। একদিকে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা; অন্যদিকে অন্তঃপুর শিক্ষা—এই দুয়ে মিলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমাগত শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর তার সঙ্গে বাড়তে থাকে বিবিধ ধরনের দ্বন্দ্ব।

স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রচারক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩-১৯২২) এই টানাপোড়েনের সবচেয়ে বড় দলিল। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে বিবিধ কারণ দর্শানো এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগের সঙ্গে এই কাগজে বেশীবেশী গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে মেয়েদের নীতিশিক্ষার উপরে। সেই নীতিশিক্ষার মূল বিষয়গুলি ছিল 'পতিভক্তি'; পরিবারের প্রতি 'একনিষ্ঠতা' এবং ধর্মাচরণ। তার সঙ্গে পশ্চিম থেকে পাওয়া টুকরো টুকরো এবং বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে 'স্ত্রী-স্বাধীনতার' ফলে, মেয়েদের 'নৈতিক অবক্ষয়'-বিষয়ক গল্প ফেঁদে শিক্ষার্থিনীদের 'সতর্ক' করাও ছিল এই কাগজের প্রধান

উদ্দেশ্য। আসলে সংস্কারকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং পারিবারিক ক্ষমতার স্তরবিন্যাসকে বিন্দুমাত্র না টলিয়ে, 'আধুনিক' সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং আধুনিক পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা। এ ছাড়াও, উপনিবেশ-উদ্ভূত নতুন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'-শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত 'ভদ্রমহিলা' গড়ে তোলাও এই উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে ; এবং সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার পত্তন, বিস্তার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সবকিছু ঘটেছিল এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক কালেও ঘটে চলেছে।

প্রাথমিক অবস্থায় মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সে ভূমিকাকেও স্বীকার করতে হল। কিন্তু তার মধ্যেও স্পষ্ট বিভেদ-রেখা টেনে দেওয়া হয়। মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকাকে কখনোই মূল সামাজিক উৎপাদক শক্তির অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি, পরিবারের মূল প্রতিপালক পুরুষের সাহায্যের জন্য সহায়ক-উপার্জনকারী হিসেবে তাদের দেখা হয়েছে। উৎপাদকের ভূমিকাকে অস্বীকার করে, শুধুমাত্র প্রান্তিক-উপার্জনকারী হিসেবে মেয়েদের চিহ্নিত করার পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক চালটি ১৮৯০-এর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর অনেক আগেই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচারিত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৬) বইটিতে, ভালো মেয়ে সুশীলার অন্যান্য 'গুণে'র মধ্যে দেখানো হয়েছিল, ঘরে বসে সুদের ব্যবসা করে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি করা। ১৮৯০-এর মধ্যে কিছু মেয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়। এর বেশ কিছু আগে থেকেই অনেকে জেনানা স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতেন, কিন্তু তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। মেয়েদের ভূমিকার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাঙলায় পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার যুক্তিগুলোর পুনর্বিন্যাস করে, উপার্জনকারী মেয়েদের সমাজে ও পরিবারে নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে দেয়। ১৮৮৩-৮৪ (ব. ১২৯০) সালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মেয়েদের উপার্জনকারী (আবারও, সামাজিক উৎপাদনকারী নয়) ভূমিকার পক্ষে ওকালতি করা হয়।[৯] এক্ষেত্রেও যুক্তিবিন্যাস একই রয়েছে—'আধুনিক পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় পুরুষের পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বভার লাঘবের জন্য মেয়েদের উপার্জকের ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন।' এর পর থেকেই, মেয়েদের শিল্পশিক্ষা এবং অর্থকরী ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে অনেক যুক্তি আরোপ করা হয়, যা স্ত্রীশিক্ষার প্রথম অবস্থার শর্তের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিকতায় কোথায়ও একটুও চিড় ধরে না। আর তারপরে 'জাতীয়তাবাদে'র সঙ্গে মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যকে জুড়ে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় শহুরে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পারিবারিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার এবং তার মধ্যে মেয়েদের ভূমিকার ও ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস করেও নিজের ক্ষমতা বজায় তো রাখেই, বরং 'আধুনিকে'র ছোঁয়ায় শুধুমাত্র সামাজিক নিয়মকানুন বা অভ্যাসের বদলে তার একটা শক্তপোক্ত তাত্ত্বিক পরিকাঠামো তৈরি করে নেয়।[১০]

৩

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পরে এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' বিধিবদ্ধকরণের নয় বছর আগে স্বর্ণকুমারীর জন্ম, তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, শহর কলকাতার মুষ্টিমেয় অভিজাত পরিবারের মধ্যে অন্যতম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। হিন্দুসমাজের পালে সংস্কারের হাওয়া লাগার শুরুতেই নীতিগতভাবে যাঁরা সেই সংস্কারের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সেই 'সংস্কারে'র প্রশ্নেই হিন্দুসমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন তিনি। দেবেন্দ্রনাথের বাবা দ্বারকানাথের সময় থেকেই সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তিতে ঠাকুর পরিবার কলকাতায় সবচেয়ে ক্ষমতাবান পরিবারগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়। এহেন পরিবারের প্রবল প্রতিপত্তির সময়ে স্বর্ণকুমারীর জন্ম। যে পরিবারের চার-দেওয়ালের মধ্যেকার ঘটনা নিয়ে সাধারণের কৌতূহলের শেষ ছিল না, সেই পরিবারের অনেককিছুই সংস্কারকদের কাছে ছিল অনুকরণীয়, আর গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিল তীব্র সমালোচনার বিষয়।

স্বর্ণকুমারীর শৈশবে ঠাকুর পরিবারের ভেতরে অন্তঃপুর-শিক্ষা পুরোমাত্রায় চালু হয়ে গেছে। এ-কথাও অনস্বীকার্য, দেবেন্দ্রনাথের উদারনৈতিকতা এবং পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে মেয়েদের পড়াশুনার তালিকার মধ্যে তৎকালীন আধুনিক সমস্ত ডিসিপ্লিনই ছিল, যা তখন প্রতিষ্ঠানগত বা অন্যান্য অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল প্রায় বিরল। ঠাকুর পরিবারের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি।

স্বর্ণকুমারীর প্রধান দুই অবলম্বন এবং অনুপ্রেরণা—একদিকে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। স্বর্ণকুমারীর স্মৃতিচারণে[১১] বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথের কথা বারবার ফিরে আসে। তাঁর মতে প্রকৃত 'স্ত্রী-স্বাধীনতার' পথ সত্যেন্দ্রনাথই দেখিয়েছিলেন, এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে 'স্ত্রী-স্বাধীনতার' পক্ষে। এই 'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীর মতামতের বিনির্মাণের মধ্যে না গিয়েও, স্বীকার করতে কোনো বাঁধা নেই, মূলত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের আনুকূল্যেই আধুনিক ডিসিপ্লিনের সঙ্গে অতি শৈশবেই পরিচয় ঘটে স্বর্ণকুমারীর।

শৈশবশিক্ষার পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ১৩ বছর বয়সে জানকীনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় স্বর্ণকুমারীর। ১৪ বছর বয়সে প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ীর জন্ম, ১৮ বছর বয়সে সরলার এবং ২৫ বছর না পেরোতেই চতুর্থ সন্তান বিয়োগের ধাক্কাও সামলাতে হয় তাঁকে। সন্তান-পালন ও পারিবারিক দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমান তালে চলছিল তাঁর শিক্ষাগ্রহণ। বলা বাহুল্য, তাঁর অভিজাত শ্রেণী-অবস্থান, এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ঠাকুর পরিবারের খোলামেলা আবহাওয়ার জন্যই এই সর্বশেষ কর্মটি সম্ভব হয়েছিল। ১৮৮০-তে যখন স্বর্ণকুমারীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মারা যায়, তখন জীবিত সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সরলার বয়স ৮ বছর। অর্থাৎ সন্তান-পালনের 'গুরুদায়িত্বে' কিছুটা শৈথিল্য দিলেও চলে। আর এই সময় থেকেই তাঁর ধারাবাহিক লেখালেখির সূত্রপাত। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ "ভূগর্ভ" চার কিস্তিতে ১২৮৭ (১৮৮০) সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। আর এর পরেই ১৮৮৪ সালে

'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হল।

১৮৮৪-তে স্বর্ণকুমারী যখন 'ভারতী'র সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন 'ভারতী' হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা এবং প্রথম দীর্ঘস্থায়ী, বৃহদাকার এবং বহুল-প্রচারিত মহিলা-সম্পাদিত মাসিকপত্র।[১২] ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৫—১১ বছর এবং আবার ১৯০৮ থেকে ১৯১৫—৮বছর, মোট ১৯ বছর স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫-তে জানকীনাথের মৃত্যুর পরে তিনি কর্মজীবন থেকে ধীরে ধীরে অবসর নেন এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সম্পাদকীয়ভার অর্পণ করেন।[১৩]

'ভারতী'র প্রয়োজন মেটাতেই, গল্প-কবিতার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় হাতেখড়ি হয় স্বর্ণকুমারীর। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৯-এর মধ্যে 'ভারতী'তে মোট ১৭টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন তিনি, এবং তারপরে একেবারে ১৩১৪-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রকৃতি'-র সমালোচনা ছাড়া আর কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লেখেননি তিনি।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ছিল না তাঁর, কিন্তু সংকলিত লেখাগুলো দেখলেই বোঝা যাবে উনিশ শতকের বিজ্ঞানচর্চার রীতিনীতি মেনেই প্রবন্ধগুলি লেখা। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য রাজেন্দ্রলাল যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন, স্বর্ণকুমারীর রচনাতেও সে ধারাই অনুসৃত হয়েছে। লেখাগুলো সবই উনিশ শতকে ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চা থেকে উদ্ধৃত তথ্য অবলম্বনে লেখা। তখনও পদার্থবিদ্যা-চর্চা নিউটনীয় গতিবিদ্যা এবং সনাতন যন্ত্রবিদ্যার মূল নীতির মধ্যেই আবদ্ধ। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এসে তখনও বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলোর বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেনি। এই সব-কিছু মাথায় রেখেই স্বর্ণকুমারীর লেখাগুলো পরতে হবে। "পৃথিবীর উৎপত্তি" বা "পৃথিবীর পরিণাম" বিষয়ে লেখাগুলোর ক্ষেত্রে যে ধরনের যুক্তিক্রম এবং উদাহরণ তিনি ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণভাবেই বিজ্ঞান বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ পাঠকেরাও যাতে মর্মোদ্ধার করতে পারে তা মাথায় রেখেই লিখেছেন। "বিজ্ঞান শিক্ষা" প্রবন্ধে স্পষ্টতই বোঝা যায় ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা সেখানে অনুসৃত হয়েছে।

গত শতকের পটভূমিতে পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলো নিয়েই লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। গণিতের সাহায্য ছাড়া মহাকাশবিদ্যা জনপ্রিয় পত্রিকায় সাধারণ লোকের জন্য লেখা খুবই দুরূহ কাজ। স্বর্ণকুমারী নিজে যে খুব ভালো অঙ্ক জানতেন এমন কোনো প্রমাণও নেই, সুতরাং সে-ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন যুক্তিবিদ্যার সাহায্য, আর সে বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ এই রচনাগুলো।

স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলো সংকলিত করার কারণ দুটো, প্রথমত, উনিশ শতকে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে ধারা শুরু হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করে এই লেখাগুলি। দ্বিতীয়ত, প্রথানুগ শিক্ষা ছাড়াই তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি উনিশ শতকের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিলেন। আজকের সাপেক্ষে—স্বর্ণকুমারীর রচনায় সরবরাহ করা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর ততটা মূল্য নেই, —কিন্তু বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন পথে এগিয়েছিল, তারও যেমন প্রামাণ্য দলিল এই লেখাগুলি, তার চেয়েও বড় কথা, একজন মহিলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সামাজিক গণ্ডি অতিক্রম করে এসে, তাতে যোগ দেওয়ার ঘটনাটি। গত শতকে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বলতে ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবারিক বিজ্ঞান, সেখানে স্বর্ণকুমারী একজন মস্তবড় ব্যতিক্রম, এবং বাঙালি মেয়েদের জনপ্রিয় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাতও সম্ভবত এখান থেকেই।

৪

বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন ২৪টি প্রবন্ধ, তার চেয়ে অনেক বেশি লিখেছেন ভ্রমণ, ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ। এই লেখাগুলো সম্পর্কে আবার ভিন্ন কথা বলতে হবে। গোড়াতেই আমরা বলেছিলাম উনিশ শতকের সমাজ এবং সেই সমাজে স্বর্ণকুমারীর অবস্থান এই দুটোই তাঁর রচনার প্রধান মাপকাঠি। স্বর্ণকুমারীর সামাজিক অবস্থান খুব সুনিশ্চিতভাবে মধ্য বা উচ্চবিত্ত এবং অভিজাত। সে গণ্ডী ছেড়ে তিনি কখনোই বিশেষ বেরোনোর চেষ্টা করেননি।

উনিশ শতকে সংস্কার চেয়েছিলেন অনেকেই, কিন্তু তার রকম-সকম নিয়ে নিজেদের মধ্যেই ছিল অনেক সংশয়, সেই কারণে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য়—স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষা ও 'ধর্মজ্ঞান' অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন উদারপন্থী, অন্তঃপুরের অনেক সনাতন স্ত্রী-আচার তিনি তুলে দিয়েছিলেন, বাইরের পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করে মেয়েদের পড়ানোতেও তাঁর সম্মতি ছিল, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যখন সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে জ্ঞানদানন্দিনীকে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

এই একই দ্বন্দ্ব সংক্রামিত হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর মধ্যে। তাঁর কাছে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ, কারণ উনিশ শতকে 'স্ত্রী-স্বাধীনতার' একটা সংজ্ঞা নিজে থেকেই নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়া শেখা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা—এসবই স্ত্রী-স্বাধীনতা—এই-ই যথেষ্ট। যে কারণে কৃষ্ণভাবিনী দাশের মনে হয়েছিল, ইংলণ্ডের মেয়েরা সব অর্থে স্বাধীন।[১৪] অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক উৎপাদক শক্তির অংশ হিসেবে পরিচিতি, পারিবারিক অবস্থান—এসব কোনো-কিছুর নিরিখেই তিনি এই স্বাধীনতাকে বিচার করেননি। আসলে উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষার ফলে অধিকাংশ মেয়ের কাছেই স্বাধীনতা আর পরাধীনতার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটা পর্দার। অন্তঃপুরিকার পর্দাটা সরিয়ে নিলেই তিনি 'স্বাধীনা', এই ছিল সাধারণ ধারণা। স্বর্ণকুমারীও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর জীবনস্মৃতি 'সেকেলে কথা'য় নিজের পরিবারের মধ্যে মেয়েদের অবস্থাকে তিনি 'স্বাধীন' বলেই দেখেছেন। শুধু তাই নয়, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার সীমাতেও তিনি কখনো-কখনো বিশ্বাস করেছেন। যে কারণে, কন্যা সরলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না, সরলার লাঠি-বন্দুকের জাতীয়তাবাদ, ৩৩ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, এবং তারপরে নিজের পছন্দে রামভুজ দত্তচৌধুরীকে বিয়ে করা, এসব নিয়েই সরলার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে বেশ কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল স্বর্ণকুমারীর।

আসলে সামাজিক এবং লিঙ্গ-প্রশ্নে স্বর্ণকুমারী নিজেই ছিলেন বেশ দ্বিধাগ্রস্ত। "পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব" ('ভারতী ও বালক', ১২৯৫) লেখাটি পরলে একধরনের আশা জাগে। এক পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকের লেখার জবাবে যে ব্যঙ্গাত্মক ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন স্বর্ণকুমারী, তাতে লিঙ্গ-প্রশ্নে তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থান পাঠকের কাছে একভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। কিন্তু বছর ফুরোতে না ফুরোতেই আরেকটি লেখায় তিনি যে রক্ষণাত্মক ভঙ্গী নিয়েছেন আগেকার সেই ধারণা তাতে পাল্টে যায়। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬-এর 'ভারতী'তে "রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র" নামে একটা অস্বাক্ষরিত চিঠি প্রকাশিত হয়। লেখার ধরনে, যুক্তিবিন্যাসের গঠনে, অনেক গবেষকের মতামত থেকে বোঝা যায় চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। বক্তৃতাটা হয়েছিল পুনায়, রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে ছিলেনও সেখানে, সুতরাং সবই মিলে যাচ্ছে। যাই হোক, চিঠিটিতে অপ্রত্যাশিত কিছুই লেখা হয়নি, রমাবাই দাবি করেছিলেন মেয়েরা সব বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, আর পত্র-লেখক যুক্তি প্রয়োগ করে প্রমাণ করেন মেয়েদের আর সব থাকলেও সৃজনশীলতা নেই। পূর্বোক্ত প্রবন্ধের ইয়োরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীর যুক্তির খুবই কাছাকাছি ছিল অস্বাক্ষরিত পত্রলেখকের এই যুক্তির অবস্থান। এই চিঠির উত্তরে ("রমাবাই", 'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৬) স্বর্ণকুমারী এমন এক রক্ষণাত্মক ভঙ্গী নিলেন যে, পূর্বের পত্রটির সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতান্তর নেই—এরকমটাই প্রমাণ হয়ে গেল। (সে কি অনুজকে রক্ষা করার জন্য ? কিন্তু চিঠিটা তো ছিল অস্বাক্ষরিত !) মনের এই সংশয় দেখানোর জন্যই আমরা সেই অস্বাক্ষরিত 'পত্র' এবং স্বর্ণকুমারী-কৃত 'প্রত্যুত্তর' পরিশিষ্ট অংশে জুড়ে দিলাম। এর পরে মেয়েদের বিষয়ে অনেক কিছু লিখলেও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে আর বিশেষ সরব হননি স্বর্ণকুমারী।

•

৫

'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণের পরে ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সখিসমিতি ও মহিলা শিল্পমেলা। ১৯০৬ পর্যন্ত সখিসমিতি চলে, তারপরে হিরণ্ময়ীর প্রচেষ্টায় বালিগঞ্জে গড়ে ওঠে বিধবা শিল্পাশ্রম। সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "সখিসমিতি" ও "সাত বৎসরে সখিসমিতি" লেখাদুটি। রচনায় প্রকাশিত নামের তালিকা বলে দেয় এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল অভিজাত 'ভদ্রমহিলাদের' সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্র। আর উনিশশতকে জাতীয়তাবাদের ছোঁয়ায় তা এখনকার মতন নিছক 'ক্লাব' না হয়ে ছিল সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান। এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বর্ণকুমারীর 'জাতীয়তাবাদে' হাতে খড়ি তাঁর পরিবারের ভেতর থেকেই। ১৮৬৬ সালে গণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে গড়ে ওঠা চৈত্র-মেলা, এবং ১৮৬৭ থেকে চালু হওয়া হিন্দু-মেলায় স্বর্ণকুমারীর যাতায়াত ছিল। এর পর জানকীনাথের কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে সেখানেও যাতায়াত, এবং ১৮৯০-এ কংগ্রেসের প্রতিনিধি পদপ্রাপ্তি সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। স্বর্ণকুমারী প্রাচ্যবাদীদের সঙ্গে তাল রেখে বিশ্বাস করতেন 'সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি' ও 'ইউরোপীয় সভ্যতার'

মেলবন্ধনে, এদেশে ইংরেজ শাসনের 'সুফল' সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, বরাবর বিরোধিতা করেছেন চরমপন্থা ও সশস্ত্র আন্দোলনের।

স্বর্ণকুমারীর লেখায় এই উনিশ শতকীয় 'জাতীয়তাবাদে'র প্রকাশ ঘটেছে অনেক জায়গাতেই। দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা এবং তার জনপ্রিয়করণও উনিশ শতকের 'জাতীয়তাবাদী' এজেণ্ডার অন্যতম ছিল। কিন্তু সে পরোক্ষ উদাহরণে না গিয়ে, স্বর্ণকুমারীর সমাজ বিষয়ক লেখাগুলি দেখলেই সেই সময়ে বহুকথিত 'জাতীয়-ভাবে'র নানা ধরনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে, এই 'জাতীয়তা'-র সঙ্গে সবচেয়ে সরাসরি যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ক রচনাগুলোতে।

সারা জীবনে প্রচুর ঘুরেছেন স্বর্ণকুমারী, আর তার অনেকটাই নথিভুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-কাহিনীগুলিতে। এই ভ্রমণ-কাহিনীও আবার মেয়েদের লেখা সমসাময়িক অনেক ভ্রমণ-কাহিনীর থেকে আলাদা। স্ত্রীশিক্ষা ও রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থা এই দুইয়ের মেল-বন্ধনে ১৮৭০-এর দশক থেকেই মেয়েদের লেখা ভ্রমণ-কাহিনী একটা স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে ওঠে। তার অধিকাংশই ছিল তীর্থ ভ্রমণ, —অন্তঃপুরের বাঁধাধরার বাইরে তীর্থক্ষেত্রে ধর্মাচরণের 'আনন্দ' প্রকাশিত হয়েছিল এই লেখাগুলিতে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী এখানেও আলাদা। ধর্মীয় উদ্দেশে তীর্থ ভ্রমণ করেননি তিনি। তাঁর সব যাত্রার উদ্দেশ্যই ছিল দেশ-দেখার যাত্রা। আর সেই দেখার ভঙ্গীতেও চলে এসেছে উনিশ শতকের পরিকাঠামোর ছোঁয়াচ, যেখানেই গেছেন, কখনও সেখানকার ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন, কখনও মন দিয়েছেন নৃতাত্ত্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ("নীলগিরির টোডা জাতি"), বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন স্থানিক ও কালগত মাত্রার মধ্যে মানুষেব অভ্যাস-আচরণের সঙ্গতি ও অসঙ্গতির। এইসব মিলিয়ে স্বর্ণকুমারীর ভ্রমণ-কাহিনীগুলি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র—এই যাত্রা এক ধরনের ক্ষসঅমব্রল যাত্রা, যার সঙ্গে এসে মিশেছে 'জাতীয়তাবোধে'র ছোঁয়াচ ও 'বৃহত্তর ভারতে'র একটা স্বতন্ত্র রূপ খোঁজার প্রয়াস।

এইসব টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিলিয়েই স্বর্ণকুমারীর বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার পথ প্রশস্ত হয়েছে ও পরিণতির পথে এগিয়েছে। মেয়েদের বিদ্যাচর্চার উষাকালে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, আবার লিঙ্গভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর যে ভূমিকা ধরা পড়েছে, আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তার সমালোচনা করা যায় না। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা ও সহবাস সম্মতি—এই আপাত-অবস্থার পরিবর্তনকেই প্রায় যেমন সবাই 'স্ত্রী স্বাধীনতা' বলে ধরে নিয়েছিলেন, স্বর্ণকুমারীও তার ব্যতিক্রম নন। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে না ঢুকেও বিজ্ঞানচর্চার যে নজির তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেটাও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সবই হয়ত সম্ভব হয়েছিল তাঁর উচ্চবিত্ত, অভিজাত শ্রেণী-অবস্থানের জন্য—তবুও সব মিলিয়ে মেয়েদের মধ্যে 'ডিসিপ্লিন'-এর চর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

(১) স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবন ও সাহিত্যচর্চার বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : (ক) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স.) : 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড,

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৪৮ এবং (খ) পশুপতি শাসমল : 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৭২।
(২) চিত্রা দেব, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৭।
(৩) Tapti Ray : 'Disciplining the Printed Text : Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali literature', in Partha Chatterjee (ed) : *Texts of Power : Emerging Disciplines in Colonial Bengal*, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1995; এবং Graham Shaw : *Printing in Calcutta to 1800 : A Description and Checklist of Printing in Late 18th Century Calcutta*, The Bibliographical Society, London, 1981.
(৪) Durgadas Bhattacharya, Ranjit Chakrabarty and Rama Deb Ray: 'A Survey of Bengali Writings on Science and Technology', in *Indian Journal of History of Science*, 24 (1), 1989.
(৫) অলোক রায় : 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র', বাগর্থ, কলকাতা, ১৯৬৯ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙলা সাময়িকপত্র', ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১২৩-২৫।
(৬) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : *Bethune School and College Centenary Volume*, edited by Kalidas Nag, Calcutta, 1949.
(৭) Meredith Borthwick : *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905*, Princeton University Press, 1984.
(৮) Priscilla Chapman, *Hindoo Female Education*, 1889.
(৯) সিদ্ধেশ্বর রায় : "লোকসংখ্যা", 'নব্যভারত' পত্রিকায় ১২৯০ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ. ১৭৯, ২৪৩, ২৯১, ৩৫০, ৪৩৬, ৪৬৩, ৫০৬)।
(১০) Partha Chatterjee, 'Nationalist Resolution of Women's Education', in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (ed) : *Recasting Women : Essays in Colonial History*, Kali for Women, New Delhi, 1984.
(১১) স্বর্ণকুমারী দেবী : "সেকেলে কথা", 'ভারতী', চৈত্র ১৩২২। পুনর্মুদ্রণ, — অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (স.) : 'সেকেলে কথা : শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭।
(১২) প্রথম মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা 'অনাথিনী' (১৮৭৫ : থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত)।
(১৩) সুনীল দাস : 'ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৪।
(১৪) সীমন্তী সেন (স.) : 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা', কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৭।

বিজ্ঞান

পৃথিবীর পরিণাম

পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই পরিবর্ত্তন-নিয়মের-বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম, জীবন ও মৃত্যু, এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সকল বস্তুই যে সমান সময়ে এই তিন অবস্থা পায় এমন নহে। আমরা যে সময়কে এক মুহূর্ত্ত বলি সেই সময়ের মধ্যেই অনেক কীট পতঙ্গ এই তিন অবস্থা অতিক্রম করে। জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালকে জীবন কহা যায়। পৃথিবী-জাত সকল বস্তুই এই নিয়মের অধীন, কিন্তু পৃথিবী নিজে এই নিয়মের অধীন কি না? পৃথিবীর জীবনের বিষয় আমরা জানি কিন্তু ইহার মৃত্যু হইবে কি না তাহা আমরা জানি না; আবহমান কাল হইতে পৃথিবীকে আমরা যেরূপ সমভাবে চলিতে দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে আপাততঃ মনে হয় পৃথিবী মৃত্যুর আয়ত্তাধীন নহে।

এখন, দেখা যাক পৃথিবীর ন্যায় একটা গ্রহের জীবন ও মৃত্যু বলিলে কি বুঝায়। পৃথিবীর এখনকার অবস্থাই ইহার জীবনের অবস্থা। এখন পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ জন্মাইতেছে, নদী বহিতেছে, সমুদ্র তরঙ্গিত হইতেছে; এখন দিনের পর রাত আসিয়া, ঋতুর পর ঋতু আসিয়া, পৃথিবীকে জীবজন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে; এক কথায়, এখন পৃথিবীতে যাহা হইতেছে তাহাতেই তাহার জীবনের অস্তিত্ব জাজ্বল্যমান। এই অবস্থার অভাবের নামই মৃত্যু। এই অবস্থার অভাব হেতুই চন্দ্রকে আমরা মৃত গ্রহ বলি।*

পৃথিবীর বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে হইলেও তাহাতে বাধা পাইয়া আলোকের তির্য্যগ্ গতি (Refraction) হয়। কিন্তু চন্দ্র হইতে আলোক আসিবার সময় তাহার তির্য্যগ্ গতি হয় না। ইহা হইতেই জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রে বায়ু নাই, আর যদিই বা থাকে, তাহা অত্যন্ত লঘু। অত্যন্ত লঘু বায়ুতে জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলি তাহা প্রকাণ্ড গহ্বর মাত্র, ঐ সকল গহ্বর

* আমাদের দেশের নামকরণ অনুসারে চন্দ্রকে গ্রহ বলা হইল। কিন্তু আসলে, যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাদিগকেই গ্রহ কহে; আর যাহারা কোন একটি গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে, সেই নিমিত্ত ইহা প্রকৃত পক্ষে একটি উপগ্রহ।

পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া ঐরূপ গহ্বর হইয়াছে। চন্দ্র ঐরূপ মন্দ-গতি যে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেই উহার ১৫ দিন লাগে। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে Proctor প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বেত্তারা[১] বলেন যে চন্দ্রে উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণী নাই। যে গ্রহের চন্দ্রের মত অবস্থা হয় তাহাকেই মৃত কহা যায়।

পৃথিবীর মৃত্যু সম্ভব কি না জানিতে হইলে দেখা আবশ্যক, পৃথিবীতে এমন কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে কি না যাহাতে তাহার জীবনী-শক্তির হানি করে। দেখা আবশ্যক, পৃথিবীর জীবনী-শক্তির সঙ্গে এমন কোন প্রতিকূল শক্তি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে কি না যাহার অনিষ্ট-জনক কার্য্য অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর পরমায়ু হ্রাস করিতেছে। যদি আমরা সেইরূপ প্রতিকূল শক্তি দেখিতে পাই তবে তাহার কার্য্য এখন অতীব সূক্ষ্ম হইলেও তাহা হইতে কালে পৃথিবীরও যে চন্দ্রের মত মৃত দশা হইবে না—এরূপ কে বলিতে পারে?

গ্রহের জীবনের একটি প্রধান কারণ, বৈষম্য। বৈষম্য না থাকিলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না; যদি সমস্ত পৃথিবী সমতল হইত অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু উঁচু নীচু না থাকিত, তাহা হইলে নদী বহিত না; নদীর গতির কারণ মাধ্যাকর্ষণ বটে, কিন্তু উঁচু নীচু না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ জলরাশিকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া আনিত? উষ্ণতার বৈষম্যই বায়ুর গতির কারণ। যদি সমস্ত বায়ু সমান গরম হইত তাহা হইলে বায়ু বহিত না। বায়ুর কোন একস্থান অধিক উষ্ণ হইলে, তাহা লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানে চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিতে থাকে; এইরূপে বায়ু বহে। জলের উষ্ণতার বৈষম্যই সমুদ্রের স্রোতের প্রধান কারণ। সমস্ত সমুদ্রের জল যদি সমান গরম হইত তাহা হইলে জলাশয়ের ন্যায় সমুদ্র নিশ্চল থাকিত। সমুদ্রে স্রোত বহিত না। ঔপসাগরিক স্রোত (Gulf Stream) দ্বারাই ইংলন্ড মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। যদি ঔপসাগরিক স্রোত হইতে ইংলন্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র উষ্ণ জল না পাইত তাহা হইলে ইংলন্ড প্রায় মেরুসন্নিহিত দেশের মত শীত প্রধান হইত।* পৃথিবীর কোটি সন্নিহিত প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের উত্তাপ বেশী এ জন্য সেখানকার জল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিতে থাকে; এবং সেই বাষ্পে পরিণত জলরাশির স্থান গ্রহণ করিবার জন্য মেরুর নিকটস্থ শীতল জলের স্রোত বহিতে থাকে।

* ব্যারণ দে লেসেপ[২] যে পানামার যোজকে খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এক খানি আমেরিকা-দেশীয় সংবাদ পত্র তাহাতে একটি গূঢ় অভিসন্ধি দেখিয়া বলেন যে, ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংলন্ডের অনিষ্ট সাধনের জন্যই এ প্রস্তাব। পানামার খাল কাটা হইলে ইংলন্ডের জীবন রক্ষক ঔপসাগরিক উষ্ণ স্রোত এই নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া ইংলন্ডকে বাসের অযোগ্য করিবে। ইহা বোধ করি, কবি রামদাস শর্ম্মার ভারত-উদ্ধারের পাশ্চাত্য সংস্করণ। সং

এক কথায় বলিতে এই, জগতে যদি উষ্ণতার বৈষম্য না থাকিত তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীবন-রক্ষণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। অথচ উষ্ণতার একটি বিশেষ গুণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে চতুষ্পার্শ্বে সমান ভাবে বিস্তৃত হইবার দিকে ইহার প্রবণতা। কোন স্থানে কোন একটা অত্যন্ত উষ্ণ বস্তু রাখিলে ক্রমে তাহার উষ্ণতা চারিপাশে সমান ভাবে বিস্তৃত হইতে থাকে। একটা গরম ও একটা শীতল বস্তু এক সঙ্গে রাখিলে কিছুক্ষণ পরে উভয়েরই উষ্ণতা সমান হয়, শীতল বস্তু যতটা উষ্ণতা পায়, উষ্ণ বস্তু ততটা হারায়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা আয়-ব্যয়ের নিয়ম (Law of Exchange) বলেন। এবং সকল প্রকার তেজই (Energy) ক্রমে উষ্ণতায় পরিণত হইবার দিকে উন্মুখ। কাজে কাজেই মনে হয় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকার তেজই উষ্ণতায় পরিণত হইয়া জগৎময় সমভাবে বিস্তৃত হইবে। সে অবস্থায় পৃথিবী যে, কেবল চন্দ্রের ন্যায় মৃত হইবে, তাহা নহে, তাহার প্রলয় হইবে।

প্রলয়ে গ্রহের মৃতদেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমরা জীবন, মৃত্যু কাহাকে বলে দেখিয়াছি; এখন, প্রলয় কাহাকে বলে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে।

সকলেই জানেন যে দুই শক্তির কার্য্যফলে গ্রহ স্বীয় কক্ষ হইতে বিচ্যুত না হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। প্রথম, সূর্য্যের নিজাভিমুখে আকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ শক্তি (Centripetal Force)। দ্বিতীয়, সৌর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া গ্রহের সরল রেখা পথে পলায়নের চেষ্টা অথবা তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal Force)। যদি কখনও কোন জ্যোতিষ্কের এমন অবস্থা হয় যে তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অতীব অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সূর্য্যের আকর্ষণের প্রভাব বৃদ্ধিহেতু সেই জ্যোতিষ্ক ক্রমে সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে এবং তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়।* এইরূপ সূর্য্যের গ্রাসে পতিত হওয়াকেই গ্রহের প্রলয় বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীতে যখন উত্তাপের সাম্য হইবে, তখন পৃথিবী গতি শক্তিহীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইবে।**

* জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন ধূমকেতু ও গ্রহ-খণ্ড মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর এইরূপে পড়িয়া তাহার চিরন্তন প্রচণ্ড উত্তাপ সমান ভাবে রক্ষা করিতেছে।

** এইরূপে অনেক গুলি গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের সহিত মিশিয়া গেলে সেই মিশ্রিত পদার্থ সমষ্টির কতক অংশ আঘাত জনিত উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয়; ক্রমে আবার তাহা হইতে নূতন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক বৈজ্ঞানিকদিগের মত যে বর্ত্তমান গ্রহ উপগ্রহ এইরূপ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই একেবারে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জ্যোতিষ্কের জীবন রক্ষণের প্রধান কারণ তাহার গতি ; কাজেই পৃথিবীর মৃত্যু চিন্তা করিতে গেলে তাহার গতির বিষয় আলোচনা আবশ্যক। যদি আবহমান কালের মধ্যে পৃথিবীর গতির কোন বৈলক্ষণ্য না দেখা গিয়া থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর পরিণামের বিষয় এ সূত্র হইতে কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। কিন্তু বহুকালব্যাপী জ্যৌতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর গতির কিছু লাঘব হইয়াছে। যদিও ইহার মাত্রা চুলের মত বই নয়, তথাপি ইহা হইতে পৃথিবীর গতিহ্রাস সপ্রমাণ হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল অপেক্ষা চন্দ্রের গতি এখন কিছু বৃদ্ধিশীল বলিয়া হঠাৎ মনে হয়। ইংরাজি ভাষায় ইহাকে Secular acceleration of the moon's mean motion বলে। কিন্তু চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হওয়া অতিশয় অসম্ভব বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন। চন্দ্রের গতি আসলে বাড়ে নাই, পৃথিবীর গতি হ্রাস হেতু চন্দ্রের গতি বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন চন্দ্রের গতি বৃদ্ধির কোন কারণই তাঁহারা দেখেন নাই। গতি বৃদ্ধির অর্থই কার্য্যের বৃদ্ধি, ও শক্তি না হইলে কার্য্য হইতে পারে না—অতএব চন্দ্রের গতি বৃদ্ধির অর্থই এক নূতন শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু কোথা হইতে এ নূতন শক্তির আবির্ভাব হইবে ? জগতের শক্তি-সমষ্টির কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না ; ইহা জগতে চিরকাল সমান আছে ও থাকিবে। শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র, তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি সম্ভবে না—ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিসংরক্ষণ (Conservation of Energy)' কহেন। এরূপ না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী নিত্য সমান ভাবে রক্ষিত হইত না, তাহাতে বৈলক্ষণ্য হইত। প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতার (Uniformity of Natural Laws) উপরেই সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র অবস্থিত। এবং যেহেতু চন্দ্রের গতি-বৃদ্ধির কোন কারণ দেখা যায় না, অতএব ইহা নিশ্চয় যে, চন্দ্রের গতি বৃদ্ধি হয় নাই। তবে গতি-বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কেন ? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর গতি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ মনে হয়। কিন্তু এই রূপ কেবল একটা অনুমান কখন কোন একটা মতের ভিত্তি হইতে পারে না। পৃথিবীর গতি হ্রাস করিতে প্রত্যক্ষ পক্ষে যত্নশীল কোন বিশেষ কারণ দেখিতে না পাইলে আমরা উপরি উক্ত যুক্তিকে নিতান্ত আনুমানিক বলিয়া অবহেলা করিতে পারিতাম ; কিন্তু ঐরূপ একটি প্রত্যক্ষ কারণ বৈজ্ঞানিকেরা নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন।

সমুদ্রের জলের এক প্রকার গতি আছে যাহাকে আমরা জোয়ার ভাঁটা বলি। এই জোয়ার ভাঁটা পৃথিবীর গতি অপহরণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশে যত্নশীল। পৃথিবীর স্থলীয় ও জলীয় অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের বৈষম্য,

(Differential Attraction) এই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ।* সূর্য্য এতদূরে অবস্থিত যে তাহার জল ও স্থলের উপর প্রায় সমানই আকর্ষণ, তাহার বৈষম্য অতি কম ; সেই জন্য সূর্য্যের সহিত জোয়ার ভাঁটার গৌণ সম্পর্ক। চন্দ্র জলরাশিকে আকর্ষণ দ্বারা ফাঁপাইয়া তোলে কিন্তু কোথা হইতে সে জলরাশির পার্শ্বগামী গতি হয় ? চন্দ্র ত আর তাহাকে অন্য কোন দিকে গতি দিতে পারে না, এবং বাহিরের কোথা হইতেও গতি পাইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এ গতি কোথা হইতে আসে ?

চন্দ্র কর্ত্তৃক উন্নমিত এই জলরাশি পৃথিবীর ঘুরিবার সময় তাহার কঠিন স্থল অংশের সহিত ঘর্ষণে সেই স্থলভাগের গতি লইয়া গতি পায়। — এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখানো যাউক।

একটি গোলা চালাইয়া একটি স্থির গোলাকে আঘাত করিলে যেমন সেই গমনশীল গোলার শক্তি পাইয়া স্থির গোলাটি চলিতে থাকে, তেমনি পৃথিবীর ঘূর্ণমান কঠিন অংশের আঘাতে গতি পাইয়া জলরাশি চলিতে থাকে।

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়[৩] তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ১২৭ পৃঃ "জোয়ার ভাঁটা" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, "চন্দ্র অবশ্যই পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল ভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল ভাগ অতিশয় তরল এই জন্য চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হয়।" ঐ পুস্তকের ১২৯ পৃঃ তিনি আবার বলিয়াছেন, "পৃথিবীর কেন্দ্র ... চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়" এই দুইটির অর্থ পরস্পর-বিরোধী। বোধ হয় কেবল ভাষা সংক্ষেপ করিবার জন্যই ওরূপ অর্থের বৈপরীত্য হইয়াছে। তবে অক্ষয় বাবু যে বলিয়াছেন যে চন্দ্রের আকর্ষণে জল "চলিত" হয়—ইহা ঠিক নহে। এ বিষয় মূল প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। আসল কথাটা এই, আকর্ষক ও আকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং তরল বস্তুর কোন এক অংশ অপর অংশ হইতে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু দৃঢ় বস্তুর সে রকম হয় না। এই কারণে কোন তরল বস্তু আকৃষ্ট হইলে, তাহার উপরিভাগেই আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া সে তরল বস্তুকে সহজে স্ফীত করে, এবং দৃঢ় বস্তু আকৃষ্ট হইলে তাহার কেন্দ্রে আকর্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহার সমুদায় অংশকে এক সময়ে সমানভাবে (as a whole) আকর্ষণ করে। কিন্তু জলের উপরিভাগ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৫০০ মাইল বলিয়া জল অপেক্ষা স্থল ভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব কম হয়, সেই জন্য স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক স্ফীত হইয়া উঠে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব এত অধিক যে তাহার তুলনায় ৩৫০০ মাইল কিছুই নহে, কাজেই জল স্থলের উপর সূর্য্যের আকর্ষণের বৈষম্য অতি অল্প। সেই জন্য বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি চন্দ্রের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণের মত জলকে স্ফীত করিতে পারে না। চন্দ্র অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া ৩৫০০ মাইলেই তাহার আকর্ষণের অনেক তারতম্য হয়।

পৃথিবী যে জলকে এইরূপ গতি দেয়, পৃথিবী এ শক্তি কোথা হইতে পায় ? সে ত আর অন্য কোন স্থান হইতে নূতন শক্তি পাইয়া জলকে চালাইতে পারে না, নিজের গতিশক্তিরই অংশ দিয়া জলকে চালায়। ইহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপে পৃথিবীর গতি শক্তির কিছু লাঘব হয়। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে উল্লিখিত গোলার মধ্যে যদি দুইটিরই সমান ভার ও আয়তন হয়, তাহা হইলে স্থির গোলাকে চালাইতে গিয়া গমনশীল গোলা শীঘ্রই থামিয়া যায় এবং তাহার গতি পাইয়া স্থির গোলা চলিতে থাকে। যদি পৃথিবীর স্থলীয় অংশ ও তাহার সহিত যে জলরাশির ঘর্ষণ হয়, এ দুয়ের ভার সমান হইত তাহা হইলে পৃথিবীর গতিও থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। সমান নহে বলিয়াই তাহার গতির কেবল অল্প মাত্র বেগহ্রাস হয়। এ বিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। যদি একটি দ্রুতগামী চাকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর কোন প্রকারে রাখা যায় তাহা হইলে চাকার গতি পাইয়া সেই প্রস্তর খণ্ড দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু এই কার্য্যে যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহা চাকার গতির হিসাবে খরচ পড়ে। উহাতে দ্রুতগামী চাকার কিছু বেগ কমিয়া যায়। সেই রূপ দেখা যায়, পৃথিবীর গতিশক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণে কিছু কমিয়া গিয়াছে। এখন, পৃথিবীর নিজের চারিদিকে ঘুরিতে পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, কাজে কাজেই দিবসের দৈর্ঘ্য এখন কিছু বাড়িয়াছে। এই জন্যই চন্দ্রের গতির বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক দিবসে চন্দ্র ঘুরিতেছে মনে হয়।

ইহা ব্যতীত পৃথিবীর গতি-লাঘব হইবার আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থির হইয়াছে যে আকাশের এমন কোন স্থানই নাই যেখানে ঈথর (Ether) না আছে। যদিও ঈথর এত সূক্ষ্ম যে উহা মাধ্যাকর্ষণের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া কল্পিত হয়; তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথরের সহিত ঘর্ষণেও শক্তির হানি হয়; এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, এন্‌কিং দ্বারা আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতুর কক্ষ ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ক্রমশই ঐ ধূমকেতুর কেন্দ্রাতিগ গতি কমিয়া যাইতেছে। ইহার অন্য কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজে কাজেই বৈজ্ঞানিকেরা ঐরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি একটী জ্যোতিষ্ক ঈথর ঘর্ষণে শ্লথগতি হইতে পারে তবে অন্যান্য জ্যোতিষ্কই বা কেন সেরূপ না হইবে ? এই কারণ হইতে যদিও অতি অল্পই ফল হইবার সম্ভাবনা তথাপি ইহাও পৃথিবীর মৃত্যুর অন্য কারণের সহায়তা করিতে পারে।

এই ত দেখিতে পাওয়া গেল পৃথিবীর গতি কমিবার দিকে উন্মুখ। এই

কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিলে কালে যে পৃথিবী সূর্য্যে মিশাইয়া যাইবে—ইহাই সম্ভাব্য। বলিবার আবশ্যক নাই, এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই পৃথিবীতে আর জীবের বসতি থাকিবে না, পৃথিবী চন্দ্রের মত হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে পৃথিবীর বিনাশ এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া সহকারে এত অধিক বৈজ্ঞানিক মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে সে বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। এখন উপরে সন্নিবেশিত মতগুলি যে কালে পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিত্যক্ত হইবে না—ইহাই বা কে নিশ্চয় বলিতে পারে? চন্দ্র যে প্রকার মন্দগতি হইয়াছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের উপরি-উক্ত মতানুসারে পৃথিবীর আগেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা। এবং চন্দ্র না থাকিলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং এ কারণ হইতে পৃথিবীর জীবন হ্রাসের সম্ভাবনাও অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের যে প্রকার সম্পর্ক তাহাতে চন্দ্র না থাকিলে পৃথিবীর যে আবার কত প্রকার অনিষ্ট হইবে তাহা এখানে বলা বাহুল্য।

ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭

ভূগর্ভ

পৃথিবীর অভ্যন্তর কি প্রকার ? আমরা পৃথিবীর উপরিভাগ যেরূপ দেখিতেছি, পৃথিবীর অন্তর প্রদেশও কি সেইরূপ ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া যায় না। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল কিম্বা ১৮৪৮০০০০ ফুট, তাহার মধ্যে কেবল ৫০০০ হাজার ফুট মানুষের চক্ষুগোচর হইয়াছে মাত্র। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর নিম্নে খনন করিয়া দেখিবার কোন উপায এখনো বাহির হয় নাই, সুতরাং কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী-গর্ভ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কেহ এখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহারই উপর যুক্তি খাটাইয়া, এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান দ্বারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্ডিতেরা ভূগর্ভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান—

(১) পৃথিবীর আবরণ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রবপদার্থময়।

(২) পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হউক, প্রায় কঠিন।

(৩) পৃথিবীর আবরণ যেরূপ কঠিন তাহার কেন্দ্রও তদ্রূপ, কেবল ভূপৃষ্ঠ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থল দ্রবপদার্থ-ময়।

(৪) ভূপৃষ্ঠ কঠিন কিন্তু নিম্নে কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়।

পৃথিবীর যতদূর নিম্ন পর্য্যন্ত মানুষের পরীক্ষার অন্তর্ভূত হইয়াছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভূবেত্তাগণ প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থান খনন দ্বারা যে পাঁচ হাজার ফুট মানুষের পরীক্ষাধীন হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নতা অনুসারে ক্রমশই উত্তাপ বাড়িতে থাকে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ যদিও পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক সমান নহে, নানা স্থানীয় কারণে (Local causes) ইহার অল্প স্বল্প বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু বহু সংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পৃথিবীর অন্তরে প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ প্রত্যেক ১০০ ফুটে তাপমান যন্ত্রের ন্যূনধিক ১॥ ডিগ্রি উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপ বৃদ্ধির এই নিয়মানুসারে ভূগর্ভে এত উত্তাপ জমিবার কথা যে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রব-পদার্থময় হইবারই সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া এ মতের পক্ষে আরো অনেক বলবান কারণ আছে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক বহুদূরব্যাপী স্তর

সংস্থিতি (Alternate deposit of sedimentary rocks) দেখিতে পাওয়া যায় যে ভূগর্ভকে তরল মনে করিয়া না লইলে সে সংস্থিতির কোন কারণ নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহা ছাড়া পৃথিবীর কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর অংশ নীচু হইয়া পড়ে। ভূগর্ভ তরল না হইলে এরূপ হইত না। কারণ তরল পদার্থের সাধারণ একটি গুণ এই যে তাহার কোন এক স্থানে অধিক চাপ পড়িলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উচ্চ হইয়া উঠে।

এই সকল এবং অপরাপর কারণে ভূবেত্তাগণ ভূগর্ভকে দ্রব-পদার্থময় বলেন।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হপকিন্স[৫] সর্ব্বতোভাবে এক সমান দুইটি দোলক যন্ত্র (Pendulum) লইয়া একটার নিম্নস্থ ধাতব গোলকের বদলে একটি সমান ভারের পারদ-পূর্ণ কাঁচের গোলক বসাইয়া দেন। এই দুইটির গতিবিধি আলোচনা করিয়া তিনি দেখেন ধাতব দোলক অপেক্ষা পারদ পূর্ণ দোলকটি শীঘ্র-গামী হয়। পৃথিবীর স্বকক্ষ ভ্রমণের উপর এই দৃষ্টান্ত খাটাইয়া, নানা প্রকার জ্যোতিষিক গণনা ও যুক্তি দ্বারা তিনিই প্রথমে সাব্যস্ত করেন যে ভূগর্ভ, কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সংঘাত-কঠিন। তিনি বলিলেন তাহার অন্যথা হইলে, অর্থাৎ দ্রব-পদার্থ পূর্ণ হইলে, পৃথিবী এখনকার অপেক্ষা শীঘ্রগামী হইত ; তাহা হইলে পৃথিবীর কতকগুলি গতি (Precession ও Mutation) এখন যেরূপ আছে নিশ্চয়ই সেরূপ থাকিত না। পরে সার উইলিয়ম টম্‌সন্[৬] ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব আরচ্‌ডিকন প্র্যাট্ অন্য নানা রূপ যুক্তি দ্বারা হপকিন্সের এই মতটির পক্ষ সমর্থন করেন। যত দিন ফরাসি পণ্ডিত ডিলনে এই মতের ভ্রম প্রমাণ না করেন ততদিন পর্য্যন্ত ভূবেত্তাগণ আপনাদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপক্ষে ও হপ্‌কিন্স প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা ঘাড় পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভূবেত্তাদিগের মধ্যে এক জনও এমন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন না যিনি হপ্‌কিন্স প্রভৃতি অসাধারণ গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গণনার ভুল ধরিতে পারেন। ফরাসী পণ্ডিত ডিলনে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে হপ্‌কিন্সদিগের এক জন সমকক্ষ ব্যক্তি। তিনি উপরি-উক্ত মতটির সমালোচনা করিয়া তাহার অসারতা দেখাইয়া বলিলেন, পৃথিবী দ্রবপদার্থে পূর্ণ হইলে তাহার গতির ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া হপ্‌কিন্সের দোলক যন্ত্রের পরীক্ষা পৃথিবীর সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে ? প্রথমতঃ, দোলকের গোলক লম্বমান দণ্ড অবলম্বন করিয়া দোলে ও পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে, সুতরাং দোলক যন্ত্রের গতির দৃষ্টান্তে পৃথিবীর গতি নিরূপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচে পারদ যেরূপ

অসংলিপ্ত থাকে, ভূগর্ভস্থ পদার্থ তাঁহার উপরিস্থ আবরণের সহিত সেরূপ বিচ্ছিন্ন থাকিলে হপ্‌কিন্‌সের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইত, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে পৃথিবীর আবরণের সহিত ভূগর্ভের পদার্থ এমনি সংলিপ্ত যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সত্ত্বেও উভয়ে কঠিন-পদার্থ নির্ম্মিত একটি বস্তুর ন্যায়ই কার্য্য করে।

পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন মানিয়া লইলে আর একটি গোল বাধে। তাহা হইলে জ্বালামুখীর* অগ্ন্যুৎপাতের কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যাঁহাদের মতে ভূগর্ভ কঠিন, তাঁহারা বলেন, জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাত স্থানীয় কারণ-প্রসূত, পর্ব্বতগর্ভে যে সকল পদার্থ নিহিত থাকে, কালে তাহাই উদ্‌গীরিত হয়, সে সকল পদার্থ সাধারণ ভূগর্ভের নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক আপত্তি আছে। বহু সংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, পৃথিবীর সকল স্থানের জ্বালামুখী হইতে একই প্রকার পদার্থ উদ্‌গীরিত হয়। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত জ্বালামুখী হইতে স্থানীয় কারণ বশতঃ একই প্রকার পদার্থ নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সাইমেনস্‌ গত বৎসর বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া ভূগর্ভের তরলতার পক্ষে অতি সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়াছেন।

তিনি বিসুবিয়াস পর্ব্বতে গিয়া দেখেন, পর্ব্বতের গহ্বর মধ্য হইতে দুই তিন সেকেন্ড অন্তর সশব্দে বাষ্প নির্গত হইতেছিল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। পর্ব্বতের খুব গভীর প্রদেশে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া যদি হঠাৎ ঊর্দ্ধে উঠে, তাহা হইলেই ঐরূপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেক বারের বাষ্পোদ্‌গীরণের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত ধাতুস্রোত (Lava) উত্থিত হইবার কথা, এবং পর্ব্বতের ধূমনলের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ ধাতব পদার্থ জমিবার জন্য সময় আবশ্যক। কাজেই তাহা হইলে দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে সশব্দে কেবল মাত্র বাষ্প উদগীর্ণ হইত না। অন্য সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া সাইমেনস্‌ এইরূপ বাষ্পোদ্‌গীরণের এই কারণ দেন যে, নিম্নোত্থিত বিশুদ্ধ কিম্বা বিমিশ্র জলজান বাষ্প উপরের বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া সশব্দে জ্বলিতে থাকে। এবং নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলেন, যদি ভূগর্ভ দ্রব-পদার্থময় না হইত তাহা হইলে ভূগর্ভে এত প্রচুর পরিমাণে জলজান বাষ্প জন্মাইত না।

* সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় "আগ্নেয় গিরি" এই নূতন-সৃষ্ট কথাটি Volcano'র প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় "জ্বালামুখী" শব্দ যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়, তখন তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।

অপর কতকগুলি বৈজ্ঞানিকেরা অন্য প্রকার যুক্তি দেখাইয়া ভূগর্ভের কাঠিন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক জেম্‌স টমসন্[৭] গণনা করিয়া বলেন যে চাপের আধিক্য হইলে কোন বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপের আবশ্যক করিবে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বুন্‌সেন[৮] মোম ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের উপর পরীক্ষা করিয়া এই মতের পোষকতা করেন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হপকিন্‌স নিজে ঐ সকল দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া ভূগর্ভ যে কঠিন—এই মতটি অভ্রান্ত বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষা অবলম্বন করিয়া বুন্‌সেন বলেন পৃথিবী কেন্দ্র পর্য্যন্ত সংঘাত-কঠিন না হইয়া থাকিতে পারে না। মোমকে উপর্য্যুপরি থাক্-থাক্ করিয়া রাখিলে, তাহার সর্ব্ব প্রথম থাক্ গলাইতে যে উত্তাপ লাগে, দ্বিতীয় থাক্ গলাইতে তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ লাগিবে, তৃতীয় থাক্ গলাইতে আরো অধিক, এই রূপে যতই নিম্নের থাকে আসা যায় ততই তাহাকে গলাইতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে এত অধিক চাপ যে তথাকার কোন পদার্থকে যে-সে উত্তাপ গলাইতে পারে না। যে পরিমাণ উত্তাপে কেন্দ্রস্থ পদার্থ গলিতে পারে তত প্রচণ্ড উত্তাপ ভূগর্ভে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভূগর্ভ সংঘাত-কঠিন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে। মোম, গন্ধক প্রভৃতি যে সকল পদার্থের উপর পরীক্ষা দ্বারা উপরিউক্ত মতটি স্থাপিত, বাস্তবিক পক্ষে, পৃথিবী সে সকল পদার্থে নির্ম্মিত নহে।

এখন দেখা উচিৎ পৃথিবী যেরূপ পদার্থে নির্ম্মিত সেই রূপ ধাতব ও আকরিক পদার্থে পরীক্ষা করিলে কি ফল দাঁড়ায়? সার উইলিয়াম্ টম্‌সন্ ও হপ্‌কিন্স পরে আবার ধাতব দ্রব্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন জেমস্ টম্‌সনের মতটি সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে খাটে না। যে সকল পদার্থ তরল অবস্থা হইতে ঘন অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয়, চাপবৃদ্ধি সহকারে সেই সকল বস্তুকে গলাইতে ও দ্রব অবস্থায় রাখিতে অল্প উত্তাপের আবশ্যক করে, এবং যে সকল বস্তু ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয়, চাপাধিক্য সহকারে তাহাদিগকে গলাইতেই অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

গতবৎসরের প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সাইমেনস্ এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। জর্ম্মাণ দার্শনিক কান্ট প্রথমে অনুমান করেন যে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইয়াছে। পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্লাস্[৯] এই মতটিকে অনেক অকাট্য যুক্তির উপর দাঁড় করান। এখনকার বিজ্ঞানমণ্ডলীতে সর্ব্বত্রই এই মতটি সমাদৃত। জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিণত হইয়া ক্রমে আরো শীতল হইতে

আরম্ভ হইলে দুই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। (১) হয়, তাহার উপরের পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়া ভিতরের অংশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকিবে (যেমন সীসের গোলা ঢালাই করিবার কারখানায় সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়)। (২) নয়, তাহার ভিতরের পদার্থ কঠিন হইয়া ক্রমে উপর পর্য্যন্ত কঠিন হইবে। উত্তপ্ত তরল পদার্থ শীতল হইবার সময় তাহার উপরের স্তর ঘন হইয়া নিম্নে ডুবিয়া পড়ে, এই ঘনীভূত পদার্থ আভ্যন্তরিক তাপে আবার তরল হইয়া যদি উপরে উঠে তাহা হইলেই প্রথমোক্ত অবস্থা হয়। কিন্তু উপরের ঘনীভূত পদার্থ নিম্নে ডুবিয়া গেলে যদি আর তরল না হয় তাহা হইলে সেইখানেই তাহা উত্তরোত্তর গাঢ হইতে থাকে। পৃথিবী যদি প্রথমোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভূগর্ভ তরল, যদি শেষোক্তরূপে শীতল হইয়া থাকে তবে ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় কঠিন। এখন দেখিতে হইবে পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা উক্তরূপে নিমগ্ন হইয়া গেলে আবার তরল হইয়া উপরে উঠিবে কিম্বা নিম্নে পড়িয়া ক্রমশঃ সেখানে গাঢ়তর হইতে থাকিবে ?

যে বস্তু তরল হইতে দৃঢ় অবস্থা পাইবার সময় বিস্তৃত হয়, তাহাই লঘু হইয়া একবার নীচে ডুবিয়া গেলেও আবার তরল হইয়া উপরে উঠে এবং যাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্কুচিত হয় তাহা আর উপরে উঠে না। সুতরাং দেখা আবশ্যক, পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সময় বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কুচিত হয়। যদি বা সঙ্কুচিত হয়, সে সঙ্কোচনের পরিমাণ কত ? সঙ্কোচনের মাত্রা যত কম হইবে, ততই কোন বস্তুকে গলাইবার জন্য কম উত্তাপের আবশ্যক। বিসকফ্[১০] পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন পৃথিবীর পদার্থ তরল হইতে ঘন হইবার সময় শতকরা ২০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। এই পরীক্ষার উপরে গণনা করিয়াই সার উইলিয়ম টম্‌স্‌ন বলেন ভূগর্ভ কঠিন। কিন্তু ম্যালেট বড় বড় লৌহের কারখানায় দেখিয়াছেন মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ শতকরা ৬ ভাগ সঙ্কুচিত হয়। সাইমেনস্ বলেন তিনি তাঁহার ভ্রাতার ড্রেসডেন নগরস্থ কাঁচের কারখানায় দেখিয়াছেন যে দ্রব কাঁচ শীতল হইবার সময় প্রথম খুব সঙ্কুচিত হয় কিন্তু কিছু পরে তাহার সঙ্কোচনের মাত্রা কমিয়া যায়, এমন কি বোধ হয় শেষে দৃঢ় হইবার মুহূর্ত্তে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কাঁচের সমধর্ম্মী, সুতরাং ভূগর্ভের পদার্থ চাপবৃদ্ধি হেতু যে কঠিন হইবে এমন বলা যায় না।

ভূগর্ভ সম্বন্ধে আর যে দুইটি মত বলিবার আছে তাহার যুক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত সামান্য। একটির স্থূল মর্ম্ম এই, পৃথিবী প্রকাণ্ড হাঁসের ডিমের

মত। ডিম্বস্থ শ্বেত পদার্থ যেমন তাহার উপরিস্থ খোলা এবং অভ্যন্তরের লোহিতাংশের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি পৃথিবীর আবরণ ও কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী-স্থান দ্রব পদার্থ পূর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর নিম্ন দুই ভাগকে বিযুক্ত করিতেছে।

বুন্‌সেন্ মোম গন্ধক প্রভৃতি পদার্থের উপর পরীক্ষা করিয়া বস্তুর দ্রাবণের সম্পর্কে উত্তাপের প্রভাবের বিষয়ে যাহা রলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া উপরিউক্ত মতটি অবস্থিত। এই মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন, পৃথিবীর যত নীচে যাইবে ততই অধিক চাপ আর চাপাধিক্য সহকারে কোন বস্তুকে গলাইতে যে কালে উত্তরোত্তর অধিক উত্তাপ লাগে, সে-কালে নিম্নের পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিতে ক্রমশ অধিক উত্তাপের আবশ্যক। কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা চাপ অধিক ; তথাকার পদার্থকে গলাইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপের আবশ্যক, তাহা কি কেন্দ্রে আছে ? তাঁহারা বলেন কেন্দ্রে অতিশয় উত্তাপ আছে বটে, কিন্তু তথাপি সেখানকার পদার্থকে দ্রব অবস্থায় রাখিবার উপযুক্ত প্রচণ্ড উত্তাপ সেখানে নাই, কাজেই তাহা সংঘাতকঠিন। কিন্তু তেমনি কেন্দ্র হইতে যত উপরে আসা যায় তত চাপ কমে, সেই হেতু ক্রমশ অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপেই তৎস্থানীয় পদার্থ দ্রব হয়, কাজেই কেন্দ্র ও পৃথিবীর আবরণের মধ্যস্থলে যে পরিমাণে উত্তাপের প্রভাব তাহাতেই সেই স্থানের পদার্থ দ্রব হইবে।

ভূবেত্তারা উপরিউক্ত মতে কোন আপত্তি করেন না ; সম্পূর্ণ তরল না বলিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ তরল বলিলেই তাঁহাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু উপরিউক্ত মতের যুক্তি সকল এত সামান্য যে তাহার মূল্য বড় কম। ইহা ব্যতীত পৃথিবী যে প্রকারে উৎপন্ন বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে স্থির হইয়াছে তাহার সহিত এ মতটী সম্পূর্ণ বিরোধী। সংঘাত হইবার কার্য্য যে পৃথিবীর কেন্দ্র স্থান হইতে আরম্ভ হয় না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ মতানুসারে পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন, কিন্তু ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বাষ্পময়। ইহার পক্ষপোষক যুক্তিগুলি নিতান্ত আনুমানিক, পূর্ব্বের মতের অপেক্ষা এইগুলি আরো অসার। এ মতের প্রবর্ত্তকেরা বলেন পৃথিবীর ঘনত্ব (Mean density) জলের ৫$\frac{১}{২}$ গুণ মাত্র। কিন্তু ভূগর্ভে এত বেশী চাপ, যে পৃথিবীর উপরিস্থ কঠিন পদার্থের দ্বারা ভূগর্ভ নির্ম্মিত হইলে চাপের আধিক্য বশতঃ ভূগর্ভস্থ পদার্থ এত ভারী হইত যে গড়ে পৃথিবী জল অপেক্ষা ৫$\frac{১}{২}$ গুণের অধিক ঘন হইত। কিন্তু তাহা যে-কালে হয় না তখন ইহা স্থির যে, ভূগর্ভ এমন পদার্থে নির্ম্মিত যাহা পৃথিবীর উপরিভাগে আনিলে অত্যন্ত লঘু হইবে। চাপের আধিক্যে বস্তুর যে ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় এই সত্যের উপরেই উপরি-উক্ত অনুমানটি স্থাপিত।

এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর ৮০ মাইল নিম্নে বাতাস জলের মত ভারী

হইবে, জল আবার ৩৬০ মাইল নীচে পারদের ন্যায় ভারী হইবে, এবং কর্দ্দম, যাহার প্রত্যেক ঘন ফুটের ভার পৃথিবীর উপরিভাগে ১ মণ ২১ সের, ৩৬০ মাইল নীচে তাহার ভার ১৬৮ মণ ৩০ সের হইবে, কিন্তু তাহা যে-কালে হয় না তখন ভূগর্ভ কেন্দ্র পর্য্যন্ত মাটীর মতন কঠিন দ্রব্যে নির্ম্মিত নহে ; সম্ভবতঃ ভূগর্ভ বাষ্পময়। সেই বাষ্প পৃথিবীর উপরে অত্যন্ত লঘু, কিন্তু চাপাধিক্য বশতঃ ভূগর্ভে তাহাতেই বেশ ভার হয়।

কিন্তু এই মতের প্রবর্ত্তকেরা যাহা বলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না, বাষ্পীয় পদার্থের উপর চাপ অর্পণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাপ বৃদ্ধি সহকারে ক্রমিকই যে ভারের বৃদ্ধি হইবে এমন নহে। বরঞ্চ দেখা যায়, ক্রমাগত চাপ বাড়াইলে শীঘ্রই এমন এক অবস্থা আসে যখন চাপাধিক্য অনুসারে তাহার আর ঘনত্ব বাড়ে না। যাহা হউক, চাপ-বৃদ্ধির দ্বারা যে কি হয় তাহা এখনো সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। পূর্ব্বে মনে হইত সমুদ্রের তলায় যেরূপ অধিক চাপ তাহাতে জীব জন্তু কিম্বা কর্দ্দম থাকিতে পারে না, কিন্তু আটলান্টিক সাগরের তলা হইতে প্রাণী ও নরম কাদা উঠান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখিয়া ওরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। মানুষের আয়ত্তাধীন চাপ প্রয়োগেই সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থ যখন জলাকারে পরিণত হইয়াছে তখন এত ভয়ানক চাপে ভূগর্ভে বাষ্প থাকা সম্ভাব্য নহে।

এই ত একটি একটি করিয়া চারিটি মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহাদের সকলের সমর্থনকারী যুক্তি সকল দেখিলে মনে হয় ভূগর্ভ যে তরল দ্রবপদার্থ-পূর্ণ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর।

ইহা ছাড়া ইতালিয় বৈজ্ঞানিক পালমিয়েরি[১১] বলেন, তিনি ঈটনা নামক জ্বালামুখীর গর্ভে জোয়ার ভাঁটা দেখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয় নাই। এ বিষয়টি সপ্রমাণ হইলে ভূগর্ভের তরলতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ইংলন্ডে বৈজ্ঞানিকদিগের শীর্ষ-স্থান-স্থিত রাজকীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা Sir G. Airy[১২] এ বিষয়ে বলেন, "I do think that a large portion of the central part of the earth is fluid and hot." —*On the Probable Condition of the Interior of the Earth* by Sir George Airy, K.C.B., F.R.S.&c.

ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭

পৃথিবীর উৎপত্তি

"না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারি
ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল
জয় জয় মহিমা তোমারি।"

এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে, এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্ধভাবে হৃদয়স্থ করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, এবং উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, সেই জন্য পৃথিবীর উৎপত্তির তথ্য জানিতেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মন উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-বিশিষ্ট সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ, যে একটির উৎপত্তির বিষয় জানিতে গেলেই, সমস্ত গুলির বিষয় সেই সঙ্গে জানিতে হয়।

সৌর জগৎ একটি বৃক্ষ স্বরূপ, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তাহার শাখা প্রশাখা। কোন একটি শাখার উৎপত্তির বিষয় ভাবিতে গেলেই, যেমন সর্ব্বাগ্রে বৃক্ষটির বিষয় ভাবিতে হইবে, তেমনি কোন একটি গ্রহের উৎপত্তি দেখিতে গেলেই জগতের উৎপত্তি আগে দেখা আবশ্যক। জগতের উৎপত্তি দেখিলেই পৃথিবীর উৎপত্তি আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী পাওয়া যায়। দু'এক জাতির কিম্বদন্তীতে সত্যের ছায়াও লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সত্যের ছায়া যে কি তাহা এস্থানে আলোচনা করা বাহুল্য, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর তত্ত্বানুসন্ধানের ফল নহে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার মানস-সম্ভূত কন্যা।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ দার্শনিক কান্ট[১৩] প্রথমে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন।

এই যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ছয়টি গ্রহ এবং নয়টি উপগ্রহ[*] চক্রাকারে আকাশে একই সমতলপথে ঘুরিতেছে ইহা কি কেবল একটি মাত্র দৈব ঘটনা হইতে উৎপন্ন, কিম্বা কোন অবিদিত নিয়মের ক্রিয়াফল? কান্ট ভাবিলেন, এতগুলি জ্যোতিষ্কের এরূপ একই পথে গতি কখনও দৈবাৎ হইতে পারে না, অবশ্য কোন এক সাধারণ-নিযম-বলে এই সমস্ত সৌর জগৎ একই পথে প্রধাবিত।

কিন্তু এমন কোন একটি সাধারণ নিযম, যাহা সমস্ত গ্রহ গুলির উপর খাটান যাইতে পারে, তাহা কি?

কোন পদার্থ দ্বারা জ্যোতিস্কগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে তাহারা এইরূপ সমসূত্রে চালিত হইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে শূন্যে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ যে ইথারময় আকাশে ঘোরে, সে ইথার এত সূক্ষ্ম যে তাহা পদার্থ নামের বাচ্য হইতে পারে না। তবে কোন পদার্থ দ্বারা সংযুক্ত না হইয়া সমস্ত গ্রহগুলির এ প্রকার আশ্চর্য্যজনক এক রূপ গতি হয় কেন? কান্ট অনুমান্ করিলেন, প্রথমে সৌর জগতের সমস্ত স্থান কেবল আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল এবং সেই পদার্থরাশির কোন কোন স্থান অপেক্ষা কোন কোন স্থান ঘন থাকায় ক্রমে মাধ্যাকর্ষণ-বলে সেই বাষ্প-জগতের লঘু অংশ, ঘন স্থানগুলির বাষ্পের সহিত মিলিয়া এক একটি গোলক রূপে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে সকল বস্তুই সকল বস্তুকে টানে এবং মাধ্যাকর্ষণ-বলেই ঘন পদার্থ লঘু পদার্থকে টানিয়া আত্মসাৎ করে। কিন্তু কান্টের অনুমানের একটি এই বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে — যদি বিশৃঙ্খল পদার্থরাশি, ঘন স্থানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গোলক হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক না হইয়া একটিমাত্র গোলক হইবার কথা। কেননা সেই বিস্তৃত বাষ্পরাশির যে কয়েক স্থান অধিক ঘন ছিল, সেই স্থানে চারি দিকের লঘু বাষ্প মিশিতে গিয়া প্রথমে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোলক হইতে আরম্ভ হইলেও মাধ্যাকর্ষণ ও যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে পরে সেইগুলি আবার একটি সাধারণ

[*] এই কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ মাত্র তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কেন্দ্রে আসিয়া একটি বৃহৎ গোলকরূপ ধারণ করিবে,—অর্থাৎ এরূপে মিশিবার সময় যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা আবার ঘন হইবে, তাহার আকর্ষণ দ্বারা কম ঘন স্থানগুলি তাহাতে মিশিয়া আবার একটি মাত্র গোলক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এতগুলি গোলক তবে কি করিয়া হইল? এ সমস্যা সম্বন্ধে কান্ট কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া ছোট গোলকগুলি বড় গোলকের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথে ঘুরিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক নহে।

সর উইলিয়াম হারসেল[১৪] যদিও অন্য যুক্তি দেখাইয়া বলেন, নীহারিকা রাশি হইতে জগৎ অভিব্যক্ত, কিন্তু তিনি সৌর জগতের গতি দেখিয়া তাহা বলেন না। দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা রাশির (Nebula) পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মনে হয় ক্রমে গাঢ় অংশের আকর্ষণে লঘু অংশ মিশিয়া এক একটি গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এত বহু সংখ্যক নীহাররাশি আবিষ্কৃত করেন যে তাহা হইতে তিনি এইরূপ একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। যে হীনপ্রভ বিশাল বিস্তৃত বাষ্পরাশি এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় নাই, আবার তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ছোট যে বাষ্পরাশির মধ্যভাগ এতদূর জমাট বাঁধিয়াছে, যে শীঘ্রই একটি জ্যোতিষ্ক হইবে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে ও যাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছে—এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে জ্বলন্ত নীহারিকা রাশি হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত। এবং আকাশে যে সকল নীহারিকা এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ক্রমে এক একটি জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা হারসেলের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

লাপ্লাস আবার সৌরজগতের গতির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে, যে আকাশে এখন গ্রহ উপগ্রহ সকল অবস্থিত তাহা এক সময় কেবল মাত্র জ্বলন্ত বাষ্পরাশি দ্বারা পূর্ণ ছিল। কান্টের ন্যায় লাপ্লাস কল্পনা করেন না যে, সর্ব্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা হইতে সৌর জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে, সৌর জগতের আদিম অবস্থায় বিশাল, জ্বলন্ত, গোলাকার বাষ্পরাশি আকাশে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশি একটি আবর্ত্তন-শলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। ক্রমে ক্রমে এই উত্তপ্ত বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে সকল ঘূর্ণমান পদার্থের গতির বেগ বৃদ্ধি হইয়া তাহার কেন্দ্রাতিগ

শক্তি বাড়ায়। ঘূর্ণমান গোলকের কোটীস্থ স্থানের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তথাকার কেন্দ্রাতিগ শক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা বাড়ে। একটা ঘূর্ণমান গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি এবং সেই প্রত্যেক অংশের উপর তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত সমান থাকে ততদিন সেই গোলকের প্রত্যেক অংশ পূর্ব্ববৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন অংশের কেন্দ্রাতিগ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অধিক হয়, তখন সে গোলক মূল গোলক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহারা কুম্ভকারের চক্র দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ পান। ঘূর্ণমান কুলালচক্র হইতে সতত বেগে মৃত্তিকা-খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যদি মৃত্তিকা বাষ্পের গুণবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে উক্ত বিচ্ছিন্ন মৃত্তিকা অঙ্গুরীয়কাকৃতি ধারণ করিত, এবং বাতাস প্রভৃতি বস্তুর বাধা না থাকিলে উহা মূল মৃত্তিকা-পিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে ঘুরিত। এইরূপে ক্রমে এই বাষ্পীয় গোলকের কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুবরেখা সন্নিহিত স্থল কেন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়কাকার চক্ররূপ ধারণ করিল। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ ঐ অতি বিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল। সেই মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য।

এক একটি স্বতন্ত্র চক্রের ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া ক্রমে আবার সেই চক্রগুলি একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিল।* পূর্ব্বোক্ত রূপে পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারা উপগ্রহ। যদি এমন হয় যে, কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেইহেতু আকর্ষণ সমান, তাহা হইলে তাহার পদার্থরাশি একস্থানে আসিয়া জমিতে না পাইয়া গোলকরূপে পরিণত হইতে পারে না, হয় তাহা চক্রাকারেই গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, যেমন শনিগ্রহের চক্র, নয় সে চক্র হইতে আসিয়া খসিয়া ছোট ছোট গ্রহমালা সৃষ্ট হয়।

লাপ্লাসের এই বিখ্যাত মতটি লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতে এত হুলস্থুল। এই মত অনুসারে সৌরজগতের সূর্য্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্য জ্যোতিষ্কগুলি

---

* আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন একটি চক্র না ভাঙ্গিয়া অখণ্ড ভাবে একটি গোলকরূপে পরিণত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন কালক্রমে অঙ্গুরীয়কাকার চক্রের ক্ষীণ অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক খণ্ড হইল কিন্তু সকল খণ্ড সমান ভারবিশিষ্ট এবং সমান দূরস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশের অধিক সংখ্যক একত্রে মিশিয়া এক একটি বৃহৎ বৃহৎ গোলকে পরিণত হইয়াছে।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। যদিও কোন কোন বৈজ্ঞানিক লাপ্লাসের এই মতের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু স্থূলতঃ ইহা বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে সর্ব্বত্র সমাদৃত। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই মতটিই জগতের দৃশ্যমান অবস্থার অধিকাংশ বিষয়ের কারণ দর্শাইতে সক্ষম। জগতের আদিম অবস্থা কল্পনা করিয়া অবরোহ প্রণালীতে লাপ্লাস যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, আরোহ প্রণালী অবলম্বন দ্বারা আধুনিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন ও হেলম্‌হলট্‌স্‌,[১৫] সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

এই পৃথিবীর উপরে যে সকল কাজ হইতেছে, সকল কার্য্যেই সূর্য্যের উত্তাপ ব্যয়িত হয়। কি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া, আর কি একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত চূর্ণ হওয়া, সকলি সূর্য্য উত্তাপ দ্বারা সম্পাদিত। একদিন সূর্য্য হইতে উত্তাপ না আসিলেই পৃথিবীর সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই যে পৃথিবীর জীবন-রক্ষণকারী উত্তাপ, যাহা আমাদের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া মনে হয়, তাহা সূর্য্যের হিসাবে অতি সামান্য। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বসুদ্ধ সূর্য্য তাহার, ২,১৭,০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীরিত করিতেছে।

কিছুকাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপের ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, যে হেতু শক্তির ক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না— শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র।

তাহা হইলে সূর্য্য সেই আদিম কাল হইতে উত্তাপ রূপে যতটা শক্তি ব্যয় করিতেছে, সেই শক্তি আবার ত অমনি আপনা হইতে জন্মাইতে পারে না, তবে কেমন করিয়া সে ক্ষতি পূরণ হইয়া সূর্য্যে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে? আমাদের পৃথিবীতে আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশই যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক সূর্য্যেরও ত সেইরূপ কিছু চাই এবং গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপে ইন্ধনের কাজ করিয়াও থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে।

সূর্য্য যে পরিমাণ উত্তাপ বিক্ষেপ করে তাহা সমভাবে রক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক ১০০শত বৎসরে পৃথিবীর মত একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ তাহার উপর পড়া চাই, তাহা হইলেই তাহার ১০০ বৎসরের উত্তাপ জমা থাকে, কিন্তু তাহা যে-কালে পড়ে না, তবে কোথা হইতে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা হইতেছে!

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্য রূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই তাহা হইতে আবার নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে শুনিলেই হঠাৎ কেমন ধাঁধাঁ লাগে। কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন বস্তু যতই শীতল হইতে থাকে ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে উত্তাপ ফেলিয়া দেয়, এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে শীঘ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে — *কোন বাষ্পীয় পদার্থে এই নিয়মটি বিশেষ রূপে খাটে* — এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন অর্থাৎ তরল না হইবে, ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে আর খাটিবে না। এইরূপ উত্তাপ বিক্ষেপ দ্বারা সূর্য্য যে উত্তাপ হারাইতেছে, আবার নূতন সঙ্কোচনের দ্বারা সে ক্ষয় পূরণ হইতেছে। উত্তাপ রক্ষণের এই মতটি যে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুযায়ী তাহা নহে, অঙ্ক গণনা দ্বারাও ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়।

সূর্য্য কত উত্তাপ-শক্তি ব্যয় করে, তাহা বিদিত বলিয়া সমভাবে উত্তাপ রক্ষা করিতে প্রতিবৎসর সূর্য্যের কতটুকু সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যক তাহাও স্থির করিতে পারা যায়। এখন সূর্য্যের যেরূপ আয়তন, সেই আয়তনে প্রত্যেক বৎসরে ২২০ফিট সূর্য্য-ব্যাস সঙ্কুচিত হইলেই এখনকার উত্তাপ পরিমাণ রক্ষিত হইবে। এই নিয়মানুসারে সূর্য্য ২৫ বৎসরে ১ মাইল ও এক শতাব্দীতে ৪ মাইল সঙ্কুচিত হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যত দিন সূর্য্যের অধিকাংশ বাষ্পময় থাকিবে ততদিন শীতলতা-প্রবণ সূর্য্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের উত্তাপ শক্তি সমভাবে রক্ষা করিবে। আমরা সূর্য্যের যত উত্তাপ পাই, সর্ব্বসুদ্ধ এখন সূর্য্য তাহার ২,১৭,০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ বৎসরে বিকীর্ণ করে, এবং সূর্য্য আদিম কাল হইতেই এইরূপ সম পরিমাণ উত্তাপ দিতেছে এই স্থির করিয়া দেখা যায়, এই সম পরিমাণ উত্তাপ দিবার নিমিত্ত প্রত্যেক শতাব্দীতে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কুচিত হয়। এই সকল জানিয়া গণনা দ্বারা অতীত কালের সূর্য্যব্যাস স্থির করা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। এই নিয়মানুসারে ১০০বৎসর পূর্ব্বেই সূর্য্য ৪ মাইল বড় ছিল, দুশ বৎসরে ৮ মাইল, এই রূপে এক সময়ে সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা! এইরূপে আরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা পরিশেষে লাপ্লাসের কল্পিত জগৎব্যাপী সূর্য্যের বাষ্পাবরণেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সূর্য্য-পরিত্যক্ত বাষ্পীয়-চক্র ক্রমে একটী গোলক রূপ ধারণ করিয়া পরে কিরূপে গ্রহ হইয়া দাঁড়ায় এই বার দেখা যাউক। সেই বাষ্পময় গোলকটি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইয়া ঘন অর্থাৎ তরল হইতে থাকে। তরল গোলক ঘুরিলে যন্ত্রবিদ্যার নিয়মানুসারে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায়, এবং তাহার বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ স্ফীত হইয়া উঠে। গোলকের আবর্ত্তনকালে তাহার সকল অংশ একই সময়ে একবার ঘুরিয়া আইসে ; মেরুর নিকটস্থ স্থান যে সময়ে একটা ক্ষুদ্র রেখাকে বেষ্টন করে, সেই সময়ের মধ্যে বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থান একটা বৃহৎ রেখাকে আবর্ত্তন করে। যদি দুই বস্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ দুইটি রেখা একই সময়ে আবর্ত্তন করে তবে বৃহৎ-রেখা-আবর্ত্তক বস্তুটি যে অধিক দ্রুতগামী তাহার সন্দেহ নাই। এক কথায়, মেরুসন্নিহিত স্থান অপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া তাহা কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক চাপা হইয়া পড়ে।

সূর্য্য-পরিত্যক্ত একটি বাষ্প-চক্র এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর গোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ অবলম্বন করিয়া নিউটন পৃথিবীর বিষুবরেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অবনতির যে পরিমাণ স্থির করেন, পরে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মাপিয়া তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সভা কর্ত্তৃক ক্লেইরো, কামু, লেমনিয়ে,[১৬] লাপ্লাণ্ড দেশে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহারা আবি-উটিয়ে ও শেলস্যাসের[১৭] সহিত একত্রে যখন পৃথিবীর একটি বৃত্তাংশ (Arc) মাপেন তখন সেই এক সময়েই বুগে ও কঁদামিন[১৮] দক্ষিণ আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ স্থির করেন। এই দুইটি পরিমাণ অবলম্বন দ্বারা অঙ্ক গণনা করিয়া নিউটনের গণনার ফল নির্ভুল বলিয়া স্থির হয়।

পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা ও কোটিদেশ স্ফীত বলিয়া এক প্রকার নিশ্চয় বলা যায়, পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল, কেননা একটা কঠিন বস্তু (যেমন প্রস্তর ইত্যাদি) চিরকাল ঘুরিলেও তাহার কোন স্থান চাপা কোন স্থান স্ফীত হইবে না, কিন্তু তরল পদার্থনির্ম্মিত গোলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঘুরিলে তাহার উপর ও নিম্নদিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে।

এইরূপে বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল এমন নহে, কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল, এবং তাহার কতকাংশ এখনো পৃথিবীর উপরে

রহিয়াছে, তবে যে সময়কার কথা হইতেছে সে সময়ে এখনকার অপেক্ষা যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সে বাষ্প বিস্তৃত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর তখনকার বাষ্পাবরণ প্রায় চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০ সেন্‌টিগ্রেড ডিগ্রির পরিমাণ ছিল। তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে, ১০০ ডিগ্রি উত্তাপই জীব জন্তুর প্রাণ নাশক, ২০০০ হাজার ডিগ্রি উত্তাপের ফল কি ভয়ানক তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য এবং অপর যে সকল বস্তু এই ভয়ানক উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া যায় তাহারা তখন বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবীর উপরে ভাসিতে লাগিল।

এই ২০০০ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড উত্তাপ লইয়া তরল পৃথিবী শীতল আকাশ-পথে ঘুরিতে লাগিল। যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, সেখানকার উত্তাপ অতি অল্প। লাপ্লাসের মতে সেখানে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রির নীচের একশত ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উত্তাপ থাকে না। এই শীতল আকাশ সংস্পর্শে আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে পৃথিবীর উত্তাপ অনেক কমিতে লাগিল, এবং শীতলতাবশতঃ ভূপৃষ্ঠের তরল পদার্থ ক্রমে ঘন হইয়া চটচটে হইতে লাগিল। আর একটি কথা এই, জোয়ার ভাঁটার সাহায্যেও পৃথিবীর শীতল হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। কোন তরল বস্তুকে নাড়িয়া দিলে সে উত্তাপ ফেলিয়া দিয়া শীঘ্রই শীতল হয়, জোয়ার ভাঁটার কার্য্যগুণে পৃথিবীর সকল অংশই এক একবার উপরিভাগে উঠিয়া শীঘ্র শীতল হইতে লাগিল। এইরূপে সময়ে পৃথিবী যখন কিছু শীতল হইল তখন মেরু-সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের ন্যায়, অর্দ্ধ তরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থ-রাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এইরূপ জমাট পদার্থরাশিতে আবৃত হইয়া তাহার উপরের দিব্য এক আবরণ সৃজিত হইল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আবরণে আভ্যন্তরিক জোয়ার ভাঁটা রোধ করা অসম্ভব, সুতরাং সেই আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে তরল পদার্থরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখনকার পৃথিবীর অবস্থা — সেই উত্তপ্ত পদার্থরাশির ভীষণ বলে কম্পমান পৃথিবীর অবস্থা — বর্ণনা অসম্ভব। সেই উৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশি ক্রমে শীতল হইয়া পর্ব্বত শ্রেণীরূপ ধারণ করিল।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণীসমাকীর্ণ, বাষ্পরাশি-আবৃত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একবিন্দু জল নাই। পৃথিবীর উত্তাপ যখন আরো হ্রাস হইল, যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইল, তখন সেই বাষ্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল। পৃথিবীর উপর প্রথম বৃষ্টিপতন এক নূতন যুগের আরম্ভ।

উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহা আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতলাকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পড়িল। জলের এইরূপ ঘন ঘন অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে ও বিদ্যুতালোকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তোলপাড় হইয়া উঠিল।

এইরূপ ভীষণ কোলাহলময় ভৌতিক যুদ্ধ যে কতদিন চলিল তাহার স্থিরতা নাই, এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় যে জলই শেষে বিজয়ী হইয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিলে, সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া সদর্পে দু' একটি সূর্য্যকর দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেই জলপ্লাবিত পৃথিবী সূর্য্যালোক প্রভাবে এখনকার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ, ১৮০২ শকাব্দ

সৌর-পরিবার

"তারকা কনক কুচি, জ্বলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।"

নিস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকামালাখচিত অনন্ত-নীল নভোমণ্ডল দেখিলে সকলেই রোমাঞ্চিত হয় — সকলের হৃদয়ই অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন অসাড়চেতা কেহই নাই যে তাহার মনশ্চক্ষু তারকাপূর্ণ আকাশে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তাক্ষর-লিখিত অনন্ত জীবনের অনন্ত কাব্য না পড়ে।

এই অসীম আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান অসংখ্য সুবর্ণ বালুকা-কণার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলার ভিতরেও একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন কতকগুলি মানুষের সমষ্টি পরিবার, কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি সম্প্রদায়, কতকগুলি সম্প্রদায়ে জাতি, কতকগুলি জাতিতে একটি রাজ্য এবং কতকগুলি রাজ্যে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী, জ্যোতিষ্ক জগতেও সেইরূপ।

পৃথিবী এবং অপর কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটি পরিবার — সূর্য্য এই পরিবারের কর্ত্তা। এই রূপ কত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক-পরিবারের কর্ত্তা, — লক্ষ লক্ষ সূর্য্য — ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান, তাহার সীমা নাই। নক্ষত্র-খচিত যে অল্পমাত্র আকাশখণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হয়, সেই আকাশে সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সকল নক্ষত্রই এক একটি সূর্য্য— এই সকল সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। জ্যোতির্ব্বিদদিগের অধ্যবসায়ে এই সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অসংখ্য অসংখ্য বৃহত্তর সূর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনন্ত আকাশের এক ক্ষুদ্র খণ্ডে আমরা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃশালী যে একটি বিস্তৃত আলোকরেখা দেখিতে পাই, যাহাকে আমরা ছায়াপথ বলি, দূরবীণ পরীক্ষা দ্বারা সেই ছায়াপথেই হারসেল ১৮০ লক্ষ সূর্য্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একটির পর একটি করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে মিশিতেছে, যাহা আমরা দেখিতেও পাই না। এই অনন্ত আকাশমণ্ডলে কত সহস্র সহস্র সূর্য্য, সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-জগতের সম্রাট রূপে ঘুরিতেছে তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত।

প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি ১৮০ লক্ষ মাইলেরও অধিক, কিন্তু আমাদের নিকট হইতে ঐ সকল তারকাবলী এত দূরে স্থিত যে ঐরূপ প্রভূত দ্রুতগতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। এই অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎ-মধ্যে পৃথিবী অতি সামান্য বলিলে কিছুই বলা হয় না। পৃথিবী প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-জগতের কর্ত্তা যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ গুণ বড়, সেই সূর্য্যই যখন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে একটি বিন্দু-স্বরূপ — তখন পৃথিবী ইহার একটি অণুকণার সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

আমরা আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই — তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম — স্থির নক্ষত্র

দ্বিতীয় — গ্রহ

তৃতীয় — উপগ্রহ কিম্বা চন্দ্র

পৃথিবী সম্পর্কে যে সকল জ্যোতিষ্ক চিরকালই এক স্থানে অবস্থিতি করে তাহারা আমাদের পক্ষে স্থির। আমরা যে কয়েকটি জ্যোতিষ্ককে সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত বলিয়া জানি—তাহা ছাড়া আমাদের পক্ষে সকলেই স্থির নক্ষত্র। কেননা পৃথিবীর দৈনিক গতি হেতু পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির নক্ষত্রগুলিও একটু একটু করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রতিদিন একবার করিয়া দৃশ্যত ঘুরিয়া যায় — কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত ইহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না। স্থির নক্ষত্র আজও আকাশে অন্যান্য যে যে নক্ষত্রের সহিত যতটুকু দূরে অবস্থিত, আমাদের নিকট চিরকালই সেই রূপ দেখাইবে—সেই জন্য প্রকৃতপক্ষে ইহারা স্থির না হইলেও আমাদের নিকট ইহারা স্থির। আসল কথা, ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে অবস্থিত যে আমাদের নিকট তাহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। সূর্য্যও এইরূপ একটি স্থির নক্ষত্র।

যে সকল জ্যোতিষ্ক অন্য নক্ষত্রের সম্পর্কে আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করে তাহারা গ্রহ। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়াই অতি প্রাচীন কাল হইতে বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ স্থির-নক্ষত্র-মণ্ডলী হইতে ভিন্ন-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। আজ আমরা যে গ্রহটিকে অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত যে সম্বন্ধে অবস্থিত দেখি, কাল তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, সুতরাং পৃথিবীর গতি হেতু ইহারা একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দৃশ্যতঃ ঘুরিয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, ইহাদের নিজের একটি স্বতন্ত্র গতি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়।

গ্রহগণের চারি দিকে আবার যাহারা ঘোরে তাহারাই উপগ্রহ।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক ব্যতীত ধূমকেতু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা প্রভৃতি অন্য শ্রেণীভুক্ত যে সকল জ্যোতিষ্ক আছে তাহা সচরাচর আমরা আকাশে দেখিতে পাই না, সেই জন্য এস্থলে তাহার উল্লেখ হইল না।

এই তিন শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমরা যে সকল গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাই তাহারা সূর্য্য-পরিবার-ভুক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যকে লইয়া নযটি গ্রহ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

কিন্তু রাহু কেতু প্রকৃতপক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে এবং চন্দ্র সূর্য্যও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে পারে না — সূর্য্য একটি স্থির নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর যে কক্ষের কল্পিত দুই স্থান পরস্পরকে পরস্পর এক এক বার ছুঁইযা ছুঁইয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ স্থলে আসিলে গ্রহণ হয়, সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাহু কেতু নাম দিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, ইযুরেনস্, নেপচুন, পৃথিবী এই আটটি সূর্য্যের গ্রহ।

এই গ্রহগুলির মধ্যে আবার কোনটির কযটি উপগ্রহ আছে তাহা পরে বলা যাইবে।

ইহার মধ্যে বুধ মঙ্গল ও শুক্র ছাড়া আর সকল গ্রহ অপেক্ষাই পৃথিবী আয়তনে ছোট। এবং এই আটটি গ্রহের সমষ্টিতে যে আয়তন হইতে পারে সূর্য্য তাহা অপেক্ষাও বৃহদায়তন। সূর্য্যের এই পরিবারবর্গ আবার দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দল নিকটস্থ, দ্বিতীয় দল দূরস্থ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এই চারটি গ্রহ সূর্য্যের নিকটস্থ পরিবার; বৃহস্পতি, শনি, ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন সূর্য্যের দূরস্থ পরিবার। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা উপরোক্ত দুই দলের মধ্যে থাকিয়াই উহাদের ভাগ করিয়াছে। বুধ সূর্য্য হইতে ৩৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ৮০ দিনে ইহা একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। শুক্র ৬৬০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ২২৪ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ৯১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রহ দুইটি অপেক্ষা ইহার উপর সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘন্টায় একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গল ১৩৯০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ৬৮৬ দিনে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে। ৬৮৬ দিনে আমাদের প্রায় দুই বৎসর হয়।

মঙ্গলের কক্ষের বাহিরেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা অবস্থিত। ইহাদের সংখ্যা যে কত তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। দূরবীণ যন্ত্রের পরীক্ষা

দ্বারা ক্রমাগত ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখন যদিও ১৭২ সংখ্যক গ্রহমালা ব্যতীত আর আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি ইহাদের যে সংখ্যার এইখানেই শেষ তাহা বলা যায় না। দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কেবল চক্ষু দ্বারা ইহাদের দেখা যায় না। এই গ্রহপুঞ্জের কক্ষের বাহিরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৭৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৪৩৩৩ দিন লাগে — বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র আছে।

বৃহস্পতির পর শনি, শনির আবার ৮টি উপগ্রহ। সূর্য্য হইতে শনির দূরত্ব ৮৭২০ লক্ষ মাইল, এবং ১০৫৯০ দিন অর্থাৎ আমাদের প্রায় ৩০ বৎসরে শনি একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে।

ইয়ুরেনস্ এবং নেপচুন অল্পদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হারসেল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁহার দূরবীণ দ্বারা ইয়ুরেনস্ গ্রহ আবিষ্কৃত করেন। ইহা একটি ধূমকেতু বলিয়া প্রথমে তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, পরে দুই তিন সপ্তাহ ইহার গতিবিধি গণনা দ্বারা ইহা একটি গ্রহ বলিয়া প্রমাণ হইল। গণনা দ্বারা নক্ষত্রদিগের মধ্যে ইহার পথ স্থির হইয়া গেলে তখন প্রকাশ হইল, যে হারসেলের আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে অনেক বার অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা ইহাকে দেখিয়া স্থির নক্ষত্র মনে করিয়াছিলেন, ইহা যে একটি গ্রহ তাহা কাহারো সন্দেহ হয় নাই। এই গ্রহের অনেক নাম প্রদানের পর শেষে ইয়ুরেনস্ নামটিই ধার্য্য হইল। হারসেল দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া ইহার অন্যান্য অনেক নাম প্রদানের প্রস্তাবের সহিত হারসেল নাম রাখিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিই কাহার মনঃপূত হইল না। অন্যান্য সকল গ্রহই এক একটি রোমীয় দেবতার নামে অভিহিত, সুতরাং এইটিরও শেষে একটি দেবতার নাম হইতে নাম রাখা স্থির হইল। রোমীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে ইয়ুরেনস্ দেবতাদিগের রাজা জুপিটরের পিতামহ। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হইলে কিছু দিন পরে আর একটি যে গ্রহ আবিষ্কৃত হইল তাহারও রোমীয় দেবতাদিগের নাম হইতে নেপচুন নামকরণ হইল। নেপচুন অর্থাৎ বরুণ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বুভার[১৯] নামক এক জন ফরাসী পণ্ডিত বৃহস্পতি শনি ও ইয়ুরেনসের গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রথমোক্ত দুইটি গ্রহের গতি যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, শেষোক্তটির সেরূপ নহে। পুরাতন গণনার কোন ভুল আছে ভাবিয়া বুভার গ্রহগুলির গতিবিধি আবার নূতন করিয়া গণনা করিলেন। কয়েক বৎসর পরেই আবার ইয়ুরেনস্ সম্পর্কে বুভারের গণনার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা লেভেরিয়ে[২০] ইয়ুরেনসের গতির এই ব্যতিক্রমের কারণ নির্ণয় করিতে যত্নশীল হইয়া স্থির

করিলেন, অবশ্য এই গ্রহের নিকটে এমন আর একটি গ্রহ আছে, যাহার আকর্ষণ হেতু ইহার গতি ঈষৎ অন্য রূপ হইতেছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নেপচুন দেখিবার অগ্রেই নেপচুন কোন্ স্থানে আছে, তাহার কি রূপ ভার, কি রূপ আয়তন, তাহা জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা লেভেরিয়ে ঠিক করিলেন। ইহার পরে সেই গণনা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেপচুন দূরবীণ দ্বারা আবিস্কৃত হইল। ইংরাজেরা বলেন এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লেভেরিয়ের একার প্রাপ্য নহে। লেভেরিয়ের এই আবিষ্ক্রিয়ার দুই বৎসর পূর্ব্বে জন অ্যাডাম্‌স্[২১] নামক কেমব্রিজের এক জন ছাত্র ইয়ুরেনসের গতির এরূপ ব্যতিক্রম শুনিয়া এ সম্বন্ধে গণনায় প্রবৃত্ত হইযাছিলেন, এবং নেপচুনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাজকীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা অধ্যাপক এয়ারিকে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি অ্যাডাম্‌সের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করায় তাঁহার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না। সুতরাং লেভেরিয়ে কর্ত্তৃক নেপচুন অগ্রে আবিস্কৃত হইল। সেই অবধি এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রশংসা লইবার জন্য ফ্রান্স ও ইংলন্ডে এখনো বিবাদ চলিতেছে। ইয়ুরেনস্ সূর্য্য হইতে ১৭৫৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া আমাদের ৩০৬৬০ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে. ইহার ৪টি চন্দ্র।

নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত। ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৪৬০ লক্ষ মাইল দূরে, এবং সূর্য্যকে একবার ঘুরিতে ইহার ৬০১২৬ দিন লাগে। পৃথিবীর ন্যায় নেপচুনের একটি মাত্র চন্দ্র।

অনন্ত কাল হইতে এইরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার কারণ কি ? কি শক্তির বলে এইরূপ হইতেছে ? শক্তি প্রয়োগ দ্বারা পৃথিবীর কোন বস্তুকে চালিত করিলে আবার কতক্ষণ পরে তাহা থামিয়া যায়, উর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত পদার্থ মাটীতে আসিয়া পড়ে ; তাহা দেখিয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল গ্রহদিগকে চিরন্তন একই পথে চালিত করিতে নূতন নূতন শক্তির প্রয়োজন। তাঁহারা বলিতেন, সূর্য্য হইতে এক শক্তি নির্গত হইয়া গ্রহদিগকে চালিত করিতেছে এবং অপর এক শক্তি পৃথিবীকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। অতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা মিসর দেশীয় টলেমি,[২২] যিনি দ্বিতীয় খৃষ্ট-শতাব্দির মধ্য ভাগে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য্যাদি নক্ষত্র প্রত্যহ পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিতেছে এই মতটি প্রথমে বিধিমত লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর মতে পৃথিবী স্থির, সুতরাং পৃথিবীকে চালাইতে তাঁহার নূতন শক্তির অবতারণা করিতে হয় নাই।

শক্তি যে অবিনশ্বর এবং কোন বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করিলে বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে শক্তির চালক-কার্য্য যে চিরকাল থাকিবে, এ সত্যটি প্রাচীন

পণ্ডিতেরা জানিতেন না। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিউটনের অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক গেলিলিও ও হাইগেন্‌স্[২৩] গতি বিষয়ক অনেকগুলি নিয়ম আবিস্কৃত করেন। নিউটন তাহার পরে গতি বিষযক সমস্ত নিয়ম বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করেন এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে সেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তিনিই প্রথমে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃতির দৃশ্যতঃ বৈষম্যের মধ্যেও যে একটি বিশেষ সাম্য আছে, তাহা তাঁহার চক্ষেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। যে শক্তির বলে বৃন্তচ্যুত আম্র পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে, এক খণ্ড প্রস্তর উঠাইতে আমাদের বলের প্রয়োজন হয়, সেই শক্তির বলেই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলে চলিতেছে, ইহা তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন।

নিউটনের বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়া বিশেষ রূপ বুঝাইবার স্থান বর্ত্তমান প্রস্তাব নহে, তবে মাধ্যাকর্ষণের স্থূল নিয়ম এই ;

প্রথম, বিশ্বসংসাবের প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করিতেছে। দ্বিতীয়, প্রত্যেক অণু যখন আকর্ষণ-শক্তির আধার, তখন যে পদার্থে অণু-সমষ্টি অধিক, তাহার কলেবর হ্রস্ব হইলেও তাহার আকর্ষণী শক্তি অধিক। এবং দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটি অধিক অণুবিশিষ্ট তাহা অপরটিকে টানিয়া আত্মসাৎ করে।

তৃতীয়, পদার্থদিগের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে এই আকর্ষণের বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। দুইটি বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক হইবে তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবধান থাকিলে আকর্ষণের বলের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ হইবে। এবং অর্দ্ধেক ব্যবধান হইলে আকর্ষণের বল চতুর্গুণ হইবে।

নিউটন আরো বলেন, কোন বস্তু একবার চালিত হইয়া যতক্ষণ বাধা না পায়, ততক্ষণ ক্রমাগত চলিতে থাকে। পৃথিবী হইতে আমরা যদি কোন প্রস্তর-খণ্ড ছুঁড়ি, তাহা চিরকাল না চলিবার প্রধান দুই কারণ ; প্রথম, বাতাসের বাধা ; দ্বিতীয়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই, যদি প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে আকর্ষণ করে এবং অধিক অণুবিশিষ্ট বস্তু অল্প অণুবিশিষ্ট বস্তুকে আত্মসাৎ করে তাহা হইলে সূর্য্য গ্রহ-মণ্ডলীকে কেন আত্মসাৎ করে না ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দূরত্ব অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির হ্রাস হয়। সূর্য্য গ্রহমণ্ডলী হইতে এত দূরে স্থিত যে তাহাদের আত্মসাৎ করিতে গেলে যতটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক, গ্রহগণের উপর সূর্য্যের তত শক্তি নাই ; তাহাতেই তাহারা আপনাদের রক্ষা করিতে পারে। সূর্য্যকে গ্রহগণ কেন

চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করিতেছে এইবার দেখা যাউক।

সকল পদার্থের ধর্ম্ম এই যে, একবার চালিত হইলেই তাহা চিরকাল সরল রেখাপথে চলিতে সচেষ্ট হয়। এই শক্তি প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে গ্রহগণ সরল-রেখাভিমুখে পলায়ন করিতে যত্নশীল। ইহাকেই কেন্দ্রাতিগ গতি বলে। সূর্য্য ক্রমাগত যতই গ্রহদের আপন কেন্দ্রাভিমুখে টানিতেছে, গ্রহগণ ততই সেই আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া সরল রেখায় পলাইতে চেষ্টা করিতেছে।

এই দুই শক্তি মিলিয়া গ্রহগণের একটি যে বৃত্তাকার গতি হইতেছে, সেই গতিতে উহারা ক্রমাগত সূর্য্যকে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। এই দুই শক্তির যতক্ষণ সামঞ্জস্য ততক্ষণ কেহই কক্ষচ্যুত হয় না, ইহার কোনটার আধিক্য হইলেই অমনি বিশৃঙ্খলতা ঘটে। কোন্ গ্রহটি কাহাকে কিরূপ বলে টানিতেছে — ইহার গণনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহগণের ভার স্থির করেন।

যে সকল গ্রহ উপগ্রহের কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা ব্যতীত আমরা কখন্ কখন যে ধূমকেতু দেখিতে পাই, তাহারা সূর্য্যের পরিবার-ভুক্ত কিম্বা সৌর জগতের অতিথি মাত্র। এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কাল হইতে একটি কুসংস্কার দেখা যায়। ধূমকেতোরুদয়েন প্রজাক্ষয়ং সূচ্যতে। ধূমকেতু যেরূপ পথে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে তাহা গ্রহগণ হইতে ভিন্ন প্রকারের, সেই জন্য ধূমকেতুর সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে অনেক বৎসর লাগে, এমন অনেক ধূমকেতু দেখা গিয়াছে যে তাহারা একবার উদয় হইয়াই অমনি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ সকল ধূমকেতু সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আর ফিরিয়া আসিবে কি না তাহা আজও পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। বহুকালব্যাপী জ্যোতিষিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে দুই তিনটি ধূমকেতু মাত্র নিয়মিত সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। হ্যালির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৭৪ বৎসরে একবার করিয়া দেখা দেয় এবং এনকির আবিষ্কৃত ধূমকেতু ৫ বৎসরেই একবার উদয় হয়। গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া আমরা সূর্য্যের পরিবারভুক্ত আর এক জাতীয় জ্যোতিষ্ক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, ইহাদের সাধারণ নাম উল্কাপিণ্ড। সচরাচর আমরা ইহাকে তারা খসা বলি। এই উল্কাপিণ্ডের মধ্যে আবার একটি বিশেষ দল (Zodiacal light) সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। প্রতি বৎসর শরদাগমে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাই। ইহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ এখনো আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহি।

আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তারা ঠিক করিয়াছেন যে উল্কাপিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পথে উল্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করে, সেই পথেই ধূমকেতু উদিত হয়। বোধ হয়

বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল নীহারিকাময় ধূমকেতু উৎপাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শক্তির অধীনে পৃথিবীর একটি বালুকাকণা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে চালিত হইতেছে তাহা ভাবিলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৮০৩ শকাব্দ

সূর্য্য

আমরা নক্ষত্র জগতের সাধারণ বিবরণ সংক্ষেপে একরূপ বলিয়াছি, এখন যে নক্ষত্রটির সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহার উত্তাপ প্রভাবে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষচালনা হইতে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শৃঙ্গের ধূলিকিরণ পর্য্যন্ত সম্পাদিত, এবং যাহার আকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় কত গ্রহ-উপগ্রহ সম্পন্ন সৌরজগতের শৃঙখলা সুরক্ষিত, তাহার বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই কোন না কোন এক সময়ে এই সূর্য্যকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা জ্ঞানে পূজা করিত। আদিম অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই অসীম-প্রভাবশালী সূর্য্যের গূঢ় রহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া ভয়-বিস্মিত চিত্তে যে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমাদের হৃদয় একদিকে সেই অন্ধ ভয়বিস্ময়ের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দিকে এই সূর্য্যকে সেই জ্যোতির জ্যোতি অনাদি কারণের মহিমা রূপে দেখিয়া উত্তরোত্তর আরো বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

সূর্য্যের দূরত্ব, আয়তন ও ভার

অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান, জ্যোতির্ম্ময় এই বিশাল সূর্য্য প্রভূত দূরত্ব নিবন্ধন যদিও আমাদের নিকট একটি অনতিবৃহৎ গোলক রূপে প্রতিভাত, তথাপি অন্যান্য তারকাগণের তুলনায় ইহা আমাদের নিতান্ত নিকটে অবস্থিত। অন্যান্য তারকাগণ পৃথিবী হইতে এত দূরে যে তাহাদের দূরত্ব নির্ণয় করা এখনো বৈজ্ঞানিকগণ দুঃসাধ্য বিবেচনা করেন—কিন্তু সূর্য্যের দূরত্ব তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই, সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯,১০,০০,০০০ মাইল দূরে বিরাজমান। এখন কোন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হইলে তাহার আয়তন স্থির করাও সহজ, সুতরাং সূর্য্যের দূরত্ব জানিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আয়তনও জানিয়াছেন। সূর্য্যের ব্যাস ৮,৫৩,৩৮০ মাইল। অর্থাৎ সূর্য্য তুল্য একটি গোলক প্রস্তুত করিতে হইলে ১২ লক্ষ পৃথিবীরও অধিক পৃথিবী আবশ্যক। অন্য কথায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১,২০,০০,০০০ লক্ষ গুণেরও অধিক বৃহৎ।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ঘন্টায় ৩০ মাইল যায় এমন একটি রেলগাড়ীতে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস লাগিবে, কিন্তু এইরূপ বেগগামী রেলগাড়ীতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে ৯ বৎসরেরও অধিক সময় লাগে।

এইরূপ তুলনায় সূর্য্যের দূরত্বও অপেক্ষাকৃত সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আলোকে চড়িয়া সাড়ে আট মিনিটে পৃথিবী হইতে সূর্য্যে যাওযা যায়— কিন্তু যদি উক্ত রূপ বেগগামী বেলগাডীতে সূর্য্যে যাওয়া যাইত তাহা হইলে প্রায ৩৩৮ বৎসর লাগিত।

যে পরিমাণে সূর্য্য পৃথিবী হইতে বৃহদাকার সে পরিমাণে কিন্তু পৃথিবী হইতে গুরুভার নহে। সূর্য্যের সমপরিমাণ পদার্থ পৃথিবীর সমপরিমাণ পদার্থ হইতে ৪ গুণ লঘু, সুতরাং সূর্য্যের ন্যায একটি বৃহৎ গোলক গঠিত করিতে ১২ লক্ষ পৃথিবীর আবশ্যক হইলেও মোট তিনলক্ষ পৃথিবী একত্র করিলেই সূর্য্যের সমান ভার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমগ্র সূর্য্যের ভার পৃথিবী হইতে ৩,০০,০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্যের অভ্যন্তর

এই যে গুরুভার বৃহদাযতন, অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, অসীম জ্যোতির্ম্ময সূর্য্য, ইহা একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে — ইহার পূর্ব্ব কথিত ব্যাসযুক্ত সুগভীর অভ্যন্তর দেশ সমস্তই বাষ্পময়। এখানে চাপের যেমন আধিক্য, উত্তাপের তেমনি প্রাচুর্য্য, তাপ ইহাকে তরল করিয়া ফেলিতে উদ্যত, উত্তাপ ইহাকে বাষ্পাকারে রাখিতে সচেষ্ট, এতদুভয়ের পরস্পর কার্য্য দ্বারা অভ্যন্তর প্রদেশ যেরূপ ঘন বাষ্পাকার অবস্থায় রক্ষিত তাহাতে কোন প্রকার রাসায়নিক কার্য্য হওয়া অসম্ভব। এই অভ্যন্তর দেশই সূর্য্য-লোকের মর্ম্ম-স্থান। ইহার বাষ্পীয়ত্বই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইবার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

সূর্য্যের আলোকমণ্ডল

আমরা সূর্য্যের জ্বলন্ত উজ্জ্বল যে গোলাকার অংশ প্রত্যহ চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই উপরোক্ত অভ্যন্তরের আবরণ স্বরূপ। এই স্থান হইতে আমরা প্রধানতঃ আলোক ও উত্তাপ পাই বলিয়া ইহার নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere)। ইহার আলোক-প্রভাব অনির্ব্বচনীয়; প্রাচীন লোকেরা যখন অন্ধভাবে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সূর্য্য নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,— এ প্রবন্ধটি তাহারি দ্বিতীয় সংস্করণ।

বলিতেন, সূর্য্য আগ্নেয়-পদার্থ-পরিপূর্ণ, তখন তাঁহারা সূর্য্যের যথার্থ উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ-প্রভাব বুঝিতে পারিতেন না। আমরা যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পাই, তাহা সূর্য্য-কর্ত্তৃক শূন্যে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের ২০ সহস্র লক্ষ ভাগেরও ১ ভাগ ১/২২,৭০,০০,০০০ নহে, অথচ ইহাই আমাদের নিকট অপরিমিত বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পুইয়ে, এবং সর জন হারষেলের মতে আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই তাহাতে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ না থাকিলে একশত ঘন ফুটেরও অধিক পরিমাণ বরফ প্রতি বৎসর গলান যাইত। প্রক্‌টার বলেন প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই, ২৪ ঘন্টার সেই উত্তাপকে একত্র করিলেই ৫২০ হস্ত গভীর পৃথিবী-ব্যাপী সমুদ্রকে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি* হইতে ১০০ ডিগ্রি** পর্য্যন্ত উঠান যায়, এবং প্রতি সেকেন্ডের সূর্য্যোত্তাপকে একত্রীভূত করিলে ৯৭৫ লক্ষ ঘন-ক্রোশ-ব্যাপী নীহার শীতল জলকে ফুটান যাইতে পারে। সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ হইতে সূর্য্যের উষ্ণতা*** গণনা করিবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার শেকি বলেন সূর্য্যের উষ্ণতা বহু লক্ষ ডিগ্রি, কিন্তু দুলঁ ও পেতির[২৪] প্রদর্শিত নিয়মানুসারে অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা লৌহাদি গলাইবার অগ্নিকুণ্ড হইতে অধিক নহে, তবে সূর্য্যের অভ্যন্তরের উষ্ণতা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক।

আলোকমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ইহা কঠিন, কেহ বলেন ইহা বাষ্পময়, আবার কাহারো মতে ইহা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

যাঁহাদের মতে আলোকমণ্ডল সূর্য্যাভ্যন্তরের কঠিন আবরণ তাঁহারা বলেন, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আলোকমণ্ডল নির্গত আলোকের প্রকৃতি বাষ্পবিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, কঠিন ব্যতীত বাষ্পীয়াবস্থাপন্ন পদার্থ হইতে এরূপ উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু ইহার প্রতিবাদীগণ বলেন, আলোকমণ্ডল কঠিন হইলে আলোকমণ্ডলস্থ কলঙ্কের এরূপ ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না; ইহা প্রকৃত পক্ষে বাষ্পময়, তবে প্রভূত চাপ প্রভাবেই বাষ্প নির্ম্মিত আলোকমণ্ডলের আলোক কঠিন-পদার্থ-নির্গত আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

* নীহার-শীতল জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি।

** ফুটন্ত জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি।

*** কোন বস্তুর অন্তরস্থ উত্তাপের যে অংশ চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের উপর কার্য্য করিতে পারে তাহাই সে বস্তুর উষ্ণতা (Temperature)।

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই, সূর্য্যে অনবরত যেরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব চলিতেছে, তাহাতে, বাষ্পময় হইলে আলোকমণ্ডলের কায়া কখনো সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে ইহার প্রান্তদেশ এই উৎপাতে প্রায় সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত আকার ধারণ করিত। পরে দেখা যাইবে, আলোকমণ্ডলের উপরিস্থ সূর্য্যের বাষ্পাবরণ প্রান্ত এইরূপ কারণে সর্ব্বত্র সমান নহে।

আলোকমণ্ডল কঠিন কিম্বা বাষ্পময় হইলে ইহার দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না দেখিয়া কেহ কেহ বলেন ইহা কঠিন ও বাষ্পের মধ্যবর্ত্তী; ইহা অনেকটা মেঘের ন্যায়। তবে আমাদের মেঘ জলকণার সমষ্টি, কিন্তু সূর্য্য এবং নক্ষত্রদিগের আলোকমণ্ডল নানারূপ ধাতব এবং অন্যান্য প্রখর উষ্ণ পদার্থকণার সমষ্টি। সম্পূর্ণ কঠিন-পদার্থ-নির্গত ও এইরূপ বাষ্পাকারে ভাসমান-কঠিন-কণা-বিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি একই রূপ, সুতরাং এই মতটিই বৈজ্ঞানিক জগতে গ্রাহ্য।

স্বাভাবিক চক্ষুতে দেখিলে আলোকমণ্ডল সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল একটি গোলক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, এই আলোকমণ্ডলটি একরূপ ভাসমান ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল রেখারাশিতে বিচিত্রিত, এবং এই বিচিত্রিত মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে দু-একটি দলবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক বর্ত্তমান।

আলোকমণ্ডলের রেখারাশি

আলোকমণ্ডলে ভাসমান উপরোক্ত রেখারাশি লইয়া বিজ্ঞান-জগতে নানা তর্ক বিতর্কের পর, অধ্যাপক ল্যাংলির[২৫] পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রকৃতি একরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ল্যাংলি বলেন, সূর্য্যাভ্যন্তরের পাংশুবর্ণ কায়ার উপরে এক প্রকার অতি লঘু ধাতব মেঘ ভাসিতে থাকে। দূরদর্শী দূরবীণ প্রয়োগ করিলে সেই মেঘরাশি আমাদের নিকট এক একটি উজ্জ্বল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রকায় ধান্যাকৃতি রূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই উজ্জ্বল কায়ার মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকল এক একটি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ ধারণ করে। এই দুই বর্ণের আকৃতিতে মিশিয়া আলোকমণ্ডলের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য, ধাতব-মেঘ-ময় উজ্জ্বল রেখার মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকলের নিম্নস্থিত কৃষ্ণবর্ণ কায়ার দৃশ্যমান অংশই কৃষ্ণ বিন্দুরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই কৃষ্ণ বিন্দুগুলি প্রকৃতপক্ষে উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি রেখার মধ্যস্থিত ছিদ্র, সেই জন্য ইহা ছিদ্র (Pore) নামে অভিহিত।

দূরবীণ যন্ত্রের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে আলোকমণ্ডলের কলঙ্কহীন উজ্জ্বল অংশ আমাদের নিকট তিন প্রকার আকার ধারণ করে। অতি সামান্য দূরবীণ দিয়া প্রথমে আমরা আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশে লঘু-শ্বেত মেঘ

ভাসমান দেখিতে পাই, তদপেক্ষা দূরদর্শী দূরবীণ প্রয়োগ করিলে সেই মেঘই এক একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি রূপে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ-ছিদ্র-মধ্য হইতে নিম্নের কৃষ্ণবর্ণ অংশ এক একটি কৃষ্ণ-বিন্দুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর দূরবীণের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করিলে সেই ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল মেঘমধ্যস্থ স্বতন্ত্র উজ্জ্বল বিন্দুকণাও দৃষ্টিগোচর হয়।

সৌর কলঙ্ক

উপরোক্ত বিন্দুরাশি বিচিত্রিত আলোকমণ্ডলের স্থানে স্থানে এক একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সৌর কলঙ্ক বলে। বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত শৈশব কালে, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফেব্রিসস্[২৬] প্রথমে সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় সৌর কলঙ্ক দেখিবার জন্য অতি অল্পই পরিশ্রম কিম্বা নিপুণতার আবশ্যক। একটি সামান্য দূরবীণের সাহায্যেই আমরা এই কলঙ্ক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কলঙ্কের তথ্যানুসন্ধানকারী জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন, কলঙ্কগুলির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটি নিয়মিত গতি আছে। সচরাচর একটি কলঙ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উদয় হইয়া ক্রমে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ১২/১৩ দিনে সূর্য্যের পশ্চিমপ্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে যদি ইহা একেবারে সূর্য্যে না মিশাইয়া যায় তবে আবার ১২/১৩ দিনে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হয়।

সূর্য্য নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কময় থাকে না। সূর্য্য কখনো কয়েক মাস, কখনো কয়েক বৎসর, কখনো বা কয়েক দিন মাত্র নিয়মিত রূপে কলঙ্কযুক্ত থাকিয়া আবার কিছু কালের জন্য একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া পড়ে। তবে যতদিন সূর্য্যে কলঙ্ক থাকে ততদিন পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের গতি হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন, পৃথিবী যেমন ২৪ ঘন্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে, সূর্য্যের নিজ-মেরুদণ্ড আবর্ত্তন তেমনি ২৫ দিনে সম্পন্ন হয়। সূর্য্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া যখন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে তখন আমাদের নিকট কলঙ্কগুলির দৃশ্যতঃ একটি বিপরীত গতি অনুভূত হয়।

সূর্য্য কলঙ্কের এই যে দৃশ্যতঃ গতি অর্থাৎ সূর্য্যের আবর্ত্তন বশতঃ তাহাদের এই যে গতি অনুভূত হয় — ইহা ছাড়া তাহাদের আবার নিজস্ব গতি আছে। তাহাদের এই গতি মিষ্টার ক্যারিংটন-কর্ত্তৃক[২৭] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যবেক্ষকগণ সূর্য্যের আবর্ত্তন সময়ের কেন যে ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দেশ করিয়াছেন এই আবিষ্কার দ্বারা

তাহার রহস্য ভেদ হয়। তাঁহারা একমাত্র উল্লিখিত দৃশ্যতঃ গতি ধরিয়াই সূর্য্যের আবর্ত্তন কাল গণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন দেখা যায় সূর্য্য কলঙ্কের প্রত্যেকের নিজের গতি আছে এবং এই গতির বেগ সূর্য্যের সকল অংশে সমান নহে। প্রকৃত পক্ষে বিষুবরেখার নিকটস্থ কলঙ্ক তাহার দূর-দেশবর্ত্তী কলঙ্ক অপেক্ষা অনেক দ্রুত চলে। বিষুবরেখার কলঙ্কের গতি ধরিলে সূর্য্যের আবর্ত্তন কাল ২৫ দিন আর সূর্য্যের গোলকার্দ্ধবর্ত্তী কোন স্থলের কলঙ্কের গতি ধরিয়া দেখিলে ২৮ দিনে সূর্য্য আবর্ত্তিত হইতেছে দেখা যায়।

ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়া দেখিলে সৌর কলঙ্ককে যেমন এক একটি সমান কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপন মনে হয়, দূরদর্শী দূরবীণ দ্বারা সেরূপ মনে হয় না। তখন এক একটি কলঙ্কের আবার দুই তিনটি ভিন্ন অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কলঙ্কের মধ্যভাগ যেরূপ ঘনকৃষ্ণ, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অংশ তদপেক্ষা লঘু। কলঙ্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ লঘুকৃষ্ণ অংশকে উপছায়া (Penumbra) ও ঘনকৃষ্ণ ভাগকে ছায়া (Umbra) ও এই ঘনকৃষ্ণের মধ্যস্থিত ভাগকে সারাংশ (Nucleus) কহে। কলঙ্করাশির আকার ও গঠন-বিন্যাস সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। ইহারা প্রায়ই দুইটি, কখনো বা দুইটির অধিক একত্রে দলবদ্ধ থাকে, আবার কখনো একটি কলঙ্ক ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটিতে পরিণত হয়।

সৌর কলঙ্কের যুগান্তর কাল

সৌর কলঙ্কের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না। ব্যাপক কালের অনুসন্ধান দ্বারা সূর্য্যকে কখনো অতি-কলঙ্ক কখনো অল্প-কলঙ্ক-ময় থাকিতে দেখা গিয়াছে। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্ক সংখ্যায় ও আয়তনে যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া ক্রমে আবার কমিতে আরম্ভ করে, কমিতে আরম্ভ করিবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে যতদূর কমিবার কমিয়া যায়, আবার ইহার দুই তিন বৎসর পরে অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসে। এখনো এই হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হয় নাই, তবে একবার অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আবার অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসিতে ১১ বৎসর লাগে। এই ১১ বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সূর্য্য একেবারেই নিষ্কলঙ্ক থাকে।

সূর্য্যে যখন কলঙ্ক না থাকে তখন আমরা তাহার নিকট হইতে যত আলোক পাই, যখন সূর্য্য কলঙ্কময় থাকে তখন সেরূপ পাই না — সুতরাং এই জন্য আমরা সূর্য্যকেও পরিবর্ত্তনশীল তারকা বলিতে পারি, এবং আমরা দেখিয়াছি সূর্য্যের একটি অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আর একটি অতি-কলঙ্কের সময় আসিতে ১১ বৎসর লাগে — সুতরাং সূর্য্যের জ্যোতি পরিবর্ত্তনকাল ১১ বৎসর— এইরূপ বলা যায়।

মিষ্টার ব্যালফুর ষ্টুয়ার্ট[২৮] সৌরজগতের গ্রহদিগের গতিবিধির সহিত সৌরকলঙ্কের যুগান্তরকালের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কেননা বৃহস্পতি ১১ বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, কলঙ্কেরও ১১ বৎসরে যুগান্তর হয়, তাহা ছাড়া সূর্য্যের অতিকলঙ্কময় অবস্থায়, কম্পাসের চৌম্বক শলাকার আন্দোলন এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত তড়িৎ প্রবাহ — ও উভয় মেরুবর্ত্তী আলোকদ্বয়ের বেগ অন্য সময় অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে — সূর্য্যের বাষ্পাবরণ কর্ত্তৃক সূর্য্যালোক যখন অধিক পরিমাণে শোষিত হয় তখনই সূর্য্য অতি-কলঙ্কময় হয়, সুতরাং সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও কোন গ্রহের গতিবিধি বা সৌর কলঙ্কের কারণ নহে ইহা প্রমাণ হইতেছে। আসল কথা, বাহিরের কোন কারণ হইতে সূর্য্য কলঙ্ক উৎপন্ন হয় না ; সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ অবস্থাই সৌর কলঙ্কের কারণ।

সৌর কলঙ্কের প্রকৃতি

সৌর কলঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা এইবার দেখা যাউক।

ইহা আলোকমণ্ডলের উপর ভাসমান কৃষ্ণবর্ণ ঘনপদার্থ কি না এই লইয়া এক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিসম্বাদ চলিয়াছিল। স্কচ সৌরবৈজ্ঞানিক উইলসন[২৯] প্রথমে দেখেন, সৌর কলঙ্ক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণ গহ্বর মাত্র।

সৌর কলঙ্ক এক একটি গহ্বর মনে করিয়া উইলসন সূর্য্য সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত মতের প্রবর্ত্তনা করেন, হার্ষেল সেই মতটিকে বিধিমতে সাজাইয়া প্রাণদান দেন। হারষেলের সেই মতে সূর্য্যাভ্যন্তর দুই স্তর মেঘ-বেষ্টিত কৃষ্ণকায় একটি শীতল বস্তু। সূর্য্যের যে আলোকমণ্ডল আমরা প্রত্যহ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিতে পাই, তাহাই সর্ব্বোপরিস্থ অত্যন্ত উজ্জ্বল মেঘস্তর, এবং তাহার নিম্নে যে আর একটি মেঘস্তর আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ এবং শীতল। এই দুইটি স্তর হইতে কখনো কখনো মেঘ সরিয়া গিয়া একরূপ গহ্বর উৎপন্ন করে। সেই গহ্বরই কলঙ্ক। কলঙ্কের লঘু-কৃষ্ণ অংশ গহ্বরের চারিধার এবং ঘন-কৃষ্ণ মধ্যভাগ গহ্বরতল। সূর্য্যের শেষোক্ত স্থানে বুদ্ধিমান জীবের নিবসতি। আলোকমণ্ডলের উত্তাপ সূর্য্যবাসীদিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা দায় হয়, সুতরাং যাহাতে সে উত্তাপ ততদূর না পৌঁছিতে পারে এই জন্যই হার্ষেল আলোকমণ্ডলের নিম্নে পূর্ব্বোক্ত শীতল মেঘস্তরের ব্যবধান বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও সূর্য্যবাসীদিগের একটি বিশেষ এই অসুবিধা যে, আমরা যেমন ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পাই, সূর্য্যবাসীরা সেরূপ ইচ্ছাক্রমে সূর্য্যের বহিঃস্থ সৃষ্টি দেখিতে পায় না। কালে-

ভদ্রে দৈবের কৃপায় কখন আলোকমণ্ডলে পূর্ব্বোক্তরূপে গহ্বর উৎপন্ন হইবে এই প্রতীক্ষায় তাহাদের হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, কেননা সেইরূপ গহ্বর উৎপন্ন হইলেই তন্মধ্য দিয়া তাহারা সূর্য্যের বহিঃস্থ জগৎ দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক, নিতান্ত কল্পনা প্রসূত সূর্য্যবাসীদিগের উপকথা ছাড়িয়া দিলে উপরোক্ত মতটি যে সূর্য্যের দৃশ্যতঃ অবস্থা এক রকম বুঝাইতে পারে না তাহা নহে।

হার্ষেল দেখিলেন আলোকমণ্ডল সম্পূর্ণরূপ কঠিন, তরল কিম্বা বাষ্পময় হইলে কলঙ্কের দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ কঠিন হইলে সৌর কলঙ্কের ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না, সম্পূর্ণ তরল কিম্বা বাষ্পময় হইলে সৌর কলঙ্ককে ক্রমান্বয়ে অনেক দিন ধরিয়া দেখা যাইত না ; কেননা চতুর্দ্দিকের তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বেগে আসিয়া সেই গহ্বর শীঘ্র পূর্ণ করিয়া ফেলিত। তরল ও বাষ্পীয় পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তাহা সমভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়। সুতরাং হার্ষেলকে অগত্যা অনুমান করিতে হইল আলোকমণ্ডল বাষ্প-সাগরে ভাসমান মেঘ সদৃশ পদার্থরাশি। ইহাকে কঠিন বলা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা তরল ও বাষ্পময় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী।

তাহার পর গুহাকার সৌর-কলঙ্ক-মধ্য দিয়া কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর দেখা যায়, সুতরাং সূর্য্যাভ্যন্তর কঠিন ও শীতল, কেবল আলোকমণ্ডল মাত্র জ্বলন্ত মেঘময়।

কিন্তু এই মত অধুনা আবিষ্কৃত উত্তাপের নিয়ম-সঙ্গত নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন, বিশ্বসংসারের শক্তি-সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে শক্তি হইতে উত্তাপ, উত্তাপ হইতে শক্তি রূপান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি সংরক্ষণের (Conservation of Energy) এই প্রাকৃতিক নিয়ম তখন অপরিজ্ঞাত ছিল। পরে ইহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারাই হার্ষেল কল্পিত মতের পদে কুঠার পড়িল। সূর্য্য সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে পরিমাণে উত্তাপ নিক্ষেপ করিতেছে, সে উত্তাপ সমভাবে রক্ষা করিতে যে পরিমাণ শক্তির উত্তাপ রূপে পরিণত হওয়া আবশ্যক, হার্ষেল কল্পিত অভ্যন্তর-শীতল অনতি-গভীর উত্তপ্ত স্তর-সম্পন্ন সূর্য্যে সে পরিমাণ শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

হার্ষেলের সময় বৈজ্ঞানিকেরা উত্তাপ দিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে বিশেষ উত্তপ্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহাদের মতে সূর্য্য-বেষ্টক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের উত্তাপ এত অল্প যে নিম্নস্থ মেঘস্তর ভেদ করিয়া তাহা সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্য সে উত্তাপে সূর্য্যবাসীদিগের কিছুই হানি হয় না।

কিন্তু এখন দেখা যায় যদি বা আলোকমণ্ডলের উত্তাপ কোন অজ্ঞাত উপায়ে চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলেও উত্তাপের সঞ্চালন (Conduction) ও বিকিরণ (Radiation) দ্বারা অভ্যন্তর ভাগ শীঘ্রই আলোকমণ্ডলের সমান উষ্ণ হইয়া সেখানকার জীবনের বিনাশ সাধন করিত।

তাঁহারা ভাবিতেন সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া এখানে আসিবার সময়, পরস্পর ঘর্ষণে প্রখর উত্তাপ উৎপন্ন করে। দুই পদার্থের ঘর্ষণে উত্তাপ জন্মে সত্য, কিন্তু এখন পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, আলোক কোন রূপ পদার্থ (Matter) নহে, সুতরাং আলোক-ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না।

বস্তুতঃ, উত্তাপের নিয়ম হইতে জানা যায় সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড বাষ্পময় অগ্নিকুণ্ড না হইলে অক্ষুণ্ণ ভাবে এতকাল উত্তাপ দিতে পারিত না। আমরা সূর্য্য হইতে যত উত্তাপ পাই সর্ব্বসুদ্ধ সূর্য্য তাহার ২১,৭০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ করে। এই রূপ উত্তাপ বিকিরণ হেতু ক্রমশঃ সূর্য্যের উত্তাপ-ভাণ্ডার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু শক্তিক্ষয় ব্যতীত উত্তাপ-সঞ্চয় হয় না, এবং আপনা হইতে নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহা হইলে আদিম কাল হইতে উত্তাপরূপে শক্তি ব্যয় করিয়াও কি জন্য সূর্য্যের উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতেছে?

আমাদের পৃথিবীতে আগুণ জ্বালাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ যেরূপ নূতন ইন্ধনের আবশ্যক, উত্তাপরক্ষার জন্য সূর্য্যেরও তো সেইরূপ কিছু চাই। গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু মাঝে মাঝে সূর্য্যের উপর দ্রুতবেগে পড়িয়া কতক পরিমাণে সেইরূপ ইন্ধনের কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে গ্রহখণ্ড ও ধূমকেতু সূর্য্যের উপর গিয়া পড়ে, তাহা সমভাবে সূর্য্যের উত্তাপ রক্ষা করিবার মত প্রচুর নহে। সূর্য্য যে পরিমাণে উত্তাপ বিকীর্ণ করে, তাহা রক্ষা করিতে গেলে ১০০ শত বৎসর অন্তর পৃথিবীর মতন একটি বিশাল আয়তনের গ্রহ সূর্য্যের উপর পড়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা পড়িবার যে কালে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না সে কালে সূর্য্যোত্তাপ রক্ষা হইবার কারণ কি? সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থাই ইহার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্প-গোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে ততই আবার তাহা হইতে নূতন উত্তাপ নির্গত হইয়া বাহিরের উত্তাপ সমান রাখিতেছে। শীতল হইয়া উত্তাপ রক্ষা করা হঠাৎ পরস্পর কেমন বিসম্বাদী মনে হয়, কিন্তু শীতল হইবার অর্থই উত্তাপ বিক্ষেপ করা। কোন পদার্থ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই আপন অঙ্গ হইতে বাহিরে

উত্তাপ ফেলিয়া দেয়। এইরূপে তাহার উত্তাপ কমিয়া সে নিজে শীঘ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু তাহার বিক্ষিপ্ত উত্তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর উপর কার্য্য করে। বাষ্পীয় পদার্থে এ নিয়মটি বিশেষরূপে খাটে। এখনকার বাষ্পময় সূর্য্য যত দিন তরল না হইবে তত দিন এই নিয়মানুসারে উত্তাপ দিবে, তরল হইলে এ নিয়ম আর তাহাতে সম্পূর্ণ খাটিবে না।

বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা সৌর কলঙ্ক সম্বন্ধে হার্ষেলের মতের ভুল বুঝা গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার যথার্থ প্রকৃতি ও কারণ এখনো সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফায়ের মতই বিজ্ঞান জগতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন, প্রভূত উত্তাপ প্রভাবে সূর্য্যের অভ্যন্তর হইতে নানা প্রকার ধাতব-বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে; এবং উপরে অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে আলোকমণ্ডলে পতিত হয়, এবং আবার উত্তপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ উপরে উঠিতে থাকে। অনবরত সূর্য্যে এই কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকার গতি সূর্য্য কায়ার সর্ব্বত্র সমান নহে, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সূর্য্যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণ-ঝটিকা দেখা দেয়। এই ঝটিকা প্রভাবে সূর্য্যের বাষ্পাবরণের উপরিস্থিত বাষ্প (প্রধানতঃ জলজান বাষ্প) নিম্নে আলোকমণ্ডলোপরি নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ শীতল বাষ্পরাশি সূর্য্যের যে যে স্থানে পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের আলোক অদৃশ্য হইয়া সূর্য্যের গাত্রে কলঙ্ক উৎপন্ন করে। এই সকল কলঙ্ক দেখিতে গহ্বরের ন্যায়, যাঁহারা নদীর পাক দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন কি করিয়া সৌর কলঙ্কের গহ্বরাকৃতি হয়।

সৌর কলঙ্কের সহিত পৃথিবীর কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়।

সার উইলিয়ম হার্ষেল পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করেন যে, সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শষ্য উৎপত্তির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। সেই সময়েই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং সৌর কলঙ্কের সংখ্যা যতই কমিতে থাকে ততই শষ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিষুব-রেখা-সন্নিহিত প্রদেশে প্রায় ১১ বৎসর অন্তরই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৌর কলঙ্কের যুগান্তর সময়ও ১১ বৎসর, সুতরাং এই দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তবে অন্য কোন প্রবল কারণাভাবে এরূপ অনুমান কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু নর্ম্মাণ লকিয়ার[৩০] ও ডাক্তার হন্টার ইহার পক্ষে বলবত্তর যে একটি কারণ দর্শাইয়াছেন তাহা দ্বারা সৌর কলঙ্কের সহিত দুর্ভিক্ষের যোগ বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে কি, হার্ষেলের মতের বিপরীতে ইহা দ্বারা অধিক কলঙ্কের সময় হইতে অল্প কলঙ্কের সময়ই দুর্ভিক্ষ প্রমাণীকৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূর্য্যকায়ার যে যে স্থান হইতে আলোক অদৃশ্য হয়, সেই সেই স্থানে আমরা কলঙ্ক দেখিতে পাই। সুতরাং অধিক কলঙ্কের সময় অপেক্ষা, অল্প কলঙ্কের সময় সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা বিষুব-রেখা-সন্নিহিত স্থানেই সূর্য্যোত্তাপ অধিক। সূর্য্যোত্তাপের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধও সর্ব্বত্র বিদিত। বৃষ্টি হইবার জন্য তাপের আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিরিক্ত উত্তাপ হইলে আবার অল্প বৃষ্টি হয়। সৌর কলঙ্কের অল্পতার সময় উত্তাপের আধিক্য বশতঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ইহা ব্যতীত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে পৃথিবীর চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের সহিত সৌর কলঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সৌর কলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিতই চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্যের আধিক্য লক্ষিত হয়। যখনি প্রবল বেগে সূর্য্যে ঘূর্ণ ঝটিকা আরম্ভ হয়, তখনি পৃথিবী-পৃর্ব্ব-স্থিত প্রত্যেক ক্ষুদ্র চুম্বক শলাকা বিচলিত হয় এবং সেই সময়ে উভয়-মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

সূর্য্যের বাষ্পাবরণ

পৃথিবীর যেমন বাষ্পাবরণ আছে, সূর্য্যের আলোকমণ্ডলও তেমনি বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় পরীক্ষা দ্বারা অল্পদিন মাত্র এই বাষ্পাবরণ আবিস্কৃত হইয়াছে।

যখন সূর্য্যকে পূর্ণ গ্রাস করিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ চন্দ্রমূর্ত্তি রজত-প্রভ একটি মৃদু আলোকচ্ছটায় পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সেই রজত-প্রভ চ্ছটা-মুকুট ব্যতীত, চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাপ-কুসুম-বর্ণাভ অগ্নিশিখাসমূহের স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকে। এই দুইটির মধ্যে চ্ছটা-মুকুট বহুকাল হইতে এমন কি কেপলারের সময় অবধি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। এই চ্ছটা-মুকুট চন্দ্রের বাষ্পাবরণ কিম্বা সূর্য্যের তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই, পরে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনুমিত হইল, চ্ছটা-মুকুট সূর্য্যের বাষ্পাবরণ, এবং উপরোক্ত স্ফুলিঙ্গরাশি এই চ্ছটা-মুকুটে ভাসমান সূর্য্যলোকের লোহিতবর্ণ মেঘমালা। কিন্তু চ্ছটা-মুকুট প্রকৃত বাষ্পাবরণ না হউক, ইহা যে সূর্য্যলোক-অন্তর্ভূত কোন পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশ্য, পূর্ব্বোক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্য-গ্রহণের সময়, স্পেনদেশের পরীক্ষা হইতে এই

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সূর্য্যলোকভুক্ত বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। এই সময় রশ্মিনির্ব্বাচক (Spectroscope)* একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা পরবর্ত্তী পূর্ণ গ্রহণের সময় অনেকগুলি সৌর রহস্য ভেদ হইল। এই গ্রহণ উত্তম রূপে দেখিবার নিমিত্ত জ্যানসেন নামক এক জন ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা[৩১] ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। গ্রহণের দিনে যখন চন্দ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যের শেষ রশ্মি গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত একটি অগ্নিশিখা নেত্রগোচর হইল। জ্যানসেন তদভিমুখে রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্রসংযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন ইহা জ্বলন্ত জলজান বাষ্প, ইহা প্রতিফলিত আলোকে আলোকময় নহে, জ্বলন্ত উত্তাপেই ইহা প্রজ্জ্বলিত। কিছু দিন পরে নর্ম্মাণ লকিয়ার এই পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা যায়, সূর্য্যের আলোকমণ্ডল একটি জ্বলন্ত বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণ নর্ম্মাণ লকিয়ার বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণমণ্ডল

বর্ণমণ্ডলের সর্ব্বোপরি স্তর প্রধানতঃ জলজান বাষ্প, কিন্তু ইহার নিম্ন স্তর-সকল, লৌহ ম্যাগনেশিয়ম প্রভৃতি ধাতব বাষ্পময়। বর্ণমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ রাশিই লোহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। বর্ণমণ্ডলই সূর্য্যের যথার্থ বাষ্পাবরণ। এই ভীষণ জ্বলন্ত বাষ্প-সমুদ্র হইতে মুহুর্মুহুঃ শতাধিক মাইল বেগে যে পদার্থরাশি চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সে প্রবল ঝটিকা কে বর্ণনা করিবে? এইরূপ ভীষণ-পরাক্রম ঝটিকা-দানব আপন দোর্দ্দণ্ড বলে সমস্ত ভারতবর্ষ ধূলিরাশিতে পরিণত করিয়া অর্দ্ধ ঘন্টায় ইংলণ্ডে উপনীত হইতে পারে। মনুষ্যের ভাষায় ইহার প্রতাপ প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ঝটিকাতাড়নে বর্ণমণ্ডলের প্রান্তদেশ সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত। বর্ণমণ্ডল হইতেও আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে উত্তাপ পাই।

বাষ্পাবরণ না থাকিলে সূর্য্য আমাদের নিকট এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত হইত, এবং তাহা হইলে সূর্য্যের বর্ণ গাঢ় নীলাভময় হইত। বর্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় অনেক সূর্য্যরশ্মি ইহাতে লীন হইয়া যায়; সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত রশ্মির মধ্যে অল্পই বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে

* এই যন্ত্রের দ্বারা জ্বলন্ত পদার্থের মৌলিক অংশ নির্গত আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্লিষ্ট আলোকের বর্ণ হইতে ঐ জ্বলন্ত পদার্থের নির্ম্মাণোপকরণ নির্দ্ধারিত করা যায়।

পায়। বাষ্পাবরণ না থাকিলে যে সূর্য্যের কত গুণ প্রভাব বাড়িত তাহা এখনো নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় নাই। লাপ্লাস বলেন সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত রশ্মির ১২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, এবং অবশিষ্ট ১১ ভাগ ইহাতে লীন হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে অর্দ্ধেকের অধিক রশ্মি বাষ্পাবরণে মিশিয়া যাইবার বড় সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য জন্মিবার পূর্ব্বে যে বহুকালব্যাপী একটি ভীষণ শীতকালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ল্যাংলি বলেন তাহা উপরোক্ত কারণে সংঘটিত। সে সময়ে সূর্য্যরশ্মি এখনকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাষ্পাবরণে লীন হইত বলিয়াই সেই ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয়।

বিশেষ যন্ত্রের সহিত সূর্য্যকে পরীক্ষা করিযা দেখিলে দেখা যায়, সূর্য্যগোলকের মধ্যস্থান যেরূপ উজ্জ্বল, প্রান্তবর্তী স্থানের উজ্জ্বলতা সেরূপ নহে। সূর্য্যগোলকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রশ্মি-বিকিরণ পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে কিরণ পাই। কি উত্তাপ-জনক কি আলোক-জনক, কি রাসায়নিক-শক্তি-উৎপাদক সকল প্রকার রশ্মিই সূর্য্যের প্রান্তভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আইসে। ইহার কারণ অবিসম্বাদে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ঠিক লম্বভাবে (Vertically) নিক্ষিপ্ত কিরণমালা অপেক্ষা চাক্রবালিক রূপে নিক্ষিপ্ত কিরণমালার অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করিতে হয়। এবং যে কিরণমালা যত অধিক-দূর-ব্যাপী বাষ্পাবরণ ভেদ করে তাহা তত অধিক পরিমাণে বাষ্পের সহিত মিশিয়া যায়। সূর্য্যগোলকের মধ্যভাগস্থ কিরণমালা ঠিক লম্বভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সূর্য্যের প্রান্ত ভাগস্থ কিরণ চাক্রবালিক রূপে বাষ্পাবরণ ভেদ করে, সেই জন্য আমরা এই দুই স্থানের রশ্মিবিকিরণের এত বিভিন্ন পরিমাণ দেখিতে পাই।

ছটা-মুকুট-মণ্ডল

বর্ণ-মণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত বাষ্পের অতিলঘু যে সকল অংশ তাহার বহির্ভাগে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণরূপে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই গ্রহণের সময় চন্দ্রের মুকুটরূপে শোভিত হয়, তাহাকে সেইজন্য ছটা-মুকুট-মণ্ডল কহে।

সচরাচর বাষ্পাবরণ অর্থে আপনার স্থিতিস্থাপকতা বলে অবস্থিত ক্রমবিন্যস্ত-স্তর-সমষ্টি-সঙ্কুল যে বাষ্পরাশি বুঝায়, ছটা-মুকুট-মণ্ডল সে অর্থে বাষ্পাবরণ নামে অভিহিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ বলবৎ যুক্তি দেখা যায়—

প্রথম, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবী অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক, সুতরাং

পৃথিবীতে যে বস্তু যত ভারী, সূর্য্যলোকে সেই বস্তুর তাহা অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক ভার বলিয়া পৃথিবীর সকল বাষ্পই সূর্য্যলোকে ২৭ গুণ অধিক ভার যুক্ত হইবে।

কোন বাষ্পাবরণের উপর দিক হইতে নিম্নাভিমুখে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরিস্থ বাষ্পস্তরের চাপে নিম্নস্থ বাষ্পস্তরের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন সহকারে তাহার ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধি পায়। জলজান বাষ্প হইতে লঘু কোন বাষ্প এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই লঘুতম বাষ্পের সূর্য্য হইতে লক্ষ মাইল দূরে থাকিতে হইলে যেরূপ উষ্ণ অবস্থায় থাকা আবশ্যক, এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার যেরূপ লঘু হইবার সম্ভাবনা, চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল সেইরূপ অতি লঘু জল-জান বাষ্পের হইলেও সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে তাহার প্রত্যেক ৫ কিম্বা ১০ মাইল নিম্নে দ্বিগুণ ঘনত্ব হইত। কিন্তু চ্ছটা-মুকুট হইতে নিম্নে গমন-কালে এই পরিমাণ অনুসারে তাহার ঘনত্ব বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না। এই নিয়মে ঘনত্ব বৃদ্ধি হইলে সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইত ; এখন সূর্য্যের সাধারণ ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ৪ ভাগের এক ভাগও নহে। সুতরাং কল্পনাতীত লঘু বাষ্প-পূর্ণ চ্ছটা-মণ্ডলকে আমরা বাষ্পাবরণ অর্থে বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয় — ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতু প্রতি সেকেন্ডে ৩৫০ মাইল গতিতে এই মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ইহার তিন লক্ষ মাইল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে এই ধূমকেতু বাষ্পীভূত হওয়া দূর থাক, ইহার গতির পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

আমরা যে সকল উল্কাপিণ্ডকে তারার মত খসিয়া পড়িতে দেখি, তাহাদের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০ হইতে ৪০ মাইলের অধিক নহে। এই অপেক্ষাকৃত মন্দগতি, ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ড, পৃথিবীর বাষ্পাবরণের সর্ব্বোপরি স্থিত অতি সূক্ষ্মতম বাষ্পস্তরের ঊর্ধ্ব সংখ্যা এক শত মাইল নীচে আসিতেই ঘর্ষণে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং প্রতি সেকেন্ডে তিন শত পঞ্চাশ মাইল গতিতে ধাবিত কোন বস্তু, যে বাষ্পাবরণ মধ্য দিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতে পারে তাহার বাষ্প যে কত লঘু তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

এই চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডল যদি বাষ্পাবরণ নহে, তবে ইহা কি ? সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্যালোক-প্রজ্জ্বলিত অতি লঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন বাষ্পাণুরাশি। কিন্তু বাষ্পাণুনির্ম্মিত চ্ছটা-মণ্ডলের অণুরাশি কি প্রকারে চ্ছটা-মণ্ডলে রক্ষিত হইতে পারে, এই দুরূহ সমস্যার অদ্যাবধি স্থির উত্তর পাওয়া যায় না। এই অণুসকল যে একই স্থানে অবস্থিত নহে তাহা চ্ছটা-মুকুট-মণ্ডলের ঘন ঘন আকৃতি

পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিশেষরূপে প্রমাণ হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণের সময় ডাক্তার গুল্ড[৩২] তিন মিনিটের মধ্যেই ইহার আকারের পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিলেন। চ্ছটা-মুকুট সম্বন্ধে প্রচলিত মতের তিনটি এস্থানে সন্নিবেশ যোগ্য।

প্রথম— সূর্য্যের অতি-নিকট সঞ্চারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড বাষ্পীভূত হইয়া লঘু মেঘ রূপে পরিণত হয় এবং সেই অতি লঘু মেঘই চ্ছটা-মুকুট।

দ্বিতীয়—সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল বৈদ্যুতিক তাড়ন-কার্য্য দ্বারা দূরে রক্ষিত হইতেছে।

তৃতীয়—সূর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত পদার্থ সকল মাধ্যাকর্ষণ বলে একবার সূর্য্যে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার ঝটিকা বলে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবং বারম্বার এইরূপ উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ দ্বারাই চ্ছটা-মুকুটের আকার শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

এই তিনটিই কেবল অনুমান, ইহাদের সমর্থনকারী তেমন সারগর্ভ যুক্তি নাই।

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোকে গমনকালে সর্ব্বাগ্রে চ্ছটা-মুকুটে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে বর্ণমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল হইতে আলোক-মণ্ডল এবং আলোক-মণ্ডল দিয়া অভ্যন্তরে উপনীত হইতে হয়।

সূর্য্যের নির্ম্মাণোপকরণ

সূর্য্য যে সকল মৌলিক পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার সমস্ত আমাদের বিদিত পদার্থ নহে। রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যে জলজান, ম্যাগ্‌নেশিয়ম, ক্যালশিয়ম, সোডিয়াম, ম্যাংগানিজ্, নিক্‌ল, ব্যারিয়ম, ষ্ট্রনসিয়ম, লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব বাষ্প ছাড়া অপর যে সকল বাষ্প দেখা যায় তাহা পৃথিবীতে নাই।

উপসংহার

এই প্রস্তাবটি শেষ করিবার অগ্রে আর একটি কথা বলা উচিত। যে সূর্য্য সৌর জগতের প্রাণ-স্বরূপ যাহার সহিত মুহূর্ত-মাত্র সম্বন্ধ শূন্য হইলেও তৎক্ষণাৎ গ্রহ উপগ্রহদিগের প্রলয় নিশ্চিত, সেই অসীম বিক্রমশালী সূর্য্যের প্রভাব অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে কি না এই কথাটি বিজ্ঞান জগতের একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে সঙ্কোচন নিয়মকে সূর্য্যের সম-পরিমাণ উত্তাপ রক্ষার কারণ মনে করেন, তাহা সত্য হইলে সূর্য্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমরা সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ পাই

সূর্য্য তাহার ২,১৭,০০,০০,০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকিরণ করে। এই উত্তাপ সমপরিমাণে বিকীর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরে ২২০ ফুট বা প্রত্যেক শতাব্দীতে ২ ক্রোশ করিয়া সূর্য্যব্যাস সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই সূর্য্যোত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া এইরূপ উত্তাপ বিকিরণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পরিমিতায়তন সূর্য্য কি কালে শীতল হইয়া যাইবে না!

উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়া করিয়া সূর্য্যাভ্যন্তর বাষ্পীয় অবস্থা হইতে তরল বা কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কি না তাহা এখনো অপরিজ্ঞাত, সেই জন্য কত দিন সূর্য্যের উত্তাপ এইরূপ সমভাবে থাকিবে তাহা নিশ্চয় গণনা করা যায় না। তবে উত্তাপ-রক্ষার জন্য সূর্য্যের যে পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়া আবশ্যক সেই সঙ্কোচন পরিমাণের গণনা দ্বারা স্থূলত এই রূপ বলা যাইতে পারে যে, আর ৫০ লক্ষ বৎসরে সূর্য্য আয়তনে এখনকার অর্দ্ধেক হইয়া পড়িবে, এবং যদি সূর্য্যের অভ্যন্তর দেশ এখনো কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া না থাকে তবে সম্ভবতঃ তখন কঠিন হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ উত্তাপ হারাইতে থাকিবে। এই নিয়মের বশে চলিলে সর্ব্বসুদ্ধ আর ১০০ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্তও সূর্য্য জীবন রক্ষার উপযোগী উত্তাপ দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঈশ্বরের এই সৃষ্টি-রহস্যের তথ্য নির্ণয় করা আমাদের জ্ঞানের সাধ্য নহে।

বিজ্ঞানালোকে প্রতিদিন আমাদের অজ্ঞান-অন্ধতা আরো সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা এককালে যাহা অকাট্য স্থির করিয়াছেন, তাহার ভুল আবার পরবর্ত্তী জ্ঞানালোকে দূর হইয়াছে। এই মহান সৃষ্টি আমাদের নিকট কি গম্ভীর প্রহেলিকাময়! এ বিষয়ে আমরা :

"Like an infant crying in the night,
Like an infant crying for the light,
With no other voice than a cry."

শিশুর ন্যায় অন্ধকারে রোদন করিতেছি — শিশুর ন্যায় আলোকের জন্য রোদন করিতেছি — রোদন ব্যতীত অন্য স্বর আমাদের নাই।

মহা পণ্ডিতগণ এবং নিতান্ত অজ্ঞ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে এই সৃষ্টির জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখা যায় না। এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল। একজন পাদরি একজন অসভ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই সকল বিশ্ব সংসার কে সৃষ্টি করিয়াছে", অসভ্য বলিল, "আমার পিতা", পাদরি বলিলেন, "তোমার যখন পিতা ছিলেন না তখন কি সৃষ্টি ছিল না?" — তখন অসভ্য বলিল, "তাহা আমি জানি না।"

আর এক জন বৃদ্ধ অসভ্য এই কথায় বলিল যে, "হাঁ, তাহার পূর্ব্বেও এই সৃষ্টি ছিল এবং স্রষ্টার নাম 'জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য' (Interrogation and Admiration)।"

সেই অসভ্যের উত্তর কি সুন্দর! এই সমগ্র সৃষ্টি বাস্তবিক একটি জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য ছাড়া আমাদের নিকট আর কি? তবে আমরা এই মাত্র নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাই সম্পন্ন হইবে।

সঙ্কোচন নিয়মানুসারে সূর্য্যের অতীত ব্যাস গণনা দ্বারা জানা যায়, ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য এখনকার অপেক্ষা দুই ক্রোশ ও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চার ক্রোশ বড় ছিল, এইরূপে এক সময় সূর্য্য-বাষ্প বুধের কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর কক্ষ পর্য্যন্ত এবং আরো পূর্ব্বে সমস্ত সৌর জগৎময় ব্যাপ্ত থাকিবার কথা।

কান্ট ও লাপ্লাস সৌর জগতের গতির আশ্চর্য্য রূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া অবরোহী নিয়মানুসারে এই জগতের উৎপত্তির যে প্রণালী কল্পনা করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আরোহী নিয়মানুসারেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দুই দিক হইতেই আমরা দেখিতে পাই আমাদের সূর্য্য এক সময়ে ঘূর্ণ্যমান বিশাল গোলাকার জ্বলন্ত বাষ্পরাশি রূপে সমস্ত সৌর জগতে ব্যাপ্ত ছিল। পরে সেই বাষ্পরাশির বিষুব-রেখাস্থ অংশ কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া এক একটি বাষ্পচক্ররূপে ক্রমে মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, এবং সেই পরিত্যক্ত চক্রগুলি আবার মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে এক একটি গ্রহরূপ ধারণ করিয়া মধ্যের বৃহত্তর গোলকের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য। সেই অতি বিস্তৃত সৌরজগৎব্যাপী বাষ্প যদি আদিম কাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতি শতাব্দিতে ২ ক্রোশ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং কোন অপরিজ্ঞাত নূতন শক্তি দ্বারাও সূর্য্যের উত্তাপ না রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যের বয়ঃক্রম এখন ১,৮০,০০,০০০ বৎসরের অধিক হইতে পারে না। তবে যদি সূর্য্য আদিম অবস্থায় এখনকার অপেক্ষা অল্পপরিমাণে উত্তাপ ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে অল্পপরিমাণ সঙ্কোচনের আবশ্যকতা হেতু সূর্য্যের বয়ঃক্রম ১,৮০,০০,০০০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে এবং পূর্ব্বে যদি এখনকার অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ দিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য ১,৮০,০০,০০০ বৎসর হইতেও ন্যূন বয়স্ক। অনেক দিন হইতে সূর্য্য সম্বন্ধীয় আর একটি কথার আন্দোলন চলিতেছে। সূর্য্যের গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান, সূর্য্য তেমনি আর কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে কি না? কান্ট স্থির করিয়াছিলেন যে সূর্য্য সিরিয়াস নক্ষত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশে ভ্রাম্যমান,

কিন্তু এই মত পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক-অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এখন এইরূপ প্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য পরিবারবর্গকে লইয়া হারকিউলিস রাশির দিকে ধাবিত।

ভারতী ও বালক, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১২৯৫

বিজ্ঞান শিক্ষা

জীবনের প্রভাত কালে, চৌদিকে সজ্জিত প্রাকৃতিক বস্তুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ি, পরে দেখিতে দেখিতে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ-স্পৃহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্যের প্রভাবও মন্দ হইয়া পড়ে। তখন আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি না, বিস্ময় উদ্দীপক বস্তুকে কেবল মাত্র দেখিয়াই আমাদের মনস্তুষ্টি হয় না, আশ্চর্য্য প্রভৃতি মনোভাবের দ্বারা আমরা প্রথমে যে সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই বস্তু-সমুদ্রের উপকূলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকি, মনোভাব শমিত হইলে আমরা সেই সকল বস্তুর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হই। মনুষ্যের এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বস্তুদিগের প্রাকৃতিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন করাই বিজ্ঞানের কার্য্য।

ভারতবর্ষই বিজ্ঞানের আদিম জন্মভূমি, বেদবর্ণিত সময়েও ভারতবর্ষে আমরা বিজ্ঞান-চর্চ্চা দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষীয়গণ যে অঙ্কবিদ্যার প্রবর্ত্তক তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ১/২ প্রভৃতি অঙ্ক আরবেরা এ দেশ হইতে শিখিয়া ইয়োরোপে প্রচার করে। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ বীজগণিত জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইয়োরোপে তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিলেই হয়। চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যাতেও ভারতবর্ষীয়গণ জগতের গুরু। চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ আরবেরা নিজভাষায় অনুবাদ করিয়াছে এবং গ্রীকগণও ইহা এদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্যাও হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথমে আলোচিত। খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়। যদিও আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস নাই তথাপি অন্য সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে—এবং ইয়োরপীয় পণ্ডিতগণের যত্নে ও অনুসন্ধানে এই সমুদায় এখন অতি সহজেই জানা যাইতেছে।

৭০০০ বৎসর কালমাত্র আমরা মনুষ্য জন্মের নিশ্চিত প্রমাণ পাই। ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি ভারতে জ্যোতিষের ন্যায় কঠিন বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে না জানি মনুষ্য জীবনের কত শৈশবেই

ভারতবর্ষীয়গণ সভ্যতার সোপানে উঠিয়াছিলেন। এদেশ হইতেই জ্যোতিষ ক্রমে ক্যালডিয়া মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ইয়োরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—

"ভূপঞ্জরঃ স্থিরোভূরে বাবৃত্ত্যা বৃত্ত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাং॥"

পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতঃই স্থির নক্ষত্র মণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।

পৃথিবীর সমস্ত গতিই তখন আবিস্কৃত হইয়াছিল, এমন কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত তাহা মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও আর্য্যভট্টের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই।

দূরবীণ সৃষ্টি হইবার পর ইয়োরপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্য-বিম্ব (Solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে—

"তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।
তেনাস্মিন শ্যামিকা জাতা শাতনোর্চ্চিষ স্তথা।"

বিশ্বকর্ম্মা, অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্য্য-বিম্বের কথা আরো স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে, কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্য-বিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান বরাহমিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শনমায়ান্তি সূর্য্য বিম্বস্যাঃ।
তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং
পরিজ্ঞেয়ং। * * *
বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ
সরিতো আয়ান্তি তনুত্বং ক্বচিৎক্বচি জায়তে শস্যং।"

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায় সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। . . . মেঘসকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল স্বরূপ যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই নিয়মের সুস্পষ্ট জ্ঞান পুরাকালে ছিল বলিয়া

যদিও আমরা প্রমাণ পাই না, কিন্তু ইহার আংশিক জ্ঞান, বহুকাল পূর্ব্বে যে সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের পূর্ব্বে ক্রান্তিপাতের গতি পৃথিবীর গতি সম্ভূত বলিয়া ইয়োরপে কেহ জানিত না, মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম অবলম্বন করিয়াই নিউটন প্রথমে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, কিন্তু আর্য্যভট্ট বহুকাল পূর্ব্বে সেই গতি সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। জ্যৌতিষিক আকর্ষণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলে কি ইহা সম্ভব হইত ? আর্য্যদিগের এ বিষয়ে যে জ্ঞান ছিল অনুমান ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

নিউটনের অন্যূন আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন :

"বৃতা ধৃতা ধরা কেন যেন নেয়মিয়াদধঃ"—এই যে পৃথিবী কিসের দ্বারা ধৃত, আর কেনই বা অধঃপতিত হয় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ॥:

"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পতিতীব ভাতি,
সমে সমন্তাৎ কুরিয়ং যতঃ খে।"

"এই পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিমতী, সেই আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুরু-ভার বস্তু সকলকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা পড়িতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। যেহেতু এই পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, এবং ইহার চারিদিকে সমান আকাশ, সেইহেতু ইহার অধঃউর্দ্ধ নাই, তবে ইনি কোথায় পড়িবেন ?"

আর একস্থানে লিখিতেছেন :

"নান্যাধারঃ স্বশক্তৈ্যবিয়তি
নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজ-
মনুজা দিত্য দৈত্যং সমন্তাৎ।"

"এই পৃথিবীর অন্য কোন আধার নাই, ইনি আপনার আকর্ষণ শক্তিতেই আপনি আকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহারি সেই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে দৈত্যদানব ও মানবাদি সমস্তই ইহার পৃষ্ঠে স্থিতি করিতেছে।"

সূর্য্যের আকর্ষণ সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে ছাড়া প্রাচীন ঋগ্বেদেও দেখা যায় :

"আকৃষ্টেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং।
হিরণ্ময়েন রথেন সবিতা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।"

"আকর্ষণ শক্তিযুক্ত সর্ব্ব-পরিচালক রজো-গুণ যাহার বর্ত্তমান আছে, সেই সূর্য্যদেব অমরলোক সকলকে সন্নিবিষ্ট রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময় রথের দ্বারা ভুবন সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।"

এই একটি ঋকের মধ্যে আধুনিক সূর্য্য-সম্পর্কীয় অনেকগুলি সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

অণু অণুকে আকর্ষণ করে, মাধ্যাকর্ষণের এই যে একটি নিয়ম, প্রাচীন গ্রন্থে ইহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

জৈন দর্শনে রহিয়াছে :

"অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যতে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্ট শক্তিরেবাদ্য সংযোগে কারণ ভাবমাপদ্যতে।"

"অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি-অণু ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এস্থলে অণুদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা প্রাপ্ত হয়।"

ইহার দ্বারা প্রত্যেক পরমাণুরই আকর্ষণ শক্তি বলা হইতেছে। আকর্ষণ শক্তি যে তখন জানা ছিল তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার জন্যই নিউটনের খ্যাতি নহে, তাঁহার পূর্ব্বেতেই হাইগেন্স প্রথমে কেন্দ্রাকর্ষণ শক্তি বাহির করিয়াছিলেন।

একটি আকর্ষণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে বিশ্বচরাচর চালিত হইতেছে, এই নিয়মের উপরেই যে সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব স্থাপিত, ইহাই নিউটন আমাদের প্রথমে শিক্ষা দেন এবং সেই জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। মাধ্যাকর্ষণের এই সুস্পষ্ট জ্ঞানটি আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাচীন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহা হইতেই যে আমরা নিষ্পত্তি করিতে পারি তাঁহারা মাধ্যাকর্ষণ জানিতেন না, তাহাও নহে। ভারতবর্ষে যে কতদূর বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহার সবিশেষ কিছু জানি না, ভারতবর্ষ প্রকৃত ইতিহাসশূন্য, ভারতবর্ষের পুস্তক প্রভৃতি স্থায়ী কীর্ত্তিসমূহও প্রায় বিলুপ্ত, এই অবস্থায় প্রচলিত শ্রুতি-পরম্পরায়, পৌরাণিক উপাখ্যানে, ও লুপ্তাবশেষ পুস্তকে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাতে সেই প্রাচীন উন্নতির ছায়া মাত্র প্রকাশ পায়।

পৌরাণিক উপাখ্যানে রূপক রূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

এই যে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর জীবন-ইতিহাসে চারিটি যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পৌরাণিক আখ্যানে তাহারি কি পরিচয় পাওয়া যায় না? পুরাতত্ত্ব-অধ্যায়ী মাত্রেই জানেন, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে দুই প্রকারে সত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণেরা শিষ্যদিগকে নিগূঢ় সত্য শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সেই সকল কঠিন সত্য সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইবে বুঝিয়া তাহাই

সাধারণের জন্য রূপকরূপে প্রচারিত হইত ; যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব সেইজন্য অতি অল্পলোকেই জানিত। সুতরাং ক্রমে যখন জাতীয় অবনতি আরম্ভ হইল, কঠিন জ্ঞানাভ্যাস হইতে সকলে বিরত হইতে লাগিল, তখন অল্পলোকনিবদ্ধ সত্য সকলও সেই লোকদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লোপ পাইয়া আসিল, সাধারণ প্রচলিত রূপক মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

পুরাণানুসারে জীবশূন্য অপার জলধি জলের প্রথম জীব মৎস্য, দ্বিতীয় জীব কূর্ম্ম, তৃতীয় জীব বরাহ, চতুর্থ নৃসিংহ। রূপক করিয়া তাঁহারা বিধাতাকে বার বার এইরূপে অবতার করাইয়াছেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হইল, সুতরাং স্বয়ং তিনি যেন এক এক বার এক এক জাতীয় জীবরূপে অবতার হইলেন। বুঝিয়া দেখিলে এই রূপকেই কি আধুনিক বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্য পাওয়া যায় না ? ইয়োরপীয় ভূবেত্তাগণ পৃথিবীর ইতিহাসকে যে চারিযুগে ভাগ করেন তাহার পর্য্যায় কি ?

প্রথম, মৎস্য যুগ, Age of Fishes.

দ্বিতীয়, সরীসৃপ যুগ, Age of Reptiles.

তৃতীয়, স্তন্যপায়ী যুগ, Age of Mammals.

চতুর্থ, মনুষ্য যুগ, Age of Men.

প্রথম যুগে পৃথিবীতে মৎস্যই শ্রেষ্ঠ জীব ছিল, ইয়োরপীয় ভূবেত্তাগণ সেই জন্য তাহার নাম মৎস্য যুগ রাখিয়াছেন। পৌরাণিক উপাখ্যান রূপক, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুকে এই যুগে মৎস্য রূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাহার পর দ্বিতীয় যুগের প্রধান জীব সরীসৃপ, তখনকার সরীসৃপ অতি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতায়তনের। পুরাণে সেই জন্য এক কিম্ভূত-কিমাকার প্রকাণ্ড শরীরী কচ্ছপকে দ্বিতীয় যুগে অবতারণা করা হইয়াছে। পুরাণের কূর্ম্ম যেরূপ অদ্ভুতাকার ও প্রকাণ্ড শরীরী, তাহাতে ইয়োরপের দ্বিতীয় যুগ-স্তর-প্রাপ্ত ম্যাগালিসোরস্ ইকথিওসোরস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরীসৃপদিগের আর এক জাতি আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই। তাহার পর ইয়োরপীয় ভূবেত্তাদিগের মতে তৃতীয় যুগে স্থূলচর্ম্মী স্তন্যপায়ী হস্তী মহিষ বরাহ ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তুই প্রধান, সুতরাং তৃতীয় যুগে বরাহ অবতার বলিলে তাহা কিছুই অসম্ভব বলা হয় না। হয়ত তৃতীয় যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল—ইহারা তখন যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনি আকারে প্রকাণ্ড হইত। সর্ব্বশেষে মনুষ্য যুগ, মনুষ্য প্রথম জন্মকালে এখনকার মনুষ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিতে ছিল, এজন্য পরশুরামরূপী মানুষের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়াছে।

এইরূপে পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে, অনেক লুক্কায়িত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্র ধারাবাহীরূপে ভারতবর্ষে কি অন্য কোথাও চলিয়া আসে নাই, মাঝে মাঝে অসভ্য জাতির উপদ্রবে, দেশিয়দিগের অবহেলায়, কালের স্মৃতিলোপী অন্ধকারে প্রাচীন বিজ্ঞান একরূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকালের পর ষোড়শ শতাব্দীতে আবার তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। নূতনাবিস্কৃত প্রণালী-ক্রমে বর্ত্তমান বিজ্ঞান পূর্ব্বজানিত সত্য পুনরাবিষ্কার করিয়া একটি নূতন যুগের আরম্ভ করিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইয়োরপে। ইহার পূর্ব্ববর্তী সময়ে গ্রীকগণই ইয়োরপে বিজ্ঞানকে তাঁহাদের একাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। আরিষ্টটল ইয়োরপের সেই প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ। ইনি চিন্তাজগতের একজন স্বেচ্ছাচারী রাজা। ইনি যে সকল স্ব-কপোল-কল্পিত মত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন, পরবর্ত্তী সময়ে কেহ তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিলে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত। আরিস্টটল পৃথিবীকে অচল ও সূর্য্যকে সচল বলিয়াছেন, বাইবেলেরও ঐ মত। সে জন্য খৃষ্টানধর্ম্ম-যাজকেরা আরিস্টটলের কথাই সত্য বলিয়া মানিতেন ; তাঁহারা সেই জন্য স্বাধীন চিন্তার পথে তখন কন্টকস্বরূপ ছিলেন। জর্ম্মাণ দেশীয় রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত বৈজ্ঞানিক শিনার একজন আরিস্টটল-ভক্ত ধর্ম্মযাজককে সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিয়াছেন বলায় সে ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে বলিল, "তাহা কখনই হইতে পারে না, কেননা আরিস্টটল এমন কথা বলিয়া যান নাই, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সূর্য্যের কলঙ্ক নহে, তোমার চক্ষের।" গ্রীকদিগের বহুকাল অধিকৃত বৈজ্ঞানিক সিংহাসন ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা অধিকার করিয়া লইলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপর্নিকস এই শতাব্দীতে পৃথিবীর সূর্য্য পরিভ্রমণ ও কেপলার গ্রহগণের গতির মূল নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইয়োরপের মুখোজ্জ্বল করিলেন ; এই শতাব্দীতেই ইতালীয় পণ্ডিত গেলিলিও গতির কয়েকটি নিয়ম বাহির করিয়া আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল পত্তন করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিলবর্ট[৩৩] কর্ত্তৃক তাড়িত ও চৌম্বক তেজ আবিষ্কৃত হইল। তাহার পর এই শতাব্দীর শেষে বেকন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার প্রণালী সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করিলেন। তাহার পর হইতে ক্রমে অপ্রতিহত প্রভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন লুপ্ত বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম যুদ্ধের কাল, দ্বিতীয় জয়। যুদ্ধ যুগের নেতা কোপর্নিকস কেপলার গেলিলিও। ইঁহারা গুরুবাক্য অনুযায়ী পূর্ব্বকল্পিত মতকে অকাট্য ভাবিয়া তাহার অনুযায়ী করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে দাঁড় করাইতে যাইতেন না, ইঁহারা অগ্রে ঘটনা দেখিয়া তাহার অনুযায়ী

কারণ নির্দ্দেশ করিতে যত্নশীল হইতেন, এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর আপন আপন মতকে নির্ম্মাণ করিতেন। ইহাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের প্রণালী, আরোহণ—(Induction)। এই প্রণালী অনুসারে রীতিমত অনুসন্ধান দ্বারাই বিজ্ঞান জগতের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বের ভ্রমপূর্ণ মতগুলি দূর করিয়া যথার্থ সত্য শিখাইতে এই যোদ্ধাগণের যে কত সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এই অত্যাচার গেলিলিওতেই শেষ হয়। তাঁহার পর হইতে ক্রমে বিজ্ঞান বিজয়ী হইল, সত্যের জয় শেষে পড়িয়াই রহিয়াছে। বেকন বিনা যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ব্বাচন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিলেন। বেকন এই প্রণালীর উদ্ভাবক বলিয়া কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হন—কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত। বেকনের অল্পকাল পূর্ব্বে গিলবর্ট চৌম্বক তেজের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এই প্রণালীর একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। ১৫ শতাব্দীতে লিওনার্দো দাবিঞ্চি নামক বিখ্যাত ইতালীয় বৈজ্ঞানিক স্পষ্ট করিয়া এই বিষয়ে লিখিয়াছেন— "কোন একটা বিষয় অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আমি সে বিষয় পরীক্ষা করি, কেননা আমার অভিপ্রায় এই, যে প্রথমে পদার্থের ধর্ম্ম স্থির করিয়া পরে সেই ধর্ম্মের অনুসন্ধান করা।" ইহা ছাড়া অনেক প্রাচীন দার্শনিক অতি বিশদরূপে এই প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এক কথায়, জন্ম হইতেই এই প্রণালীতে মানুষের চিন্তা চালিত হইয়াছে, তবে বেকনই প্রথমে ইহা বাঁধাবাঁধিরূপে যথা-বিন্যস্ত-অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়া, এবং ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একমাত্র প্রণালীরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। ইহার পর দেকার্ত্ত হাইগেন্স নিউটন প্রভৃতি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরা ১৭ শতাব্দীকে কুসুমিত করিয়া তুলিলেন। এই রূপে বিজ্ঞান উত্তরোত্তর অবাধে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল।

ইয়োরপে এখন যেরূপ দ্রুতপদে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতেছে তাহা অতি আশ্চর্য্য-জনক। ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ ইহাতে বলেন, আর এক শতাব্দীর পর বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন বিদ্যারই মনুষ্যমণ্ডলীতে চর্চ্চা থাকিবে না। একশত বৎসর পরে কি হইবে বলা বড় দুঃসাধ্য, তবে মনুষ্য জাতির মধ্যে না হউক, ইয়োরপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ক্রমশই যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যবিস্তার করিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কেবল জ্ঞানগত উন্নতি ছাড়া বিজ্ঞান প্রসাদে বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবহারগত বিষয়েও উক্ত দেশবাসীগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্য্যগত শিক্ষার অভাবেই ইয়োরোপীয় জাতি হইতে আমরা সকল বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহাতেই উন্নতি করিতে চাও, বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইবেই।

যদি জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে চাও ত বিজ্ঞানের ধ্যান কর। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের চাবি স্বরূপ। যে রহস্য দ্বারা অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ হইতে পৃথিবীর কঠিন আচ্ছাদন সৃজিত হইয়াছে, বিজ্ঞান সেই রাসায়নিক রহস্য আমাদের নিকট খুলিয়া দেয়, যে সকল নিয়মে জগতের উপর জগৎ সুশৃঙ্খলা ক্রমে অনন্ত আকাশপথে ধাবিত হইতেছে, বিজ্ঞান সেই সকল আমাদের দেখাইয়া দেয়। জ্যৌতিষিক অনুসন্ধান দ্বারা সৃষ্টির জন্মের সময় আমরা উপস্থিত থাকিতে পারি, বিনাশও কল্পনার চক্ষে আনিতে পারি।

বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারাই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে, কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি। এক কথায়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে যাহাকে আমরা কুসংস্কার বলি, তাহার অপনয়ন হয়।

কেবল ইহাই নয়—যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের বৃদ্ধি করিতে হয়, তো বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই মহাব্যাপার বাষ্পীয় শকট বাষ্পীয় তরী হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত সকলই বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল। এইরূপে আমরা যেদিকে চাহিয়া দেখি, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব যতদিন না ভারতবর্ষীয়গণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান কন্টক, বিজ্ঞানের ক্ষমতাবলেই একমাত্র সে দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। আমরা হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি দ্বারা দেশের আর এক নূতন রূপ দেখিতে পাইব। এদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে তখন আমাদের আর অন্য জাতির উপর নির্ভর করিতে হইবে না, কি শিল্পে কি বাণিজ্যে সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্রধান হইতে পারিব। আজকাল ইয়োরপীয়গণ আমাদের এই রত্নাগর্ভা ভারত ভূমিতে আসিয়া আমাদের দেখাইয়া দেখাইয়া রত্ন সকল লুটিয়া লয়েন, আমরা যখন তাঁহাদের মত শিক্ষিত হইব, তখন আমাদের আর এরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। এখন অতীতকালেই আমাদের অহঙ্কার, স্মৃতিতেই আমাদের মাহাত্ম্য, বর্ত্তমানে আমাদের কিছু নাই, সুতরাং অতীত কথা নাড়াচাড়া করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। যেদিন বিজ্ঞান আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন, সেই দিন অতীত ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমানের অহঙ্কার হইয়া দাঁড়াইব। সেই দিন সর্ব্বতোভাবে আমাদের উন্নতি হইবে, ধনে মানে যশে আমরা অন্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব।

ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯

ছায়াপথ

মেঘশূন্য নির্ম্মল অন্ধকার নিশীথে তারকাখচিত অনন্ত নীল নভোমণ্ডলে চাহিয়া দেখিলে, আকাশের কটীবন্ধ স্বরূপ ব্রহ্ম কটাহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ব্যাপী একটি মৃদু জ্যোতিশালী বিস্তৃত আলোক রেখা আমরা দেখিতে পাই। ইহার নামই ছায়াপথ। যদি পৃথিবী স্বচ্ছ হইত তাহা হইলে এই কটীবন্ধের অপর অর্দ্ধাংশ পদ-নিম্নের ব্রহ্ম কটাহেও আমরা দেখিতে পাইতাম।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের নিকট এই অলোক রেখা অতি আশ্চর্য্যজনক রহস্যের বিষয় ছিল, অনুমান ছাড়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোনই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। প্রতি রাত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র খচিত পথ মধ্য হইতে এই কিরণ রেখা তাঁহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইত, তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত চিত্তে ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া নিস্ফল হইতেন। তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই, দূরবীণ যন্ত্র ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হইত না, অনুমানের সত্যতা প্রমাণ হইত না। ইহা বহু দূরের অসংখ্য তারকা সমষ্টির কিরণ রাশি—কেবল এই অনুমান মাত্র করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট হইতে হইত। এই আলোক রেখা চিন্তাশীল লোকের যেমন চিন্তা উদ্দীপন করিত তেমনি বিস্ময়াভিভূত অজ্ঞান লোকদিগের কল্পনার বিষয় হইয়াছিল।

এই আলোক রেখা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভারতবাসীগণ কত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রবাদ এই যে, ছায়াপথ দিয়া শচী দেবী ইন্দ্রের সহিত প্রতি রাত্রে দেখা করিতে যান, কেহ কেহ বা বলেন, ইহা স্বর্গারোহণের পথ। অনির্দ্দিষ্ট বিস্ময়জনক এমন একটি দৃশ্যকে কল্পনা প্রভাবে অনেকে যে অনেক প্রকারে দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাহা এ পর্যন্ত কল্পনার স্বপ্ন মাত্র, বিজ্ঞানের প্রহেলিকা মাত্র ছিল, বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে এখন তাহার যথার্থ গূঢ় মহিমা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। গেলিলিওর নিকটেই আমরা এ জন্য বিশেষ ঋণী। তিনিই প্রথমে দূরবীণ অনুসন্ধানে আবিস্কার করেন যে, বহু দূরস্থিত অগণ্য অসংখ্য তারকারাশির ক্ষীণালোকেই ছায়াপথ দীপ্ত। ছায়াপথের তারকা দেখিবার জন্য অতি বৃহৎ

দূরবীণ যন্ত্রেরই আবশ্যক এমন নহে, গেলিলিও তাঁহার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ দূরবীণ দ্বারাই ছায়াপথের বিস্ময় দেখিয়াছিলেন।

ছায়াপথের এক অংশ মাত্র লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে নানা অবস্থাপন্ন তারকা রাশি নিহিত দেখা যায়।

যে নৈহারিক অভিব্যক্তি লইয়া বিজ্ঞান জগতে এত হুলুস্থূল, সেই মত অনুসারে একটি ফুলের যেমন শিশু অবস্থা, অপরিস্ফুট অবস্থা, এবং পূর্ণ বিকাশের অবস্থা আছে, একটি জ্যোতিষ্কেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। সেই মত অনুসারে, আমাদের সৌর জগৎ একটি মাত্র তারকা কলিকা ছিল, ক্রমে যতই তাহা পরিণত হইতে লাগিল ততই সেই একটি কলিকা হইতে গ্রহ উপগ্রহ রূপ পাপড়ি গুলি চারিদিকে প্রকাশ পাইয়া উঠিল।

সৌর জগতের আদিম অবস্থায় বিশাল জ্বলন্ত গোলকের বাষ্পরাশি আকাশে ব্যাপ্ত ছিল, সেই বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রভাবে কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া এক একটি বাষ্পচক্র সেই মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সেই আদিম অতি বিস্তৃত নীহারিকা রাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর গোলকে পরিণত হইল, সেই মধ্যের বৃহত্তর গোলকই আমাদের সূর্য্য — এবং সেই পরিত্যক্ত চক্রগুলির ঘন স্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ মিশিয়া এখন আবার তাহারা একটি একটি গ্রহ রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল পরিত্যক্ত অতি বিস্তৃত চক্রের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে তাহারাই সৌর জগতের উপগ্রহ।

আমাদের একটি সৌর জগতের ন্যায় অসংখ্য অগণ্য সৌর জগতে ছায়াপথটি সৃজিত। সৌর জগৎ বহু দলবিশিষ্ট একটি ফুল — ছায়াপথটি অগণ্য ফুল নির্ম্মিত একটি ফুলমালা। আকাশে যেমন আমরা অতি দীপ্তিবান তারকা হইতে অতি হীনপ্রভ তারকা দেখিতে পাই, সেইরূপ নানা শ্রেণীর প্রভাযুক্ত তারকা রাশি নানারূপ শৃঙ্খলায় ছায়াপথে বিন্যস্ত। আকাশের অসংলগ্ন তারকার ন্যায় কোন কোন স্থানে অসংলগ্ন ভাবে একটি একটি তারকা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কোন কোন স্থানে যেন কোন অপ্রতিহত শক্তি বলে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার মধ্যে হীরক চূর্ণের ন্যায়, চূর্ণ তারকাকণা অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আবার কোথায় একসারে কতকগুলি নিবদ্ধ, কোথায় পুষ্পমালিকার ন্যায় গোলাকারে গ্রথিত, কোথায় বা বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি শৃঙ্খলায় সজ্জিত। এই তারকামণ্ডলীতে বর্ণের বিচিত্রতা অতি সুন্দর। রক্ত পীত হরিৎ চম্পক নীল ইত্যাদি নানা বর্ণের বিচিত্রতায় পরস্পরের শোভা আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকাংশ তারকাই রক্ত পীত ও কমলালেবুর বর্ণ বিশিষ্ট। সেই রক্ত

পীত বর্ণশালী দলবদ্ধ তারকা রাশির মধ্যে মধ্যে দু একটি নীল হরিৎ বেগুণ প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণের তারা সংযোগে সকল বর্ণেরই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সর উইলিয়ম হার্শেল তাঁহার দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা আকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন বাষ্পময় নীহারিকা রাশি পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী নীহারিকা রাশি হইতেই অভিব্যক্ত। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে নীহারিকা রাশির গাঢ় অংশ লঘু অংশের সহিত মিলিয়া একটি একটি জ্যোতিষ্ক গোলক রূপে পরিণত। যে ছায়াপথ অসংখ্য তারকার রাজ্য — তাহাতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন তারকার অভাব নাই। যে হীনপ্রভ বিশালবিস্তৃত বাষ্পরাশি এখনো জ্যোতিষ্কে পরিণত হয় নাই, আবার যে সকল অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্রতর বাষ্পরাশি মধ্যভাগ জমাট বাঁধিয়া জ্যোতিষ্ক হইবার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং যাহারা জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং অবশেষে যাহারা জ্যোতিষ্ক রূপে পরিণত হইয়াছে, এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সকল শ্রেণীর জ্যোতিষ্কই ছায়াপথে বিদ্যমান। ছায়াপথের ক্ষুদ্র এক অংশে তারকা কলিকা হইতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট তারকা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হয়।

এই অনন্ত প্রসারিত জ্যোতিষ্ক মালিকা নির্ম্মিত ছায়াপথ, যাহার এক একটি ক্ষুদ্র তারকা এক একটি প্রকাণ্ড সূর্য্য — এবং অধিকাংশই আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর এবং দীপ্তিশালী, ইহার বিষয় ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়াভিভূত হয়।

পৃথিবীই আমাদের পক্ষে অতি প্রকাণ্ড অতি মহান। যদি আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মনুষ্য বংশ পরম্পরা পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল তথ্য এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলেও ইহার সমস্ত গূঢ় তাৎপর্য্য ধারণায় সক্ষম হইত কি না সন্দেহ।

কিন্তু এই মহান পৃথিবী সূর্য্যের তুলনায় কি অতি সামান্য একটি বিন্দু স্বরূপ — পৃথিবী হইতে সূর্য্য ১৫ লক্ষ গুণ বড়। নক্ষত্র খচিত যে অল্প মাত্র আকাশ খণ্ড আমাদের নিকট অনন্ত বলিয়া বোধ হয় সেই আকাশের এক ক্ষুদ্র খণ্ডে মাত্র ছায়াপথ স্থিত — সেই ক্ষুদ্র খণ্ডেই আমাদের সূর্য্যের ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহদিগের অধীশ্বর রূপে রাজ্য করিতেছে, পৃথিবীর মত কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ তাহাদের অধীনে চালিত হইতেছে, আমাদের সৌর জগতের ন্যায় কত লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ পরস্পরকে পরস্পর আকর্ষণ করিতেছে। আমাদের সূর্য্যের অভ্যন্তরে কি রূপ কার্য্য চলিতেছে তাহা আমরা কতক পরিমাণে জানি। আমরা কল্পনা করিতে পারি না পারি কিন্তু ইহা জানি, যে ১০ সহস্র ক্রোশ ব্যাপী বাষ্পময় জ্বলন্ত পদার্থের অসাধারণ গতিশক্তি দ্বারা সূর্য্য গোলক মধ্যে প্রতিক্ষণে কি ভয়ঙ্কর ঝটিকা চলিতেছে। সূর্য্যমধ্যস্থ পদার্থ প্রতি মুহূর্ত্তে আশি নব্বই ক্রোশ ঊর্দ্ধে ছুটিতেছে। প্রতি

মুহূর্ত্তের এই ভয়ঙ্কর বিপর্য্যস্ত পদার্থ রাশিতে সূর্য্য মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর বিপ্লব চলিতেছে তাহা আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত, যে এই ভয়ঙ্কর ভাব আমাদের নিকট লুক্কায়িত। প্রতি দিন প্রাতঃকালে যখন অতি নিস্তব্ধ শান্ত ভাবে সূর্য্য আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় তখন শান্তি রসে নিমগ্ন হইয়া আমরা সূর্য্যকে প্রণাম করি। কিন্তু এক সঙ্গে উত্থিত শত শত ভীষণ ঝটিকার সমস্ত পৃথিবী কম্পন জনিত গর্জ্জনে, শত শত ঘোর বজ্র নিনাদেও সূর্য্যের সে বিপ্লব বুঝাইতে অক্ষম। এই সকল জানিয়া আমরা ছায়াপথের একটি একটি তারকায় যখন এইরূপ এক একটি সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

কেবল ছায়াপথ কেন, আমরা আকাশের যে দিকে চাহিয়া দেখি, সৌর জগতের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া চারিদিকে যে অসংখ্য নক্ষত্র রাশি দেখিতে পাই সকলই এক একটি সূর্য্য। ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে স্থিত যে ইহাদের গ্রহ উপগ্রহ আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের চক্ষে যে অল্প মাত্র আকাশ প্রত্যক্ষ, তাহাতেই যখন আমরা এত অসংখ্য সূর্য্য দেখিতে পাই, তখন এইরূপ একটির উপর একটি করিয়া কত শত শত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকাশের কোলে জাগিতেছে যাহা আমরা অতি বৃহৎ দূরবীণ যন্ত্র দ্বারাও দেখিতে অপারক।

প্রতি সেকেন্ডে আলোকের গতি প্রায় ১০০ লক্ষ ক্রোশ—কিন্তু আমাদের নিকট হইতে ঐ সকল তারকাবলী এত দূরে স্থিত যে ঐ রূপ প্রভূত দ্রুত গতিতে আবহমান কাল দৌড়িয়াও উহাদের আলোক এখনো আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। ছায়াপথের দুর্ভেদ্য গভীর তারকা মণ্ডপ ভেদ করিতে গিয়া হার্সেল কেবল মাত্র ২০০ লক্ষ তারকা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ৯২০ লক্ষ মাইল দূর পর্য্যন্ত দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, ইহার উপর আর দূরবীণ দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় না। তাহার পর আবার সেই অস্পষ্ট আলোক রেখায় পরিণত হয়। তদপেক্ষা দূরে আর স্পষ্ট তারকা রাশির চিহ্ন পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র ধূমময় একটি আলোক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কেবল মাত্র চক্ষে আমরা ছায়াপথে যেমন একটি বাষ্পময় আলোক রেখা দেখিতে পাই, দূরবীণ যন্ত্র দ্বারাও অবশেষে আমরা সেই একই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাই। যেরূপ বিস্ময়চিত্তে ছায়াপথের তথ্য জানিতে জ্যোতির্ব্বেত্তারা তারকাসমুদ্র পার হইতে অগ্রসর হন, তেমনি বিস্ময়চিত্তে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া আবার অজ্ঞান অন্ধকারে পথহারা হইয়া পড়িতে হয়।

বালক, ফাল্গুন ১২৯২

তারকা-রাশি

তারকা-জ্যোতি নামক প্রবন্ধে নক্ষত্র জগতের একটি সমগ্র দৃশ্য পাঠকের নিকট উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এই সমগ্র নক্ষত্র জগৎকে জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাশিতে বিভক্ত করিয়া—তন্মধ্য হইতে আবার কি প্রণালী অনুসারে এক একটি নক্ষত্র নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন তাহা এই পরিচ্ছেদে বলা হইতেছে।

যেমন পৃথিবীর এক একটি রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, তেমনি নক্ষত্র রাজ্যও রাশি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। আকাশের এক এক ভাগের কতকগুলি নক্ষত্র-রাশি লইয়া সেই নক্ষত্র-রাশির কল্পিত আকৃতি অনুসারে এক একটি রাশি আখ্যাপ্রাপ্ত।

নক্ষত্র জগৎ অতি পুরাতন কাল হইতে উক্তরূপ রাশি-বিভাগে বিভক্ত। হিন্দু জ্যোতিষ-গ্রন্থে রাশিচক্রের (পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সেই চক্রপথকে রাশিচক্র কহে) মেষ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি—রোহিণী ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রের সমষ্টি। কত পুরাকালে এই নক্ষত্র-রাশি হিন্দু জ্যোতিষী-কর্ত্তৃক এইরূপ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা আমরা জানি না। তবে হিন্দু জ্যোতিষই যে পৃথিবীর আদি জ্যোতিষ,—উক্ত রাশি সকল যে অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষিত এবং নির্ণীত হইয়াছিল—তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা আর্য্যভট্টের জ্যোতিষগ্রন্থই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থ, সেই সময় ভারতবর্ষে জ্যোতিষের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। পৃথিবী যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ইয়োরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে—কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—"ভূপঞ্জরঃ স্থিরোভূরে বাবৃত্ত্যা বৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকো উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাং।"

"পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতই স্থির নক্ষত্রমণ্ডল এবং গ্রহগণের উদয় অস্ত হইতেছে।"

পৃথিবীর সমস্ত গতিই তখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এমন-কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি Precession of the Equinoxes যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত তাহা অল্পদিন মাত্র ইয়োরোপে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু আর্য্যভট্ট ইহাও কহিয়া

গিয়াছেন। সুতরাং আর্য্যভট্টের পূর্ব্বেও যে নক্ষত্র জগতের উক্ত রাশি নির্ণীত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু আর্য্যভট্টের কতদিন পূর্ব্বে—প্রথম কাহার দ্বারা উহা নির্ণীত হইয়াছিল—তাহা কেহ বলিতে পারে না—পারিবার সম্ভাবনাও নাই। তবে খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্যোতিষ আলোচনা দেখা যায়, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের যত্ন ও অনুসন্ধানে ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এখন নক্ষত্র রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার রাশি নির্ণয় করা—জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম ও সহজ কাজ, সুতরাং খৃষ্টের জন্মিবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নক্ষত্রদিগের উল্লিখিত রাশি বিভাগ হইয়াছিল—ইহা অনুমান করিলেও নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না।

সে যাহা হউক, ইয়োরোপ প্রথম মিশরের নিকট জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান শিক্ষা করে। মিশর-দেশবাসী হিপার্কসই[৩৪] ধরিতে গেলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গুরু। খৃষ্টাব্দের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আকাশে ১০২২টি নক্ষত্র গণনা করেন। খৃষ্টাব্দের দেড়শত বৎসর পরে মিশরবাসী টলেমি সেই তারাগুলিকে ৪৮ রাশিতে বিভক্ত করেন। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে টাইকো ব্রাহি[৩৫] ইহার সহিত আর দুইটি রাশি যুক্ত করেন—উক্ত ৫০ রাশির সহিত আধুনিককালে আর ৬৯টি রাশি যুক্ত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১০৯টি হইয়াছে। এই ১০৯টির মধ্যে দ্বাদশটি রাশি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ পথে অধিষ্ঠিত। আমরা প্রথমে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির ল্যাটিন ইংরাজি ও বাঙ্গলা নাম নিম্নে প্রদান করিলাম।

লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা বা সংস্কৃত
Aries	The Ram	মেষ
Taurus	The Bull	বৃষ
Gemini	The Heavenly Twins	মিথুন
Cancer	The Crab	কর্কট
Leo	The Lion	সিংহ
Virgo	The Virgin	কন্যা
Libra	The Scales	তুলা
Scorpio	The Scorpion	বৃশ্চিক
Sagittarius	Archer	ধনু
Capricornus	He-goat	মকর
Aquarius	The Man	কুম্ভ
Pisces	The Fish	মীন

যায়—তাহা উত্তর দিকে অবস্থিত, তাহাদিগকে উত্তরের রাশি বলে। উত্তর

রাশির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান—

	লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা*
১	Ursa Major	The Great bear (The Plough)	সপ্তর্ষি মণ্ডল।
২	Ursa Minor	The Little bear	ধ্রুব নক্ষত্র মণ্ডল।
৩	Draco	The Dragon	
৪	Cepheus	Cepheus	
৫	Bootes	Bootes	এই নক্ষত্র রাশির প্রধান নক্ষত্রটি আমাদের তুলা রাশির অন্তর্গত স্বাতি নক্ষত্র—সুতরাং ইহাকে স্বাতি নক্ষত্রমণ্ডল বলা যাইতে পারে।
৬	Corona Borealis	The Northern Crown	
৭	Hercules	Hercules	
৮	Lyra	The Lyre	ইহার প্রধান নক্ষত্রটির নাম অভিজিৎ।
৯	Cygnus	The Swan	
১০	Cassiopea	Cassiopea (The Lady's Chair)	
১১	Perseus	Perseus	
১২	Auriga	The Waggoner	
১৩	Serpentarius	The Serpent Bearer	
১৪	Serpens	The Serpent	
১৫	Sagitta	The Arrow	ধনুরাশির অন্তর্গত পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র দুইটি এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আছে।
১৬	Aquila	The Eagle	ইহার প্রধান নক্ষত্রটি শ্রবণা নক্ষত্র—ইহা মকরের অন্তে অধিষ্ঠিত।

* ডেরাডুন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ আমাদের এই বাঙ্গলা নামগুলি দিয়াছেন। বিশেষ প্রসিদ্ধ কয়েকটি ছাড়া হিন্দু জ্যোতিষে রাশি চক্রের বহির্ভাগস্থ নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় না। এখানে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানই আমাদের শিক্ষণীয়— সুতরাং তাহা জানিবারও বিশেষ আবশ্যক নাই।

১৭	Delphinus	The Dolphin	ইহার একটি নক্ষত্র ধনিষ্ঠা—ইহা কুম্ভরাশির অন্তর্গত।
১৮	Equuleus	The Little Horse	
১৯	Pegasus	The Winged Horse	ইহার মধ্যে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র দুইটি আছে। প্রথমটি কুম্ভরাশির অন্তে, দ্বিতীয়টি মীনরাশিতে অধিষ্ঠিত।
২০	Andromeda	Andromeda	
২১	Triangulum	The Triangle	
২২	Camelopardalis	The Cameleopard	
২৩	Canes Venatici	The Hunting Dogs	
২৪	Vulpecula et Anser	The Fox and the Goose	
২৫	Cor Caroli	Charles' Heart	

রাশিচক্রের নিম্নদেশে যে কয়েকটি রাশি আছে—তাহা দক্ষিণ ভাগের রাশি। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান।

	লাটিন	ইংরাজি	বাঙ্গলা
১	Cetus	The Whale	
২	Orion	Orion	কালপুরুষ মৃগশিরা এবং আর্দ্রা নক্ষত্রদ্বয় ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই উভয় নক্ষত্র মিথুন রাশিতে অবস্থিত—তন্মধ্যে মৃগশিরা বৃষ রাশি ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে।
৩	Eridanus	The River Eridanus	
৪	Lepus	The Hare	
৫	Canis Major	The Great Dog	
৬	Canis Minor	The Little Dog	
৭	Argo Navis	The Ship Argo	
৮	Hydra	The Snake	ইহার মধ্যে কর্কট রাশির অন্তর্গত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রটি আছে।
৯	Crater	The Cup	
১০	Corvus	The Crow	
১১	Centaurus	The Centaur	ইহার মধ্যে কন্যা রাশির হস্তা নক্ষত্র আছে।

১২	Lupus	The Wolf
১৩	Ara	The Alter
১৪	Corna Australis	The Southern Crown
১৫	Piscis Australis	The Southern Fish
১৬	Monoceros	The Unicorn
১৭	Columba Noachi	Noah's Dove
১৮	Crux Australis	The Southern Cross

সমস্ত আকাশ এইরূপ নক্ষত্র রাশিতে বিভক্ত হইলে পর—এখন কেবল বাকী থাকে সেই রাশিস্থিত প্রত্যেকটি নক্ষত্রকে চিনিবার একটি উপায় স্থির করা।

জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার একটি অতি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। একটি রাশির মধ্যে যে তারাটি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, সেই তারাটিকে সেই রাশির ক-তারা বলা হয়। এইরূপ রাশিস্থিত তারকার ঔজ্জ্বল্যের ক্রম-অনুসারে রাশির নামের সহিত গ্রীক অক্ষরের ক,খ,গ,ঘ পূর্ব্ব-যুক্ত হইয়া প্রত্যেক তারাটির নামকরণ হইয়া থাকে।

এইখানে একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। লাইরা (Lyra) রাশির সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারাটির কথা আমি লিখিতে চাই—কিরূপে লিখিব ? আমাকে লিখিতে হইবে a lyroe। এখানে লাইরা শব্দটি ষষ্টি বিভক্তিযুক্ত হইয়া—তাহার আগে a অক্ষর বসিয়াছে—ইহার অর্থ লাইরার a। বাঙ্গলায় লিখিতে হইলে আমরা লিখিব ক-লাইরা, কিম্বা লাইরার ক। a Ursoe Minoris কিম্বা আর্ষা মাইনরের-ক বলিলে বুঝিতে হইবে উক্ত রাশির সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাটি।

এইরূপ আধুনিক নামকরণ ছাড়া—কতকগুলি উজ্জ্বল তারকার প্রাচীন কাল হইতে এক একটি নাম আছে। যেমন, ক-লাইরা বেগা (Vega), ক-বুটিস আর্কটরাস (Arcturus), খ-ওরায়ন রিগেল নামে (Regal) ও ক-আর্ষা মাইনর ধ্রুবনক্ষত্র (Polaris, Pole Star) নামে অভিহিত।

আকাশের প্রথম শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল বিংশতি তারকার নাম—ইহাদের ঔজ্জ্বল্য মর্য্যাদা-অনুসারে যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

		কোন রাশিতে আছে
Sirius*	সিরিয়াস	Canis Major
Canopus	ক্যানোপাস	Argo
Alpha	অ্যালফা	Centaur

* ইহাকে মৃগব্যাধ বা লুব্ধক কহে। ইহা আকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকা।

		কোন রাশিতে আছে
Arcturus	আর্কটরাস	Bootes
Regal	রিগেল	Orion
Capella	ক্যাপেলা	Auriga
Vega	বেগা	Lyra
Procyon	প্রোকায়ন	Canis Minor
Betelgeuse	বেটেলগুস্	Orion
Achernar	আকার্ণর	Eridanus
Aldebaran	অ্যালডেবেরণ	Taurus
Beta, Centauri	বিটা, সেন্টরি	Centaur
Alpha, Crucis	অ্যালফা, ক্রুসিস	Crux
Antares	অ্যানট্যারিশ	Scorpio
Atair	আটেয়ার	Aquila
Spica	স্পাইকা	Virgo
Fomalhaut	ফোমালহট	Piscis Australis
Beta Crucis	বিটা ক্রুসিস	Crux
Pollux	পোলাক্স	Gemini
Regulus	রেগুলাস	Leo

[illegible]

মিলাইয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই প্রবন্ধোক্ত রাশি, নক্ষত্রের সহিত সবিশেষ পরিচিত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্রগণ আমাদের নিকট হইতে এত প্রভূত দূরে অবস্থিত যে সহস্র সহস্র বৎসরের কমে স্বাভাবিক চক্ষুতে ইহাদের গতি কিছুই অনুভূত হয় না। শত শত বৎসর পূর্ব্বে হিপার্কস, টলেমি প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ যে নক্ষত্র রাশিকে আকাশের যে স্থানে দেখিয়া গিয়াছেন, স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলে আজও তাঁহারা তাহাদিগকে ঠিক সেই একই স্থানে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তথাপি বাস্তবিক পক্ষে ইহারাও গতিশীল। আমাদের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি তারকার গতি জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন, কেবল তাহাই নেহে—সেই গতির পরিমাণ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছেন। রেলগাড়ী যত দ্রুত চলে, পৃথিবী তাহার সহস্রগুণ দ্রুতবেগে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে—আর্কটরাস নক্ষত্র পৃথিবীর তিনগুণ বেগে চলিয়া—প্রতি সেকেন্ডে অন্তত ৪৫ মাইল ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের এই সূর্য্য, ইহাও নক্ষত্র জগতের একটি তারকা, ইহা পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেন্ডে

অন্ততঃ ৪ মাইল বেগে হারকিউলিস রাশির দিকে ধাবিত হইতেছে। সূর্য্যের এই গতি দ্বারা নক্ষত্রদিগের ক্রমশ অল্পে অল্পে যে স্থান পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দূরবীণ যন্ত্রদ্বারা জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা বুঝিতে পারেন।

নক্ষত্রদিগের উল্লিখিত যে গতি তাহা প্রকৃত গতি, ইহা ছাড়া পৃথিবীর দৈনিক গতি বাৎসরিক গতির সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রদিগের (ধ্রুব নক্ষত্র ছাড়া) আমরা যে গতি অনুভব করি—তাহা তাহাদের দৃশ্যতঃ গতিমাত্র। কেননা পৃথিবী ঘুরিতেছে ইহা ত আমরা অনুভব করি না, কাজেই পৃথিবী যত ঘুরিতে থাকে—আমরা ততই তারকা রাশিকে ঘুরিয়া যাইতে দেখি। নক্ষত্র জগতের এই দৃশ্যতঃ গতি অর্দ্ধঘন্টার মধ্যেই একজন দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হয়।

ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৪

সমাজ ও সংস্কৃতি

গিল্‌টির বাজার

কে তুমি বাঙ্গালি, খাঁটি জিনিস হাতে লইয়া এ গিল্টির বাজারে উদারতা কিনিতে আসিয়া ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া আছ? এখানে খাঁটির আদর নাই, ঘরের কড়ি দিয়াও এখানে খাঁটি জিনিস বিকান দায়। ভাগের কানাকড়ি দিয়া ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ এখানকার উদারতার ভাণ্ডারকে ভাণ্ডার কিনিয়া লইয়াছেন, তুমি আস্ত কড়ি ফেলিয়া আর কিনিবে কি? অদৃষ্টের জোর বড় জোর! তোমার অদৃষ্ট মন্দ—তুমি আর এখানে কেন? তুমি যদি সর্ব্বস্ব পণ কর সমস্ত পুঁজি খোয়াও তোমার ভাগ্যে উঠিবে অপযশের টিকিট। উদারতার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া লইবার সময় ভাগ্যবানেরা ইহাই মাত্র এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন। তুমি যে নয়নের জল দিয়া অত্যাচারীর চরণ ধৌত করিতেছ, তুমি যে বুকের রক্ত দিয়া শত্রু পালন করিতেছ, তুমি যে ঈর্ষার বিষময় ভ্রূকুটিকে হাসিয়া ক্ষমা করিতেছ, তবুও উদারতা নাম তোমার ভাগ্যে নাই। দুর্ভাগা হইলে এইরূপই হয়, তুমি আগেও যা ছিলে এখনো তাই, তোমার সাত গাঁ মাগিলেও যা এক গাঁ মাগিলেও তাই। তবে আর কাজ কি? তোমার খাঁটি সম্পত্তিটুকু আর ঝুটার দোকানে খোয়াইবে কেন? খাঁটি দিয়া ঝুটা নামে তোমার আবশ্যকই কি? তোমার খাঁটি লইয়া তুমি খাঁটি বাজারে যাও, সেখানে খাঁটিতে খাঁটি চিনিবে, খাঁটি দিয়া অনেক খাঁটি কাজ করিতে পারিবে, নহিলে এখানে তোমার একূল ওকূল দুকূল যায়।

এখানে যদি তুমি প্রতিপত্তি চাও ত কষিয়া হাঁকিতে শিখ, ঝুটাকে খাঁটি খাঁটি করিয়া পূর্ণবলে চীৎকার কর, তাহা হইলে তোমার গিল্টি মালও Not guilty হইয়া খাঁটি সোণার দরে বিক্রয় হইবে।

নাম কিনিতে গেলে চীৎকার তোমাকে করিতেই হইবে, যদি নেহাত গলাবাজি করিতে না চাও ত নীরবেও দমবাজি করা চাই। অধিক সেয়ানা লোকেরা এইরূপই করিয়া থাকেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন তাঁহাদের কোন উদারতা নাই। আছে আছে অপেক্ষা নাই নাই করিয়া অনেক সময় তাঁহারা অধিক জয়ী হন, নাই নাই বলিয়া এমন বুক ফুলাইয়া গম্ভীর ভাবে গোঁপে চাড়া দিতে থাকেন, যে, তাঁহাদের নীরব মাহাত্ম্যের ছটা চারি দিকে

বিকীর্ণ হয়। যদি তুমি এই ঝুটার বাজারে উদার নাম পাইতে চাও তবে গলাবাজি নয় দমবাজি তোমাকে করিতেই হইবে, নহিলে পরের দুঃখ নিবারণের জন্য তুমি যতই কর, দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে লক্ষমুদ্রাই দাও আর সরজন লরেন্‌সের মৃত যাত্রীদিগের বিপন্ন আত্মীয়দিগকে নীরবে সাহায্যই কর—ইংলিসম্যানের ফন্ডে চার গণ্ডা পয়সা দানের ঝনঝনানিতে যতক্ষণ সকলের কানে তালা না লাগাইতে পার ততক্ষণ উদার ডিগ্রির ডিপ্লোমা কিছুতেই পাইবে না—উদার-মহাত্মাগণ তোমার করুণার প্রতি, তোমার দানশীলতার তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিবেন—"গর্ভর্ণমেন্ট জোর করিয়া দান না করাইলে তোমরা দান করিতে চাহ না, যদিও এরূপ জবরদস্তি করিয়া দান করান অন্যায়, কিন্তু ইহা ছাড়া বাঙ্গালিদিগকে দান করাইবার অন্য উপায় নাই।"

ঐ যে দেখিতেছ উদার ব্যক্তিগণ,—তোমার প্রতি সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া—তোমার প্রতি পদক্ষেপের সুতীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তোমার ওষ্ঠাধরের প্রত্যেক স্ফুরণের সহস্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—সাবধান, উঁহাদের উদারতায় সন্দেহ করিও না, কি জান এ রকম উদারতা বড় শক্ত জিনিস, ইহার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তুমি যে নিশ্বাস ফেলিবে, সে নিশ্বাস তোমার উপরই আসিয়া পড়িবে। তাঁহারা যে কেবল মাত্র ছাঁকা নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার জন্য দেশ ভুঁই আত্মজন পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে পীড়ন করিবার এই কার্য্যে নিশিদিন যাপন করিতেছেন,—ইহার পর নিষ্কাম ধর্ম্ম কি আছে? যদি তুমি ইহার উপর একটি কথা কও, তাহা হইলে তোমার মতন অনুদার, নীচ, কৃতঘ্ন ব্যক্তি আর নাই। উদার ব্যক্তিগণ নিন্দা করিতে জানেন না, তবে যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তোমার নামে দশ সহস্র মিথ্যা কথা না কহিয়া জলগ্রহণ করেন না,—সে তোমারি ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য। কি উদারতা! তুমি যদি এই উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া, আত্মরক্ষার অনুরোধে এই মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ দু' এক কথা বল,—তবে বল দেখি তুমি কি পাষণ্ড নরাধম!

তাঁহার প্রতি যদি তুমি এইরূপ ব্যবহার করিতে, এইরূপ সহৃদয়তা দেখাইতে, তাহা হইলে তিনি কি একটি কথা কহিতেন, তখনি নীরবে দুই হস্তে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন।

হে ম্লান মুখ বাঙ্গালি, যদি উদার নাম চাও, ত স্বার্থপরতাকে নিঃস্বার্থতা, নিষ্ঠুরতাকে দয়া বলিয়া উদার ব্যক্তিগণের কাণের কাছে দিন রাত চীৎকার কর—যদি তা না পার—ত ওখান হইতে চলিয়া এস, এস, নামের আশা ছাড়িয়া নীরবে কাজ করিয়া আমাদের আনন্দের আলিঙ্গনে, আমাদের বন্ধুত্বের প্রশংসায় তাহার প্রতিদান গ্রহণ কর; ঝুটা নাম হইতে, এ খাঁটি সহৃদয়তা

কি তোমাকে অধিক আনন্দ দিবে না, তোমার অধিক সম্মান-জনক নহে? আর তাহা যদি না চাও ত উদার ব্যক্তির আঘাত অনুগ্রহ বলিয়া আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

ঐ যে ব্যাঘ্র মেষশাবককে উদরস্থ করিল, কি করুণা! শাবক তাহার পালকের নিকট কত অত্যাচারই সহিতেছিল,—নিমেষে ব্যাঘ্র তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিয়া দিল! যদি কোন আক্রান্ত ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিয়া প্রাণের দায়ে চীৎকার করিয়া ওঠে, আঘাত খাইয়া অমৃত বলিয়া উদার ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ না করে, এবং সমবেদনা পাইবার জন্য সে কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করে, তাহা হইলে আর কি বেচারাদের দুর্দ্দশা রাখিবার স্থান থাকে? নীচমনা অকৃতজ্ঞ নিন্দুক নামে তাহাদের চিরকলঙ্ক থাকিয়া যায়। এ বাজারের এই নিয়ম, ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণ অত্যাচার করিয়া উদারতা কেনেন, আর নিঃক্ষম বেচারাগণ প্রাণের দায়ে অশ্রুজল ফেলিলেও অকৃতজ্ঞ নাম লাভ করে।

এইরূপ উদারতা গুণেই ইংরাজগণ ভারতকে রুষদিগের নিকট হইতে রক্ষা করিতেছেন, ব্রহ্মদেশকে আশ্রয় দিয়াছেন,—এইরূপ উদারতা গুণেই তাঁহারা ইলবার্ট বিলের সৃষ্টি করিয়াছেন, হীন নেটিভদিগকে অবিরত পিট থাপড়াইয়া নীচু স্থানে বসাইয়া রাখিতেছেন, উচ্চে দাঁড়াইবার সামান্য কষ্টটুকু পর্য্যন্ত তাহারা যেন না পায়! আর এই উদারতা গুণেই প্রতিদিন ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালীদিগের উপর অজস্র মিথ্যার বর্ষণ দেখা যাইতেছে।

হে উদার-চেতা মহাত্মাগণ, তোমাদের চরণে সহস্র সহস্র নমস্কার করিয়া এই মাত্র ভিক্ষা চাই, অনুগ্রহ করিয়া গরীব আমাদের উপর তোমাদের উদারতা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হও।

ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪

স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল

এখন আর সেকাল নাই, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি পুরুষদিগের আর তেমন হতাদর, অনাস্থা নাই, বরঞ্চ বিপরীত। এমন কি, এখন নাকি বিবাহের সম্বন্ধের সময় কন্যা-দর্শনে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন মেয়েটি কেমন লেখাপড়া জানে, কখানা বই পড়িয়াছে? আর বই পড়ার সংখ্যা বেশী হইলে বরের পণের টাকা নাকি কমে।

কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে এরূপ গুজব উঠাও শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষার দিকে বঙ্গ-সমাজ অন্ততঃ কতক পরিমাণেও না ঝুঁকিলে আদৌ এ কথা উঠিবেই বা কেন? মহিলাগণ সুশিক্ষিত হইলে পুরুষদিগেরই যে সুখ সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রীলোকে মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত জ্ঞান হইলে নিজের কর্ত্তব্য যে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবেন, উপযুক্ত গৃহিণী, উপযুক্ত সঙ্গিনী, উপযুক্ত মাতা হইতে পারিবেন,—পুরুষেরা ইহা যে কতকটা বুঝিয়াছেন চারিদিক দেখিয়া তাহা বেশ মনে হয়।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কার্য্যত স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কতদূর হইয়াছে? কতকটা উন্নতি যে হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু শিক্ষার এই ছড়াছড়িতে শিক্ষা কতটুক হইতেছে ইহাই মাত্র আমাদের জিজ্ঞাস্য? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়াছে তেমন গভীরতা কই? ইহার আড়ম্বর যতটা দেখিতেছি অন্তঃসারতা ততটা কই?

কেহ বলিবেন, স্ত্রীলোকে বি, এ, এম, এ, পাশ করিতেছে তবু বল শিক্ষার গভীরতা কই? ইহাপেক্ষা অন্তঃসার-শিক্ষা আবার কি চাও?

বি, এ, এম, এ, পাশ করা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত শিক্ষা কি না এবং ইহার গভীরতাই বা কতদূর ইহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে—মাঝে মাঝে উঠিয়াও থাকে, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব কথা থাক, আমরা মানিয়াই লইতেছি বি এ, এম্ এ পর্য্যন্ত পড়া আপাততঃ স্ত্রীলোকের যথেষ্ট শিক্ষা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি বি, এ, এম, এ, পাশ করে সে কয় জন? আর যে কয় জনই করুক সাধারণ হিন্দু সমাজের সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক?

যাহারা আপন কন্যা ভগিনীদিগকে ইয়ুনিবর্সিটির পরীক্ষার জন্য পড়ান তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় সাধারণ হিন্দুসমাজ-ভুক্তই নহেন, হিন্দুসমাজের সম্প্রদায় বিশেষ মাত্র। সুতরাং বঙ্গসমাজের সম্প্রদায় বিশেষের মহিলাদিগের শিক্ষা ভাল হয় বলিয়া কি করিয়া বলিব বঙ্গ-মহিলাদিগের বেশ শিক্ষা হইতেছে।

সাধারণ বঙ্গসমাজে বড় জোর ১০/১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকাগণ অবিবাহিত থাকে, পিতা মাতা ইচ্ছা করিলেও সমাজ-ভয়ে আর বেশীদিন কন্যাগণকে অবিবাহিত রাখিতে পারেন না। অথচ এই বিষয়ে কথা উঠিলে প্রায় সকলেই এজন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন, সমাজের এই অসামাজিক নিয়ম নিতান্তই অত্যাচার জোর জবরদস্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন, অথচ সমাজ-ভয়ে কেহই প্রায় ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করেন না ; তাঁহারা বুঝেন না, সমাজ বলিয়া স্বতন্ত্র একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ কিছুই নাই, তাঁহাদের প্রতি জনের সমষ্টিতেই সমাজ। তাঁহারা প্রতি জনে মুখে যাহা বলিতেছেন সত্যই যদি মনের অভিপ্রায় তাহাই হয় এবং কার্য্যতঃ তাহা করেন তবে তাহাই আবার সমাজের নিয়ম হইয়া যায়, সমাজ ভাঙ্গা গড়া তাঁহাদেরি হাতে। আসল কথা, আমাদের অতটুক সাহসের এখনো অভাব।

বিবাহ হইয়া গেলে তখন বাঙ্গালী ঘরে রীতিমত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব। একে সংসারের কাজকর্ম্ম, অবসর অল্প, তারপর শিখাইবার লোক নাই, স্বামী হয় নিজের পড়া কিম্বা আফিসের কাজ লইয়া ব্যস্ত, ঘরে আসিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না স্ত্রীর মাষ্টারি করিতে বসিবেন। মিশনারি মহিলাগণ কোন কোন স্থানে শিক্ষা দিয়া থাকেন কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষা-দান ত আর তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুসারে তাঁহারা শিক্ষা-দান করেন, খৃষ্টানী ধর্ম্মপুস্তকের কুৎসিত অপরূপ বাঙ্গলায় তাঁহারা বাঙ্গালীর মেয়েকে বাঙ্গলা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার মধ্যে তাঁহাদের কাছে মেয়েরা সেলাই শিখিতে পারে বটে, তাঁহাদের কাছে ভাষা শিক্ষা অশিক্ষা মাত্র।

এই সকল কারণে দেখা যায় বালিকাগণ বিবাহের পূর্ব্বে ১০/১১ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে যতটুক শেখে তাহাই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার একরূপ সীমা। এই অবস্থাতে বালিকাগণ অবিবাহিত বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা পায়—সেই শিক্ষাই যাহাতে বিশেষ ভাল হয়, সেই শিক্ষার গুণে বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অন্যের সাহায্য না পাইলেও নিজের অনুশীলন দ্বারা বালিকাগণ যাহাতে পরে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারি প্রতি লক্ষ্য দেওয়া কি আমাদের আপাততঃ কর্ত্তব্য নহে? এক মাত্র এই উপায়েই সামাজিক নিয়ম অভঙ্গ রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে, নহিলে লোকনিন্দা সমাজ-ভয় অতিক্রম করিয়া—সাধারণ বঙ্গসমাজ যে বালিকাদিগকে

বয়স্থা করিয়া রাখিয়া শিক্ষাদান করিবেন—এ আশা দুরাশা মাত্র।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রথমে দেখা আবশ্যক এখন বালিকাগণ ১০/১১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে কতদূর শেখে? বেথুন স্কুলই মহিলাদিগের সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়, সুতরাং ইহার স্কুল বিভাগের শিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিলেই আমরা সে সমস্ত পাইব। কলেজ বিভাগের সংশ্রবে আসিবার আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত সাধারণ হিন্দুসমাজের বালিকা যে কলেজ বিভাগে একটিও নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

স্কুল বিভাগ	ব্রাহ্ম	খ্রীষ্টিয়ান	হিন্দু
প্রথম শ্রেণী	৪	২	০
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫	০	০
তৃতীয় শ্রেণী	১২	৩	০
চতুর্থ শ্রেণী	১১	৩	২
পঞ্চম শ্রেণী	৬	১	২
ষষ্ঠ শ্রেণী	৩	১	১২
সপ্তম শ্রেণী	২	০	৫
অষ্টম শ্রেণী	১	০	৯

দুইটী ভিন্ন সব হিন্দু।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে চতুর্থ শ্রেণীর উপর আর হিন্দু বালিকা নাই, সুতরাং নীচের ক্লাশ হইতে এই ক্লাশ পর্য্যন্ত কিরূপ পড়া হয়—তাহাই এখন দেখা যাক।

৯ম শ্রেণী বা সর্ব্বনিম্ন ক্লাশ।
প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়
দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয়
শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ
সরল নীতিপাঠ
ধারাপাত।
ভূগোল সূত্র
First Book of Reading.
ধারাপাত।

৮ম শ্রেণী।
বোধোদয়
সরল পাঠ
পদ্যমালা ২য় ভাগ

৭ম শ্রেণী।
আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ
কবিতামালা
ভূগোল সূত্র
ধারাপাত
First Book of Reading.

৬ষ্ঠ শ্রেণী।
First Book of Reading

Royal Reader No I.
চারুবোধ ২য় ভাগ
পদ্যপাঠ ২য় ভাগ
প্রথম শিক্ষা ব্যাকরণ
প্রথম শিক্ষা ভূগোল
প্রথম শিক্ষা ইতিহাস
অঙ্ক লঘুকরণ পর্য্যন্ত।

৫ম শ্রেণী।

Royal Reader No II & III
Child's F. Grammar.
রামবনবাস
পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রথম ভাগ
ভূগোলপরিচয়
অঙ্ক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

৪র্থ শ্রেণী।

Royal Reader No IV
Little Arthur's History of England
Lennie's Grammar
Blochman's F Geography
Gangadhar B's Composition
ঐতিহাসিক সন্দর্ভ
কবিগাথা
উপক্রমণিকা
অঙ্ক বহুরাশিক পর্য্যন্ত।

শিক্ষা-পুস্তকের তালিকায় দেখা যাইতেছে—অষ্টম ক্লাশ হইতেই ইংরাজি আরম্ভ—আর চতুর্থ ক্লাশের মত উচ্চক্লাশেও উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার অভাব। এমন কি এ-ক্লাশে বাঙ্গলাতে সহজ বিজ্ঞান পুস্তকও একখানা পড়া হয় না।

এরূপ শিক্ষায় লাভ কতটুক? যাঁহারা প্রথম ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়া চালাইতে পারিবেন কিম্বা স্কুল ছাড়িয়াও যাঁহারা ঘরে পড়া চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এরূপ শিক্ষায় লাভ আছে, কেননা ইংরাজিটা তাঁহাদের এইরূপে কতকটা আয়ত্ত হইয়া আসিলে পরে ঘরে সহজ সহজ ইংরাজি পুস্তক তাঁহারা অল্পায়াসে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের চতুর্থ ক্লাশ পর্য্যন্তও উঠিবার অবসর মেলা ভার, ষষ্ঠ ক্লাশ হইতেই যাহাদের প্রায় সরিয়া পড়িতে হয়, বিদ্যালয়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সহিত যাহাদের একরূপ বিদায় লইতে হয়, ইংরাজি দু চারখানা বই পড়িয়া তাহাদের কি লাভ? লাভ ত কিছুই দেখি না, সম্পূর্ণই লোকসান। ইহাতে একূল ওকূল দুকূল যায়। প্রথমতঃ, ইংরাজি দু একখানা বই পড়িয়া কিছু ইংরাজি শেখা যায় না, দুদিন পড়া বন্ধ হইলেই আগাগোড়া সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হয়।—ইংরাজি ভাষা বিদেশীয় ভাষা, পুরুষগণ কত পরিশ্রমে তবু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন না, আর বালিকাগণ ছেলেবেলা একবার দু একখানা বই পড়িয়া যে ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া যাইবেন—পাগলেই এরূপ মনে করিতে পারে। তবে লাভে হইতে অতটা পরিশ্রম, অতটা সময় নষ্ট কেন? যে সময়টা স্কুলের ইংরাজি পড়া তৈয়ার করিতে যায়—সেই সময়টাও বাঙ্গলাতে দিলে বাঙ্গলা বেশ ভাল করিয়া শেখা

যাইতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ—তাহার উদ্দেশ্য গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারা না যে আমার মেয়ে দুখানা ইংরাজিও পড়িয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা আজ কাল যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে, সাহিত্যের ত কথাই নাই, বিজ্ঞান দর্শনের জ্ঞানও বাঙ্গলাভাষা হইতে মোটামুটি বেশ পাওয়া যাইতে পারে। আর তাহা ছাড়া—আবশ্যক, অভাব যত বাড়িবে, ভাষার উন্নতিও তত শীঘ্র হইবে। বাঙ্গালীগণ বাঙ্গলাতেই বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা করিতে যত চাহিবেন—ততই ইহার অভাব দূর হইবে, আমাদের জাতীয় ভাষা ততই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। বালিকাগণ ইংরাজি পুস্তক হইতে ইতিহাস অঙ্ক প্রভৃতি না শিখিয়া যদি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে পড়েন ত কেবল যে বাঙ্গালা ভাল শিখিতে পারিবেন এমন নহে, দেশের ভাষা বশতঃ তাহা অতি সহজে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। আর, একটা ভাষা যদি ভাল করিয়া শেখা যায়—অন্য ভাষা শিক্ষাও পরে সহজ হইয়া আইসে। বাঙ্গলা আমাদের দেশের ভাষা, ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া শেখা উচিত। বাঙ্গলাটা ভাল করিয়া শিখিবার পর—যদি কেহ ইংরাজি শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহাও তখন তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। এখনকার মত সমস্তই খিচুড়ি হইবে না।

বঙ্গ সমাজ এ বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, দেখিবেন,—অল্প বয়সে যে সকল বালিকাদিগের বিবাহ হইবে—বেথুন স্কুলের আধুনিক শিক্ষা প্রণালী তাহাদিগের উপযুক্ত হইতেই পারে না—তাহাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত অন্যরূপ হওয়া উচিত। স্কুলে বাঙ্গলাই তাহাদের প্রধান—এবং একমাত্র শিক্ষা হওয়া উচিত।

বলিতে আহ্লাদ হইতেছে, সম্প্রতি বেথুন স্কুলে এইরূপ উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বন্দবস্তের কথা হইতেছে। গবর্ণমেন্ট বালিকাদের জন্য একটি বাঙ্গলা শিক্ষা-বিভাগ খুলিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে বিভাগে বাঙ্গলাই মাত্র ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং এখনকার ষষ্ঠ ক্লাশ তাহার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা-ক্লাশ হইবে। আমরা উপরের তালিকায় দেখিয়া আসিয়াছি ষষ্ঠ ক্লাশে হিন্দু বালিকার সংখ্যাই অধিক, সুতরাং এ-বন্দবস্তে তাহারাই যে উপকার প্রাপ্ত হইবে বলা বাহুল্য। ষষ্ঠ ক্লাশের কথাই ত নাই, এমন কি পঞ্চম ক্লাশ পর্য্যন্ত বালিকারা স্কুলে বেশ পড়িতে পারে। ৫ বৎসর বয়সে তাহাদিগকে যদি স্কুলে দেওয়া হয় ত ১১ বৎসরে তাহারা পঞ্চম ক্লাশে বেশ উঠিতে পারে। প্রতি বৎসরে যদি তাহারা এক ক্লাশ করিয়া উঠে—তাহা হইলে ১০ বৎসরেই পঞ্চম ক্লাশে উঠিতে পারে—কিন্তু প্রতি বৎসরে যদি নাই ক্লাশ উঠিতে পারে তাই এক বৎসর হাতে রাখা গেল। ১১ বৎসর

পর্য্যন্ত আজ কাল অনেকেই অবিবাহিত থাকে—সুতরাং ছাত্রবৃত্তির পরও এক বৎসর তাহারা পড়া বেশ চালাইতে পারে।

গবর্ণমেন্টের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে স্ত্রীশিক্ষার যে উন্নতি সাধন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, ছাত্রীগণের পিতাগণ একজন ব্যতীত সকলেই এ বিভাগে কন্যা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা চান তাঁহাদের মেয়েরা একটু ইংরাজিও শিখিবে। কিন্তু কন্যাদিগকে তাঁহারা যদি উচ্চ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াইতে না চাহেন—একটু ইংরাজি শিখা যে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র—তাহাতে যে কোন শিক্ষাই ভাল করিয়া হয় না—ইহা যে তাঁহারা কেন বুঝিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারি না। কন্যার শিক্ষাই যদি তাঁহাদের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়—তবে উল্লিখিত সুবিধা অবিলম্বে গ্রহণ করা তাঁহাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য। এখন যদি এ বিভাগে যথেষ্ট কন্যা পাওয়া না যায়—সম্ভবতঃ গবর্ণমেন্ট এ বন্দোবস্ত উল্টাইয়া ফেলিবেন ; কেননা এরূপ বন্দোবস্ত ত আর অমনি হয় না—ইহার জন্য স্কুলের খরচ অবশ্যই কিছু না কিছু বাড়িবে। আর গভর্ণমেন্ট এ বন্দবস্ত তুলিয়া দিলে এমন সুবিধা আমাদের হেলায় হারাইতে হইবে। সেই জন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, যে-পিতাগণ তাঁহাদের কন্যাকে এই বিভাগে দিতে অসম্মত হইয়াছেন তাঁহারা আর একবার মনোনিবেশ পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন—আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবে, তাঁহারা এই নব বিভাগে কন্যাদিগকে ভর্ত্তি করিবার কোনই আপত্তি দেখিবেন না। বাস্তবিক এরূপ শিক্ষায় স্ত্রীশিক্ষার মূল যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইবে, তাহাতে কাহার সন্দেহ হইতে পারে ?

সংবাদপত্র সম্পাদকগণের প্রতি নিবেদন এই, এই বিষয়টি লইয়া তাঁহারা একটুকু আন্দোলন আলোচনা করুন। যদি সুবিধা বিবেচনা করেন ত এই প্রস্তাবটি তাঁহাদের পত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেও আমরা অনুরোধ করি।

অবশেষে বেথুন স্কুলের কমিটির প্রতি আমাদের একটি বক্তব্য আছে। বালিকাদিগের জন্য এই যে বাঙ্গলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্য পুরাতন কাহিনী পুস্তক সকল এই বিভাগের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। আগে কথকতা প্রভৃতি যে সকল উপায়ে ঐ সকল কাহিনী জনসমাজে প্রচার হইত তাহা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। তাহার পর ছাত্র সমাজ নিজের পাঠ্য পুস্তক লইয়াই ব্যস্ত, যে সকল মেয়েরা স্কুলে পড়েন তাঁহাদেরও সেই দশা, পরে বড় হইয়া অতবড় বইগুলা শেষ করা—তাহাও দুর্ঘট। যদি শিক্ষার পরিণাম শেষে এই দাঁড়ায়, পরের জিনিস শিখিতে গিয়া নিজের সব ভুলিয়া যাওয়া, তাহা হইলে সে পরিণাম যে

নিতান্তই শোচনীয় তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের জাতীয় গর্ব্ব, জাতীয় প্রবাদ, জাতীয় গৌরব যাহা কিছু আছে তাহা রামায়ণ মহাভারতেই আছে—তাহা যদি আমাদের ভুলিয়া যাইতে হয় তবে আর আমাদের রহিবে কি ? তাহা আছে বলিয়াই—সেই আদর্শ সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়াই এখনো আমরা আমাদের নিজত্ব যাহা কিছু রাখিতে পারিয়াছি, এই পদাবনীত অবস্থাতেও জাপানীদিগের ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্তিত্বে আমাদিগের ধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এখনো বিলীন হইয়া যায় নাই। কমিটিগণ এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া মহাভারত রামায়ণাদি বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। উহাতে তাহাদের শিক্ষাও হইবে আমোদও হইবে।

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব

আজকাল ইয়োরপে এক সমস্যা উঠিয়াছে, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতি কি না?

এতদিন এ সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন দ্বিধা ছিল না ; বাইবেল কহিয়াছেন, "ইব আদমের অংশ হইতে সৃষ্ট", সুতরাং স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতা এতদিন একটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত ছিল। কিন্তু চিরকালই কালের বিচিত্র গতি। হঠাৎ আজকাল সেই ধ্রুব বিশ্বাসের উপর কালস্রোতের আঘাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকে এখন পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্রয়াসী, স্কুল কলেজে তাহারা পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান উপাধি লইতেছে, তাহাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, হ্যারিয়েট মার্টিনো, মিশেষ ব্রাউনিং প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে পুরুষের সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝি আর বজায় থাকে না। এই ভয়ে ভীত হইয়া মহা মহা যোদ্ধৃ-পুরুষগণ রাশি রাশি ভারি ভারি যুক্তির পাথর জমা করিতেছেন, আর এক একখানি তুলিয়া বিপক্ষের মস্তকের প্রতি অব্যর্থ সন্ধান নিক্ষেপ করিতেছেন। বেচারাগণ মাথা লইয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রাখিয়া পলাইবে, কি লইয়া পলাইবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবে সুখের বিষয় এই—সেই যুক্তির পাথরগুলি তাহাদের হস্ত-নিক্ষিপ্ত হইতে না হইতে (বেশীরভাগই) এমন অযুক্তির ফেনার আকারে মিলাইয়া পড়িতেছে—যে বিপক্ষদের যেখানকার মাথা সেইখানেই অটুট থাকিয়া যাইতেছে।

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে কয়েক বৎসর হইল ডিলনে নামক একজন ফরাসীস্ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন, (ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ডিলনে নহেন, প্রায় ১৫ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) নলেজে তাহার যে সমালোচনা হয় আমরা তাহা হইতে কয়েকটি অদ্ভুত যুক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ডিলনের মতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ—কেননা—কীট মৎস্য প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতীয় জীবদিগের স্ত্রীজাতির বুদ্ধি সাধারণতঃ অধিক দেখা যায়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবদিগের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরা অধিক পরিমাণে বুদ্ধিমান।

ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে জীব যত উন্নতি লাভ করে তাহাদের পুরুষজাতিদের বুদ্ধিও তত উন্নতি লাভ করে, এবং পুরুষেরা যে পরিমাণে উন্নত হয়—স্ত্রীরা সেই পরিমাণে অবনতি লাভ করে—সুতরাং, মানুষের পুরুষেরা স্ত্রীজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া স্ত্রীগণও ত বলিতে পারেন দুই বিপরীত অবস্থার—অর্থাৎ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের অবস্থাগত প্রকৃতির রূপ প্রায় একই। যেমন আদিম অসভ্যদিগের মধ্যে সত্যের দিকে স্বাভাবিক যেরূপ অনুরাগ, সুসভ্যদিগের মধ্যে সত্যের দিকে বুদ্ধিগত সেইরূপ অনুরাগ দেখা যায়, অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্যের গুণ প্রায় একই রকম—ইত্যাদি, সুতরাং সর্প প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবের স্ত্রী বুদ্ধি যে-কালে অধিক দেখা যায়—সে-কালে উৎকৃষ্ট মনুষ্য জাতির স্ত্রী বুদ্ধিও যে অধিক হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ! সে যাহাই হউক, ডিলনের সিদ্ধান্তটি পুরুষের নিকট এতই সন্তোষকর—যে তাঁহার এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা আর তাঁহাদের বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নলেজ-সম্পাদক ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই—স্ত্রী কন্যাদিগকে নীচ প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চতা লাভ করিতে তিনি সম্মত নহেন।

এখন ডিলনে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে আর কি যুক্তি দিয়াছেন দেখা যাক। তাঁহার প্রথম যুক্তি—

"পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা বেশী খায়—আর মেয়েরা কম খায় কিন্তু বারে বারে খায়, সুতরাং পুরুষেরা শ্রেষ্ঠ।"

চমৎকার যুক্তি সন্দেহ নাই—তবে বেশী খাইতে পারা যে কিসে শ্রেষ্ঠতার চিহ্ন, আর কম অথচ বারে বারে খাইলেই বা হীনতা কেন প্রকাশ পায়—তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণতঃ ভদ্রলোক অপেক্ষা কুলি মজুরেই ত অধিক খায়, আর কম কম অথচ বারে বারে খাওয়া, ইহা ত ধনীদিগের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়। যাই হউক, নলেজ সম্পাদকের মতে কথাগুলি অর্থশূন্য।

দ্বিতীয় যুক্তি,

পুরুষদের নিশ্বাস টানিবার ক্ষমতা অধিক, এবং তাহারা অধিক মাত্রায় অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাহাদের নাড়ী যদিও স্ত্রী-নাড়ির ন্যায় বেগগামী নহে কিন্তু তাহাদের শরীরের তাপ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক।

নলেজ সম্পাদক বলিতেছেন—এই যুক্তির অনুকরণে স্ত্রীলোকেরাও ত বলিতে পারেন পুরুষের শরীর রক্ষার্থ অধিক অক্‌সিজেন আবশ্যক, তাহাদের নাড়ী ক্ষীণ, তাহাদের শরীরের তাপ অধিক—সুতরাং তাহারা আমাদের অপেক্ষা

নিকৃষ্ট।

তৃতীয় যুক্তি,

পুরুষের শরীর ও অস্থি স্ত্রীলোক অপেক্ষা আয়তনে অধিক সুতরাং তাহারা শ্রেষ্ঠ।

নলেজ সম্পাদক বলেন—হাতীর অস্থি ও শরীর পুরুষ (মানুষের) অপেক্ষাও আয়তনে অধিক তবে হাতী পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ?

ডিলনের যুক্তি,

পুরুষেরা ডান হাতে কাজ করে, বাঁ হাত ব্যবহার করিতে পারে না—কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বাঁ হাতেও অনেক কাজ করিয়া থাকে।

চার্লস রিড (একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক, তিনি ন্যাটা) বলিবেন ইহা নিকৃষ্টতার চিহ্ন নহে, বরঞ্চ ইহাকে উন্নতির চিহ্ন বলা যাইতে পারে। পুরুষদের একহাত কার্য্যক্ষম, স্ত্রীলোকের উভয় হাত কার্য্যক্ষম।

ডিলনের যুক্তি,

মেয়েদের পা বেশী মাটীর সঙ্গে মেশান, পুরুষদের খড়ম পা, সুতরাং পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ।

নলেজ সম্পাদক,

খড়ম পা যে শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন ইহা নূতন শুনা গেল। পায়ের কার্য্য অনুসারে গঠন বিভিন্ন হয়। ডিলনে যদি ১০০ জন নর্ত্তকী ও ১০০ জন দ্বারবানের পা তুলনা করেন তবে নর্ত্তকীদের মধ্যে খড়ম পায়ের সংখ্যা অধিক হইবে।

ডিলনের যুক্তি,

পুরুষের স্বর মেয়েদের অপেক্ষা গম্ভীর ও তাহাদের শরীরে স্নায়বীয় শক্তি অধিক।

নলেজ সম্পাদক,

বৃষের স্বর আরো গম্ভীর ও গরিলার স্নায়বীয় শক্তি অধিক, তবে কি তাহারা পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ!

আর কত বলিব, এমন আরো অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু ডিলনের যুক্তির মাহাত্ম্য পাঠক বোধ হয় উল্লিখিত যুক্তিতেই যথেষ্ট পাইয়াছেন। তবে ডিলনে যে যুক্তির মত যুক্তি একেবারেই কিছু দেন নাই তাহাও নহে। পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের যে একটি সাধারণ যুক্তি আছে অর্থাৎ পুরুষের মস্তিষ্কভার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক, ইহা এবং এইরূপ দুই একটি যুক্তিযুক্ত কথাও তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু নলেজ সম্পাদক তাহার যে উত্তর দিয়াছেন আমরা তাহা পরে বলিব। আপাততঃ এই বলিতে পারি, ডিলনে স্ত্রীলোকদিগকে মস্তিষ্কহীন করিতে গিয়া যে নিজের মস্তিষ্ক হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাঁহার পুস্তকে তাহার

বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেনচুরি পত্রিকাতে সুলেখক জে, রোমানিস 'স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক পার্থক্য' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি এ সম্বন্ধীয় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাঁহার মতে পুরুষগণ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এবং শিক্ষার প্রভেদ এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে—এ শ্রেষ্ঠত্বে পুরুষদের জাতিগত জন্মগত অধিকার। কিন্তু বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠ জাতি ইহা তিনি বলেন না। বুদ্ধিই মনুষ্যের একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, দয়া মমতা ধর্ম্ম-ভাব প্রভৃতি কতকগুলি গুণে—অর্থাৎ হৃদয়ে স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠ।* আমরা বলি তবে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে উচ্চতা নীচতা লইয়া এত গোলযোগ কেন ? কেহ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, কেহ হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ, উভয়ের গুণের আদান প্রদানে মনুষ্যজাতি শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধির হিসাবে কোন কোন অংশে রোমানিস আবার স্ত্রীদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তিনি বলেন কোন একটা বিষয় স্ত্রীলোকে যেমন দ্রুত ধারণা করিতে পারে পুরুষে তেমন পারে না। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, স্ত্রীলোকে সাধারণত যত শীঘ্র পড়িয়া তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করে—পুরুষের

* But now, the meritorious qualities wherein the female mind stands pre-eminent are affection, sympathy, devotion, self-denial, modesty, long-suffering, or patience under pain, disappointment, and adversity, reverence, veneration, religious feeling, and general morality. In these virtues—which agree pretty closely with those against which the Apostle says there is no law—it will be noticed that the gentler predominate over the heroic; and it is observable in this connection that when heroism of any kind is displayed by a woman, the prompting emotions are almost certain to be of an unselfish kind.

All the aesthetic emotions are, as a rule, more strongly marked in women than in men—or, perhaps, I should rather say, they are much more generally present in women. This remark applies especially to the aesthetic emotions which depend upon refinement of perception.

* * *

Again, purity and religion are, as it were, the natural heritage of woman in all but the lowest grades of culture.

* * *

The whole organisation of woman is formed on a plan of greater delicacy, and her mental structure is correspondingly more refined: it is further removed from the struggling instincts of the lower animals, and thus more nearly approaches our conception of the spiritual.

তাহা হইতে অধিক সময় লাগে।** কিন্তু আসল বুদ্ধিতে অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তিতে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বুদ্ধি। স্ত্রীলোকের এ বুদ্ধির নিতান্তই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মতে শিক্ষার অভাবে স্ত্রীগণ যে উদ্ভাবনী শক্তির অভাব দেখায় তাহা নহে, কিট্‌স্, বার্ণস্, ফ্যারাডে ইহাদের মত অল্প শিক্ষা কত নারী না পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি একটা কিট্‌স্, বার্ণস্ কিম্বা ফ্যারাডে জন্মিয়াছে?

**She has gained even on the intellectual side, certain very conspicuous advantages. First among these we must place refinement of the senses, or higher evolution of sense-organs. Next we must place rapidity of perception, which no doubt in part arises from this higher evolution of the sense-organs—or, rather, both arise from a greater refinement of nervous organisation.

* * *

Again, reading implies enormously intricate processes of perception, both of the sensuous and intellectual order; and I have tried a series of experiments, wherein reading was chosen as a test of the rapidity of perception in different persons. Having seated a number of well educated individuals round a table, I presented to them successively the same paragraph of a book, which they were each, to read as rapidly as they could, ten seconds being allowed for twenty lines. As soon as time was up I removed the paragraph, immediately after which the reader wrote down all that he or she could remember of it. Now, in these experiments, where every one read the same paragraph as rapidly as possible, I found that the palm was usually carried off by the ladies. Moreover, besides being able to read quicker, they were better able to remember what they had just read—that is, to give a better account of the paragraph as a whole. One lady, for example, could read exactly four times as fast as her husband, and could then give a better account even of that portion of the paragraph which alone he had had time to get through. For the consolation of such husbands, however, I may add that rapidity of perception as thus tested is no evidence of what may be termed the deeper qualities of mind—some of my slowest readers being highly distinguished men.

Lastly, rapidity of perception leads to rapidity of thought, and this finds expression on the one hand in what is apt to appear as almost intuitive insight, and on the other hand in that nimbleness of mother-wit which is usually so noticeable and often so brilliant an endowment of the feminine intelligence, whether it displays itself in tact, in repartee, or in the general alacrity of a vivacious mind.

এইখানে একটি কথা, কিট্‌স্, বার্ণস্ সেরূপ উচ্চ-শিক্ষিত নাই হউন্ কিন্তু যুগযুগান্তর-ব্যাপী পুরুষে শিক্ষার ফল গুপ্তভাবে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান, আর স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত, অল্পস্বল্প স্ত্রীলোক কিট্‌স্ প্রভৃতির মত অর্দ্ধ শিক্ষা পাইলেও কাল পরম্পরার অশিক্ষায় তাঁহাদের মস্তিষ্ক হীন-স্ফূর্ত্ত। এরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। কিন্তু রোমানিস এ কথা মানেন না ; তিনি বলেন অন্ততঃ যতদিন স্ত্রীলোকদিগকে কিট্‌স্ ফ্যারাডে না দেখিতেছি ততদিন এই কথাই বলিব। তিনি বলেন, যখন মস্তিষ্কের ভার পুরুষের স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাঁচ আউন্স অধিক, তখন একমাত্র এই শারীরিক গঠন বিভেদই স্ত্রীদিগের অল্পবুদ্ধির কারণ দাঁড়াইতে পারে।

ডিলনেও এইরূপ একটি যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নলেজ সম্পাদক যে উত্তর দিয়াছেন রোমানিসের এই কথার উত্তরেও তাহা বলা যাইতে পারে। হাস্কির (Huschke) কথার নজির দিয়া ডিলনে বলিয়াছেন পুরুষের মস্তিষ্ক-আধার স্ত্রী অপেক্ষা শতাংশের ১৮ অংশ পরিমিত বড়। ইহা হঠাৎ শুনিতে যেমন মস্ত কথা, আসলে কিন্তু ততদূর নহে। শরীরের আয়তনের উপরই মস্তকের আয়তন নির্ভর করে। এখন পুরুষরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড়, সুতরাং তাহাদের মাথাও বড় হইবে। কিন্তু কথা হইতেছে স্ত্রীলোকদের শরীরের আয়তনের তুলনায় তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ কম কি না ? হাস্কির কথানুসারেই তাহা কম নহে, বরঞ্চ পুরুষের শরীর তুলনায় তাহাদের মাথা যত বড় স্ত্রীলোকের শরীর তুলনায় তাহাদের মাথা তদপেক্ষা অধিক বড়।

সে যাহাই হৌক, পুরুষেরা আপাততঃ যে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন এমন কথা আমরা বলি না। যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ-সম্বন্ধে নীচের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদিগকে সমান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে—সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহারা যে পুরুষ অপেক্ষা হীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিছুকাল ধরিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞানলাভে সমান অধিকার দাও, বিদ্যাবুদ্ধির সমান চর্চ্চা করিতে দাও, তখনো যদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অভাব দেখা যায়—তখন বুঝা যাইবে—তাহারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধি হিসাবে জাতিগত নিকৃষ্ট।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে রোমানিস কি বলিয়াছেন—নোটে তাহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটি শেষ করি।*

ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫

*In conclusion a few words may be added on the question of female education as this actually stands at the present time. Among all the features

of progress which will cause the present century to be regarded by posterity as beyond comparison the most remarkable epoch in the history of our race, I believe that the inauguration of the so-called woman's movement in our own generation will be considered one of the most important. For I am persuaded that this movement is destined to grow: that with its growth the highest attributes of one half of the human race are destined to be widely influenced; that this influence will profoundly react upon the other half, not only in the nursery and the drawing-room, but also in the study, the academy, the forum and the senate; that this latest yet inevitable wave of mental evolution cannot be stayed until it has changed the whole aspect of civilisation. In an essay already alluded to, Sydney Smith has remarked, though not quite correctly, that up to his time there had been no woman who had produced a single notable work, either of reason or imagination, whether in English, French, German, or Italian literature. A few weeks ago Mrs. Fawcett[৫৬] was able to show us that since then there have been at least forty women who have left a permanant mark in English literature alone. Now, this fact becomes one of great significance when we remember that it is the result of but the earliest phase of the woman's movement. For, as already indicated, this movement is now plainly of the nature of a ferment.

* * *

But while we may hope that social opinion may ever continue opposed to the woman's movement in its most extravagant forms—or to these for as which endeavour to set up an unnatural, and therefore an impossible, rivalry with men in the struggles of practical life—we may also hope that social opinion will soon become unanimous in its encouragement of the higher education of women. Of the distinctively feminine qualities of mind which are admired as such by all, ignorance is certainly not one. Therefore learning, as learning, can never tend to deteriorate those qualities. On the contrary, it can only tend to refine the already refined, to beautify the already beautiful—'when our daughters shall be as cornerstones, polished after the similitude of a palace.' It can only tend the better to equip a wife as the helpmate of her husband, and, by furthering a community of tastes, to weave another bond in the companionship of life. It can only tend the better to prepare a mother for the greatest of her duties—forming the tastes and guiding the minds of her children of a time of life when these are most pliable, and under, circumstances of influence such as can never again be reproduced.

সখিসমিতি

কি ধনশালিনী কি গৃহস্থপত্নী কি কৃতবিদ্যা কি অশিক্ষিতা কি স্বদেশীয়া কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা একপ্রাণা হইয়া রমণী-স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমবতী হইতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় ৫ বৎসর হইল সখিসমিতি নামক একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন। আর এই অন্তঃপুর-প্রথাযুক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে এইরূপ সমিতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

এইরূপ সম্মিলনে যে কেবল রুচির উৎকর্ষসাধন, ভাবের উৎকর্ষসাধন, পরিবারের প্রতি পরিবারের, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের অকারণ বিদ্বেষভাবের অপনয়নে মনের উদারতা বৃদ্ধি—সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকা বশতঃ মহিলাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ যে গুণটির অভাব দেখা যায়—প্রভৃতি সুফল হইবে এমন নহে, মহিলাজাতির স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি—যাহার জন্য মহিলাজাতির মহিলাত্ব, তাঁহাদিগের গৌরব, তাহার বিকাশ সাধনে সংসারের প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে। এখন একটী কথা উঠিয়াছে—একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মত মহৎহৃদয়া নহেন,—তাঁহাদের তেমন দয়াধর্ম্ম নাই, সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের তেমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না ইত্যাদি।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক্? ভিকারী ভিক্ষা লইতে আসিলে কি তেমনি আগ্রহভরে ইঁহারা ভিক্ষাদান করেন না? অনাহারীকে অন্নদান করিয়া কি ইঁহারা তেমনি সুখানুভব করেন না? প্রকৃতপক্ষে রমণী স্বভাব আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বে যেরূপ স্থলে দয়া-প্রকাশের আবশ্যক হইত এখন আর ঠিক সেরূপ হয় না, এইমাত্র প্রভেদ। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই, আগে রেল ছিল না, যাত্রীদিগের সদা সর্ব্বদা গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে হইত, এখন সে প্রয়োজন নাই, সুতরাং সেরূপ আতিথ্যও উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু এস্থলে তাহা বাহুল্য।*

* গত আশ্বিন-কার্ত্তিকের ভারতীতে "একাল ও একালের মেয়ে" নামক একটি সুনিপুণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেইটি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমাজের-যেমন কোন কোন অভাব দূর হইতেছে তেমনি কোন কোন অভাবের বৃদ্ধি এবং নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে। সুতরাং দানের আধারেরও পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। যেমন, একান্নবর্ত্তী প্রথা নানা কারণে ক্রমিকই এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আগে একজনের উপার্জ্জন পরিবারের অন্য দশজনে ঠিক সমভাবে উপভোগ করিত, এখন অবস্থার গুণে ঠিক আর সেরূপটি হওয়া সম্ভব নহে। বিধবাগণ আগেকার অপেক্ষা অধিক কষ্টে পড়িতেছে, কুমারীদিগের বিবাহ বহুব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে—ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে দিন দিনই অন্নকষ্ট বাড়িতেছে— কাজেই সঙ্গতিহীনার সংখ্যা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বহু অধিক, দয়াশীলা রমণীগণের করুণা-দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা। সখিসমিতি এই সদনুষ্ঠান ব্রত ধারণ করিয়াছে। সখিসমিতির উদ্দেশ্য—সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন শিক্ষাদান ও স্থল বিশেষে অর্থ সাহায্য করা,—এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে—অর্থাৎ অর্থের সুবিধা হইলে সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। ইহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি ভাল ফল হইবার কথা—সঙ্গতিহীনাগণ নিজ নিজ সম্ভ্রম রক্ষা ও পরান্নজীবিকার উপর নির্ভর না করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে,—অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্যে জীবন নির্ব্বাহের সুবিধা পাইলে পুনর্বিবাহ না করিয়াও তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন; এইরূপে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বৈধব্যাচরণের প্রতিও তাঁহাদের আস্থা জন্মিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইবে,—মিশনারী রমণীগণ আজ কাল যে কাজ করিতেছেন আমাদের দেশীয় নারীগণের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে। মিশনারী রমণীগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যেরূপ যত্নবতী সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদিগের এই শুভ-ইচ্ছা সত্ত্বেও নানাকারণে তাঁহারা অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্য যেরূপ সুচারুভাবে করিতে অক্ষম, দেশের নারীগণ সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে তাহা সাধিত হইবে। কিন্তু সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এবং তৎপূর্ব্বে অনেকগুলি রমণীকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। আপাতত ছয়টি মাত্র বালিকা সমিতির অধীনে আছে এবং একটির পাঠ সমাপন হইয়াছে, সমিতি ইচ্ছা করিলেই এখন তাহাকে এই বৈশাখ হইতে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু বালিকাদিগকে ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান করা অপেক্ষা তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করা সমধিক ব্যয়সাধ্য। তাহাদিগের পঠদ্দশায় তাহারা কোন স্কুলে থাকিতে পারে, কিম্বা যাহার তাহাতে আপত্তি আছে সে কোন ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে থাকিয়া স্কুলের গাড়ীতে স্কুলে যাতায়াত করিতে

পারে ; কিন্তু পাঠ সমাপ্তে তাহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে পুরমহিলাদিগের নিকট পাঠাইতে হইলে সেজন্য গাড়ী চাই, তাহাদিগের থাকিবার আশ্রয়বাটী চাই, আপাততঃ একজন বালিকা বলিয়া সমিতি যেন তাহার আশ্রয়ের অন্য বন্দোবস্ত করিতে পারে, কিন্তু দুই চারিজন হইলেই তাহাদের স্বতন্ত্র আবাসগৃহ এবং ভরণপোষণব্যয় বা বেতন চাই, এ সকল ছাড়া তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের রক্ষক স্বরূপ একজন সুশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা বয়স্কা রমণী চাই, অল্প বেতনে সেরূপ রমণী মিলিবার কথা নহে। এক কথায়, একটি অনাথাশ্রম হইলেই এ-কার্য্য সুসঙ্গতরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সেই আশ্রমই তাহাদের আবাস বাটী হইবে, সেইখানে আশ্রয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতে তাহারা পরোপকারকার্য্যে জীবন যাপন করিবে।

বুদ্ধির প্রবণতা অনুসারে এইখানে তাহারা শিক্ষা পাইতে পারিবে। যাহাদের লেখাপড়ার বুদ্ধি অধিক তাহাদের মধ্যে কেহ বা উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন কেহ ডাক্তারি শিখিতে পারেন ; অন্যরূপ হইলে কাহাকেও বা সেলাই কাহাকেও বা চিত্রবিদ্যা কাহাকেও বা গানবাজনা শেখান যাইতে পারে। ইহার ফল পুরমহিলারা পরে লাভ করিবেন। কিন্তু এরূপ একটি অনাথাশ্রমের জন্য অন্ততঃ মাসে ৫০০্ টাকার আবশ্যক। সমিতির সেরূপ অর্থবল কোথায় ? এতৎসঙ্গে সমিতির যে আয় ব্যয় হিসাব প্রদত্ত হইতেছে তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন—আপাতত সমিতি যে ছয়টি বালিকাকে প্রতিপালন করে, তাহার ব্যয়ভার বহন করাই তাহার আয়ের পক্ষে একটু অতিরিক্ত। সমিতির আয় বৃদ্ধি করিয়া বৎসর বৎসর অধিক সংখ্যক বালিকাকে আশ্রয় প্রদানের ইচ্ছাতেই প্রধানত সখিসমিতি হইতে শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহাতে একটি কিম্বা দুইটি বালিকার শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলান হইলেই যথেষ্ট। অবশ্য এক একটি বালিকার প্রতিপালন ও শিক্ষাভার বহন যেরূপ ব্যয় সাপেক্ষ তাহাতে ছয়টি বালিকার উপকারে সমর্থ হইয়া এই ক্ষুদ্রপ্রাণ সমিতি কম আহ্লাদিত নহে, তবে এইখানেই তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নহে। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ, কিন্তু অপরিমিত আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন ; যে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই যেমন সেখানে আশ্রয় পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দুঃখ এই, এখনো পর্য্যন্ত সমিতি তাহাতে অপারক। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। এই শিশু-সমিতির সাহায্যে আমরা যেরূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমরা দানশীল মহোদয় মহোদয়াগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের মুক্তহস্ততায় সমিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছি।

পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকা হইতে ভিক্ষা আনিয়া প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকায় বিধবাশ্রম বাটী ক্রয় করিয়াছেন, আর এ-দেশের ধনাঢ্য মহাজনগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি দেশের অনাথাদিগের সাহায্যে একটি আশ্রয়বাটী প্রদান করিয়া চিরকীর্ত্তিমান হইবেন ? আমেরিকাবাসীগণ এ দেশের বিধবাদিগের সাহায্যে রমাবাইকে মাসিক ১০০০৲ হাজার টাকা দান করেন—আর আমাদের দেশের সহৃদয়গণ দেশের অনাথাদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া কি দেশের কার্য্য করিবেন না !

দীনবৎসলা, রাণি, মহারাণি, বেগমগণ, তোমরা এই সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত হইয়া রমণী নামের মান ও রমণী হৃদয়ের মাহাত্ম্য রক্ষা কর ; আর করুণহৃদয় রাজা, মহারাজা, নবাব, জমীদারগণ ও সহৃদয় দেশবাসী নরনারীগণ, তোমাদের যাহার যেমন সাধ্য এই সৎকার্য্যে দান করিয়া হিন্দুর দানশীল নাম রক্ষা কর। আমরা তোমাদের দেশের রমণী, ভিক্ষাপাত্র লইয়া তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়াছি—রমণীর প্রতি সম্মান, রমণীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন কর, আর বিদেশীয়গণ, তোমরা বিশ্বজনীন উদারতা প্রভাবে বিদেশের প্রতি করুণা করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন কর। এই প্রার্থনা, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের এই মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করুন।

সখিসমিতির উদ্দেশ্য
ও
নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য

১। সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন।

২। যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী—সখীসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রত পালনে ইচ্ছুক, তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান ; অন্যতঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করা।

৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার।*

* তবে যদি কোন কারণে কোন বালিকা ভবিষ্যতে এ কার্য্য করিতে না চাহেন তবে তাঁহাকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা দান করিতে সমিতির যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তিনি তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। সেই অর্থে সমিতি অন্য এক বালিকার উপকারে সক্ষম হইবে।

নূতন নিয়মাবলী

১। সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই এই সমিতির সখী হইতে পারিবেন।

২। কেহ নূতন সখী হইতে চাহিলে, কোন বিশেষ কারণে অন্য সখিগণ আপত্তি না করিলেই তিনি সখীরূপে গৃহীত হইবেন।

৩। মাসিক এক টাকা করিয়া সখীদিগের চাঁদা দিতে হইবে। অধিক দান করিলে আরও ভাল। তবে মাতা এবং বালিকা-কন্যা দুইজনে সখী হইলে বালিকার ন্যূনপক্ষে বৎসরে তিন টাকা দিলেও চলিবে।

৪। অভিভাবকের অভিমত ব্যতিরেকে কোন বালিকার ভার সমিতি গ্রহণ করে না।

৫। যে পুরমহিলা সমিতিতে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে সখী না হইয়া দানের ইচ্ছায় সখী হইতে চাহেন তিনি সমিতির নিমন্ত্রণে আসিতে বাধ্য নহেন।

৬। সখীগণ লক্ষ্য রাখিবেন যেন টাকার বিল শোধ করিতে দেরী না হয়; কেননা এই চাঁদার উপরেই পালিতাগণের প্রতিপালন কার্য্য নির্ভর করিতেছে।

৭। বিদেশেই থাকুন বা কলিকাতায় থাকুন—যাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ কিম্বা শিল্পমেলায় কর্ত্তৃত্বভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদিগের দ্বারা সমিতির কর্ত্রীসভা গঠিত।

৮। কলিকাতাবাসী উৎসাহী সখীগণের মধ্যে হইতে বাছিয়া বৎসরে বৎসরে আট কিম্বা দশজনের একটি ক্ষুদ্র সভা গঠিত হয়, সমিতির বালিকাগণের সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ করা, নূতন কোন আশ্রয়প্রার্থী বালিকাকে লওয়া না লওয়া প্রভৃতি সমিতির অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ ইঁহাদের পরামর্শ দ্বারা স্থির হইয়া থাকে।

সখিসমিতি ও শিল্পমেলার কর্ত্রীসভার সখিগণ

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ,	(Mrs. M. Ghose.)
,, বরদাসুন্দরী ঘোষ,	,, L. Ghose.
,, ললিতা রায়,	,, P. L. Roy.
,, মনোমোহিনী দত্ত,	,, R. C. Dutt.
,, সৌদামিনী গুপ্তা,	,, B. L. Gupta.
,, থাকমণি মল্লিক,	,, O. C. Mullick.
,, সরলা রায়	,, P. K. Ray.
,, প্রসন্নতারা গুপ্তা	,, K. G. Gupta.

,, হিরণ্ময়ী দেবী	,, P. Mukherji.
,, সৌদামিনী দেবী	,, S.P. Ganguli.
,, বসন্তকুমারী দাস	,, G. N. Dass.
,, চন্দ্রমুখী বসু	Miss C. M. Bose.
,, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	Mrs. N. N. Dutt.
,, মৃণালিনী দেবী	,, R. Tagore.
,, বিধুমুখী রায়	,, R. N. Ray.
,, প্রসন্নময়ী দেবী	,, Bagchi.
,, সুরবালা দেবী	,, T. N. Mukharji
,, স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিকা।	,, J. Ghosal.

১২৯৫ সালের (ইং ১৮৮৮) মহিলাশিল্পমেলার দান প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার		১৫০৲
,, মহারাণী স্বর্ণময়ী, সী, আই,		১০২৫৲
,, রাণী পতিতপাবনী দেবী	নলডাঙ্গা	৫০৲
শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (Mrs. S. Tagore)	কলিকাতা	২০০৲
,, হেমাঙ্গিনী দেবী (Mrs. W. C. Bonnerji)	ঐ	১০০৲
জের		১৫২৫৲
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (Mrs. J. Ghosal)	ঐ	১০০৲
,, স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M. Ghose)	ঐ	৫০৲
,, ললিতা রায় (Mrs. P. L. Roy)	ঐ	৫০৲
,, বরদাসুন্দরী ঘোষ (Mrs. L. Ghose)	ঐ	২৫৲
,, জগৎতারিণী মিত্র (Lady Mitter)	ভবানীপুর	২৫৲
,, সরলা রায় (Mrs. P. K. Ray)	কলিকাতা	২৫৲
,, প্রসন্নতারা গুপ্ত (Mrs. K. G. Gupta)	ঐ	২৫৲
,, সৌদামিনী দেবী (Mrs. S. P. Ganguli)	ঐ	২৫৲
,, সুশীলাবালা দেবী (Mrs. D.N. Tagore)	ঐ	২৫৲
,, হিরণ্ময়ী দেবী (Mrs. P. Mukherji)	চুঁচুড়া	১০৲
মিশেস লালবিহারী দে	ঐ	১০৲
,, চন্দ্রমাধব ঘোষ	ভবানীপুর	১৬৲
শ্রীমতী কমলা বসু (Mrs. P. N. Bose)	কলিকাতা	২০৲
,, থাকমণি মল্লিক (Mrs. O.C. Mullick)	ঐ	১০৲

মিশেস এ, মিত্র	কাশ্মীর	৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (Mrs. G. Tagore)	কলিকাতা	৫৲
,, কুমুদিনী দেবী (Mrs. N. C. Mukherji)	ঐ	১০৲
,, কাদম্বিনী ঘোষ (Mrs. D. C. Ghose)	ভবানীপুর	৫৲
,, হেমন্তকুমারী দেবী (Mrs. M. N. Banerji)	কলিকাতা	৫৲
,, মোক্ষদা দেবী (Mrs. S. B. Mukherji)	ভাগলপুর	১০৲
,, কাদম্বিনী দেবী(Mrs. J. P. Ganguli)	কলিকাতা	৪৲
,, বসন্তকুমারী দাস (Mrs. G. N. Dass)	ঐ	৫৲
,, প্রসন্নময়ী দেবী (Mrs. L. C. Mukherji)	ঐ	৫৲
,, মোহিনী ঘোষ (Mrs. P. Ghose)	ঐ	২০৲
মিসেস জে, শর্ম্মা	ঐ	২৲
,, পি, কে, ঘোষ	ঐ	২৲
,, পি, সি, রায়	ঐ	৫৲
শ্রীমতী শৈলবালা রায় (Mrs. D. N. Ray)	ঐ	২৲
মিশেস কে, এন্, মিত্র	ঐ	২৲
শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু (Miss. C. M. Bose)	ঐ	৫৲
,, রাধারাণী লাহিড়ী (Miss. R. Lahiri)	ঐ	৫৲
মিশেস টী, এন্, চক্রবর্ত্তী	দার্জিলিং	২৲
		২০৪০৲

ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮

সাত বৎসরে সখিসমিতি

এই বৈশাখে সখিসমিতির সাত বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল! এই সাত বৎসরে ইহার উদ্দেশ্য কত দূর সাধিত হইয়াছে দেখা যাউক!

সখিসমিতির এক উদ্দেশ্য,—সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন। এ বিষয়ে সমিতি কিরূপ উপকার সাধিত করিয়াছে, তাহা এখনকার বর্দ্ধিতায়তন সখী সংখ্যা, কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সখী নহেন এমন কত মহিলা সমিতির শুভকল্পে ব্রতী,—বাৎসরিক শিল্পমেলায় একত্র মিলিত হইবার জন্য কত মহিলা ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে সেই মিলন উৎসবের দিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এই সকল নিদর্শন হইতে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠাদিনে, ১২৯৩ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্নে, সাতজন মহিলা মাত্র উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে দেশহিতকর ব্রত পালনে সঙ্কল্পী হইয়া পরস্পর সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আজ সখিদিগের সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। সাত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় সখিগণের অধিকাংশের মধ্যে আলাপ পরিচয়ই ছিল না, কাহারো কাহারো বা মৌখিক আলাপ ছিল মাত্র; কিন্তু সমিতির প্রসাদে তাঁহাদের অনেকেই এখন এক পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ স্বজনতুল্য। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনেকে ইহার দাতব্য কার্য্যের সহায়ক হইয়া ইহার সহিত সদ্ভাবসূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন। এইরূপে সখিসমিতি সাধারণ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে সদ্ভাব বৃদ্ধি করিবারও উপায় স্বরূপ হইয়াছে। এবং এই সূত্রে কেবল বঙ্গমহিলাগণ নহেন, ভারতীয় এবং বিদেশীয় মহৎ হৃদয় অনেক নরনারীই সমিতির ধন্যবাদার্হ। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর সমিতির শিল্পমেলায় কত সম্ভ্রান্ত মহিলার সমাগম হয়; এই মিলনে কত অপরিচিত মহিলাদিগের মধ্যে পরিচয় হইয়াছে, কত বিদ্বেষ অবসিত হইয়াছে; কত মহিলার সদনুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মিয়াছে। বঙ্গমহিলাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরোপকার কার্য্যে, দেশহিতকর কার্য্যে এরূপ একনিষ্ঠ অনুরাগ দেখাইতে পারেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা কল্পনারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সখিসমিতির সাত বৎসর স্থায়িত্বে তাহা এখন প্রকৃত প্রত্যক্ষ ঘটনা!

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কি—না, কোন সঙ্গতিহীন বিধবা বা কুমারীকে তাহার অভিভাবক সখিসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিতে ইচ্ছুক হইলে সমিতি তাহাকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রদান করিবে ; অন্যতঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিবে৭

যদিও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আমাদের আশা ও ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই তথাপি এই কয়বৎসরে সমিতি এই কল্পে দেশের যতটুকু উপকার সাধিত করিয়াছে, তাহা এই সামান্য সমিতির পক্ষে সামান্য কার্য্য নহে। চারিজন বিধবাকে সমিতি নিয়মিত মাসিক অর্থ সাহায্য করে। দুর্ভিক্ষের সময়, জলপ্লাবনের সময়, অথবা এইরূপ অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনা উপলক্ষে এবং উপযুক্ত ভিক্ষার পাত্র অর্থ ভিক্ষা চাহিলে সমিতি অনিয়মিতরূপে সাধ্যমত দান করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া এই কয়বৎসরে ছয়টি বালিকাকে সমিতি আশ্রয় দান, শিক্ষা দান করিয়াছে। একটি শিক্ষা সমাপন করিয়া এখন বেথুনস্কুলের শিক্ষয়িত্রীপদ লাভ করিয়াছে। সমিতির অর্থাভাব বশত বেতন এবং গাড়ীঘোড়া প্রভৃতির ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিয়া তাহাকে অন্তঃপুর-শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায় নাই। একটি বালিকাকে এই বৎসর হইতে সমিতির সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আর চারিটি বালিকা এখনো সমিতির আশ্রয়ে আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সমিতির মূলধন অধিক শুধে খাটান হইত ; সেই জন্য শুধে এবং সখীদিগে মাসিক চাঁদায় ছয়টি বালিকার ব্যয়ভার সঙ্কুলান হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি কোন কর্জ্জ দেওয়াস্থলে হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় সম্পাদিকাকে সে টাকা নিজে হইতে পূরণ করিয়া দিতে হয় ; সেই হইতে সমিতির সমস্ত মূলধন পোর্টট্রাষ্টে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সাড়ে আট হাজার টাকার পোর্টট্রাষ্টের মাসিক শুধ ৩৫শের অধিক নহে ; আর সখিদিগের নিকট হইতে মাসিক চাঁদাও আন্দাজ ৩৫ মাত্র উঠিয়া থাকে। কিন্তু এক একটি বালিকার খরচ মাসে প্রায় পনের, তাহা ছাড়া সমিতির পূর্ব্বোক্ত দানাদি এবং পুস্তকাদি ছাপা খরচ এবং চাঁদা আদায়ক ও হিসাব লেখকের মাহিয়ানাদিতে সমিতির ৭০ টাকার অনেক অধিক খরচ পড়ে। এই জন্য সমিতি একটি বালিকাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে ; এবং অর্থাভাবে আরো দু একটির শিক্ষা বন্ধ করিতে হইত। ইহা দেখিয়া, সমিতির একজন সখী, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ফেব্রুয়ারি মাস হইতে নিজে দুইটী বালিকার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং এই জুলাই মাস হইতে আরো একটী বালিকাকে তিনি নিজ আশ্রয়ে রাখিবেন। হিরণ্ময়ী দেবীর এই সহায়তার জন্য তিনি সমিতির বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তিনি নিজে উঁহাদের ভরণপোষণ ব্যয় না দিলে উঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান সমিতির দুঃসাধ্য হইত। তাঁহার

এইরূপ অর্থানুকূল্যে, বালিকাদিগের শিক্ষাব্যয় লাঘব হওয়াতে সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনেরও সহায়তা হইতেছে। অন্তঃপুর-শিক্ষাকার্য্যে সমিতি এখন কথঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য কি ?—সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় সমিতি সাত বৎসর ধরিয়া কয়েকজন বালিকাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন একজন শিক্ষিত হইয়া এ কার্য্যের উপযুক্ত হইল তখন উপযুক্ত অর্থাভাবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা গেল না। কিন্তু নূতন বৎসরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের বহুদিনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।—সখিসমিতির শিক্ষিতা বালিকা নহে, সমিতির একজন হিতৈষিণী সখী নিজে এই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি গান বাজনা শেলাই লেখা পড়া সকলি শিখাইতে পারেন। নিজে ইনি এল্, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। কোন বালিকাকে অন্তঃপুর শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিতে হইলে তাহাকে বেতন দিতে হইত ; কিন্তু এখন অন্তঃপুর হইতে যে বেতন পাওয়া যাইবে, তাহাতে গাড়ী ভাড়া দিয়া যদি কিছু উৎবৃত্ত থাকে তাহাও সমিতিতে যাইবে। আর যদি গাড়ী ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হয় তাহাও সমিতি দিতে সক্ষম, কেননা কয়েকটি বালিকার ব্যয় ভার এখন কমিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি অন্তঃপুরের ছাত্রী হইয়াছে। তাঁহাদের সংখ্যা আরো অধিক হইলে তখন উক্ত সখীর অধীনে পালিতাগণও ক্রমে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে ; তাহারা কেহ কেহ অল্পদিনেই এই কার্য্যের উপযোগী হইবে ; এইরূপ আশা করা যাইতেছে। উক্ত সদাশয়া সখী দুইজনের এই নিঃস্বার্থ উদারতার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং সমিতির যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী দান দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সমিতির উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। যে করুণাময় জগদীশ্বর এই সামান্য নারিগণের দ্বারা তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছেন ; তাঁহার প্রসাদে সমিতির উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হউক ; কায়মনে এই প্রার্থনা করিয়া আমরা নবীনবলে নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতী, আষাঢ় ১৩০০

বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা

বিধবার বিবাহ লইয়া আমাদের কায়স্থ সমাজে সম্প্রতি মহা আন্দোলন উপস্থিত। কি উপলক্ষ্য লইয়া এই আন্দোলন তাহা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গৃহে একটি বালবিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন কায়স্থসমাজ এ-সম্বন্ধে নীরব ছিলেন,—সমাজের মান্যগণ্য অনেকেই বরঞ্চ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজ সেই ঘরেরই একটি কুমারী কন্যার বিবাহের সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান সহসা এমন সর্ব্বনাশতৎপর উন্মত্তভাবে কেন যে জাগরিত হইয়া উঠিল—তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

পরদুঃখকাতর স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেশের লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতা অসহায়া বালবিধবার নিত্য যন্ত্রণা নিবারণ সংকল্পে শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার প্রয়াস পান—তখন কিছুদিন বঙ্গসমাজে এইরূপ শোচনীয় দৃশ্যের তাণ্ডব অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু সে আজ অনেক দিনের কথা। ইতিমধ্যে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক প্রচলিত কুরীতি অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অনেক বিষয়ে আমরা সমধিক উদার ও বিবেচক হইতে শিখিয়াছি। অন্ততঃ ইহা বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু আজ পরীক্ষাস্থলে আমাদের সে গর্ব্ব যে শতচূর্ণ হইয়া গেল! আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতি পথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বিধানে তাহার স্বার্থ-খড়গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত। অবশ্য সমাজে কোন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে তাহার শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু সেজন্য বিচারকের সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়গণ সেরূপ উদার ও উন্নত বিচারের পরিবর্ত্তে যেরূপ হৃদয়হীন দ্বন্দ্বকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের কারণ। মান্ধাতার আমল হইতে প্রচলিত যে কয়েকটি অতি পুরাতন প্রতিবাদশর

তাঁহাদের ঝুলিতে জীর্ণ হইয়া পড়িয়া ছিল সেইগুলিকে যথাসাধ্য শাণ দিয়া প্রবলবেগে শত্রুসন্ধান করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, কলির ধর্ম্মে শত্রুস্পর্শে তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড হইতে দেখিয়া অবশেষে "জাতঃপাত"-রূপ ভয়প্রদর্শন ব্রহ্মাস্ত্রে বিপক্ষ পক্ষকে সমূলে নিপাতোদ্যত হইয়াছেন।

এই বিবাহে যিনি ইঙ্গিতেও সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন—কেবল তিনি নহেন,—তাঁহার সুদূর সম্ভাবিত অজাত বংশধরটি পর্য্যন্ত উক্ত ব্রহ্মাস্ত্রের লক্ষ্যভূত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভবনাথকে "একঘরে" করিবার জন্য কিরূপ প্রলয়োদ্যোগ চলিয়াছিল সকলেই জানেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া, resolution পাশ করিয়া, সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিষেধ করিয়াও ইঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই ; শেষে শ্রাদ্ধের দিনে নিমন্ত্রিতগণের বাড়ীতে হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের এই মাত্র অপরাধ, তিনি তাঁহার উদারচরিত্রা সর্ব্বজনসম্মাননীয়া সাধ্বী পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে— বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ বিপক্ষ নির্ব্বিচারে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরোধ কীর্ত্তির ইহাই চরম দৃষ্টান্ত নহে। শুনিতে পাওয়া যায় বিবাহ ভাঙ্গাইবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ নাকি বরকর্ত্তার নিকট ধন্না দিতেও ছাড়েন নাই। নিরপরাধ অবলা বালিকার চির সুখশান্তি হরণ করিয়া কি ইঁহারা পরম পুরুষার্থ লাভ করিতেন! উপন্যাসেও এরূপ নির্য্যাতনের কথা পড়িলে যে অতিরঞ্জিত মনে হইত। আর ইহাও আজ আমাদের শিক্ষিতাভিমানী হিন্দুসমাজের পক্ষে নিন্দনীয় কার্য্য নহে! কোন ভাল কাজের জন্য এতটা যত্ন পরিশ্রম করিলে যে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল হইত। এই ত হিন্দু বিধবাদিগের জন্য হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ইঁহারা কয়জন অগ্রসর ? পশুদিগের দুঃখ কষ্টে—লোকের যে বেদনাটুকু আছে—স্ত্রীলোকের দুঃখে ইঁহাদের প্রাণ ততটুকু কাতর নহে। হায় হায়,—আর ইঁহারাই ইংরাজের জাতিগত অসমদর্শিতা ও পক্ষপাতিতা দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন!

আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগের এইরূপ শোচনীয় আচরণ দেখিয়া যখন হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে মুহ্যমান, সেই সময় হিন্দু পত্রিকার বিধবাবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া ক্ষতস্থানে যেন প্রলেপ সিঞ্চিত হইল। এ সম্বন্ধে এমন যুক্তিপূর্ণ অথচ নিরপেক্ষ প্রবন্ধ অনেকদিন পড়ি নাই। এইখানেই আর্য্য হৃদয়ের প্রকৃত উদারতা পরিব্যক্ত। প্রবন্ধটির কতক কতক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়দিগের প্রথম অস্ত্র এই যে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দুসমাজ অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে হিন্দু

পত্রিকা লিখিয়াছেন—"এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিধবাবিবাহ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। যুক্তপ্রদেশ অর্থাৎ, কাশী, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে কতিপয় উচ্চবর্ণ ব্যতীত প্রায় সকল আচমনীয় ও অনাচমনীয় বর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। কুমারীদিগের বিবাহে যেরূপ মন্ত্রাদি পঠিত হয়, উহাতে তাহা হয় না বটে, কিন্তু এইরূপ বিবাহ সমাজের অনুমোদিত। বোম্বে, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, ছোটনাগপুর, পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ কতিপয় উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের মধ্যে বিধবাবিব'হ প্রচলিত থাকায়, হিন্দুসমাজের কিছু আসে যায় নাই। তাহা হইলে, বঙ্গদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুসমাজের কি বিশেষ অনিষ্টপাত হইতে পারে, তাহা সকলেরই বিবেচ্য। অধুনা মাদ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশেও উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ হইতেছে।" বস্তুতঃ, হিন্দুসমাজ বলিতে যে কেবল বাঙ্গালী সমাজকে বুঝায় না, সেটা বোধ হয় বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন হিন্দুসমাজ যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অভাগা বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে যে কি কারণে তাহার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিবে, তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

বিপক্ষীয়গণের দ্বিতীয় অস্ত্র—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। এস্থলে শাস্ত্র অর্থে তাঁহারা কি বুঝেন তাহা আমরা জানি না, তবে আমাদের বিশ্বাস যে, কোন সমাজের সাময়িক অবস্থা ও সভ্যতা অনুসারে তদানীন্তন সমাজ রক্ষার যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই সমাজের সময়োচিত বিধি বা শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিতে চিরন্তন অপরিবর্ত্তনীয় কোনও সমাজ-বিধি বুঝায় না। আজ যে সকল রীতিকে আমরা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিতেছি, একদিন এই হিন্দুসমাজেই তাহা শাস্ত্রসম্মত ছিল। আবার আজ আমাদের মধ্যে যাহা সমাজসম্মত হইয়াছে, একদিন তাহাই শাস্ত্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ, সমুদ্র-যাত্রা, যুবতী কুমারী বা বিধবার বিবাহ একদিন এই ভারতবর্ষেই শাস্ত্রানুগত সমাজ-প্রচলিত ক্রিয়া ছিল। কিন্তু মধ্যে রীতির অভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আজ এরূপ কোন কথা শুনিবামাত্র আমরা ধর্ম্মহানি বা "জাতঃপাতের" আশঙ্কায় আরক্ত নয়নে চীৎকার করিতে ও শাস্ত্রকে সাক্ষী মানিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জাবোধ করি না। বিধবাবিবাহ যে একদিন ভারতে শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় বিপক্ষীয়দিগের কেহই অস্বীকার করিতে অগ্রসর হইবেন না। তবে আজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পথে পথে এ চীৎকার কেন? বস্তুতঃ, নিজেদের নিত্যজীবনে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাময়িক আত্মসুখের জন্য সনাতন

শাস্ত্র বেচারার দৈনিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না, অনাথিনী বালবিধবার বিবাহ প্রস্তাব শুনিলেই যখন তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রক্তচক্ষু হইয়া চীৎকার করিতে থাকেন, তখন আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তাঁহাদের তৃতীয় অস্ত্র এই যে—শাস্ত্রসম্মত হউক আর না হউক, বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া কল্যাণকর কি না ? কথাটা বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের অবস্থার বিষয় একটু পরিচয় লওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে হিন্দু পত্রিকা লিখিতেছেন—"সমগ্র পৃথিবীতে তিন শত কোটি মানব বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ত্রিশ কোটি, তাহাঁর মধ্যে শিখ, বৌদ্ধ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দুর সংখ্যা বাদ দিলে, অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি যে কতিপয় উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত তাহাদের সংখ্যা অত্যল্প। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, য়িহুদি, পারসিক প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়।" এতগুলি বিভিন্ন সমাজের পক্ষে যাহা ক্ষতিকর হয় নাই, নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের মধ্যেও যাহা ক্ষতিকর হয় নাই, বঙ্গের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত হইলেই যে তাহা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, এ কথার কোনও অর্থ নাই। আর তাহা ছাড়া দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলেই যে বিধবামাত্রেই বিবাহের জন্য অগ্রসর হইবেন তাহাও নহে। হিন্দু পত্রিকা ইহা উদাহরণদ্বারা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। "যে সমস্ত সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিধবারাই যে পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাহা নহে। কন্যা বিধবা হইলেই যে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, এমন নহে। সকল সমাজেই বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নানাবিধ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বালিকাদিগের বিবাহ হয়, অন্যান্য দেশে তাহা হয় না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে যেরূপ গ্লানি হয়, অন্য দেশে তাহা হয় না। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক চিরজীবন অনূঢ়াও থাকিয়া যান, এবং অনেক বিধবারও বিবাহ হয়। তবে ইহা দেখা যায় যে যাঁহারা বয়স্থা কিম্বা যাঁহাদিগের সন্তানাদি থাকে, কিম্বা যাঁহারা অত্যন্ত উচ্চপদস্থা কিম্বা যাঁহারা পূর্ব্ব পতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা তাঁহারা পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করেন না।*** কেবল আমাদের মধ্যে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে যে অধিকার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অধিকারটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই আছে।"

"যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দোহাই দেন, তাঁহাদের মতে যেন ব্রহ্মচর্য্য কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই, আর পুরুষের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা। পুরুষ দশবার স্ত্রী মরিলে দশবারই বিবাহ করিতে পারিবে, সন্তান থাকিলেও পারিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকে একবার স্বামী মরিলে বিবাহ করিতে পারিবে না, সন্তান না থাকিলেও পারিবে না। এরূপ বিধান ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতিপালন করা কঠিন। (নানাপ্রকার গুপ্তপাপ) হইতে বিধবা-বিবাহ কি নিন্দনীয় ?" উপসংহারে হিন্দু-পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রতি ছত্রে ছত্রে এরূপ সতেজ সত্য ও সহজ জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার কথাগুলি আমাদের অন্তরের কথার সহিত এতই একভাবাপন্ন যে আমরা তাঁহারই কথায় এ প্রবন্ধের শেষ করিলাম।

"আমাদের মতে বর্ত্তমানে বিধবা-বিবাহে সমাজের কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিম্বা খুব প্রশংসার কার্য্য বলিয়াও ঘোষণা করা উচিত নয়। অল্প বয়স্ক কন্যাদিগের বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। উহা হইলে সমাজ অনেক কষ্টকর দৃশ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবে। বয়স্থা বিধবারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য, আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। এবং তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেই ইচ্ছুক হন তাহাতেও বাধা দেওয়া উচিত নহে। শত শত বিধবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই সমান হইতে পারে না। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অধিকারের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষ যেরূপ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ। সমাজে তাহার ব্যবস্থা না করিলে সমাজ সুন্দরভাবে চলিতে পারে না। পুরুষের চক্ষে যেরূপ এক পত্নী গ্রহণ উচ্চাধিকারের কথা, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষেও এক পতি গ্রহণ উচ্চাধিকারের কথা। পুরুষের চক্ষে যেরূপ কেবল উচ্চাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে নিম্ন অধিকারীদিগের নানারূপ পাপে পতিত হইতে হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তদ্রূপ। (বিশেষতঃ, আমাদের দেশের ভদ্র স্ত্রীলোকগণের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ নাই, বিবাহই এখানে ভদ্র স্ত্রীলোকের জীবিকা। সেই জন্য এদেশে বিধবাদিগের কষ্ট এত অধিক।) এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া যাঁহারা স্বীয় আত্মীয়দিগের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া, তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন, তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা উচিত নহে। যে গৃহে স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার আছে জানিয়াও আমরা স্বচ্ছন্দে সেই গৃহে পান-ভোজন করিয়া থাকি, তখন কেহ স্বীয় বিধবাকন্যার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সমাজের চিন্তা করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য চিরদিনই হিন্দু গৃহে আদর্শ থাকিবে। কিন্তু যাহারা এই উচ্চ আদর্শ পালন না করিয়া কোন মধ্যম পন্থা

অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে, সমাজে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।"

ভারতী, ভাদ্র ১৩১৬

কান্‌হোজি আঙ্গ্রে

আলিবাগের প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রধান কৌতূহল, তাহার সমুদ্রবর্ত্তী সুদূরপ্রসারিত, প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ দুর্গনিকেতন। ভাঁটায় শুভ্র স্থির দিগন্তব্যাপী বালুকাবক্ষে বিরাজিত থাকিয়া, জোয়ারে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত ভীমগর্জ্জিত সফেন সমুদ্রতরঙ্গে বেষ্টিত আহত প্রতিহত হইয়া, সমান সগর্ব্বে চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক মহিমাকে খর্ব্ব করিতে করিতে নীরব সমুন্নত মস্তকে মনুষ্যবুদ্ধির জয়ঘোষণায় দর্শকের বিস্ময়দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করে।

ভাঁটার সময় পদব্রজে দুর্গ গমন করা যায়। সীমান্তে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার, চতুষ্পার্শ্বের পরিখা যেন বজ্রগ্রথিত, এতকালের অনিবার তরঙ্গাঘাতে কোন স্থানের একখানি ইট এ-পর্য্যন্ত খসিয়া পড়ে নাই, দেখিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। ভিতরে দেড় মাইল দু মাইল স্থান লইয়া রাজধানী। রাজারাণীর প্রাসাদ, মন্ত্রীভবন, সৈন্যাবাস, অস্ত্রাগার, দেবদেবীর মন্দির, দীপাবলীস্তম্ভ, বন্দীখানা, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সকলই যদিও এখন হতশ্রী, কিন্তু পুরাতন সমৃদ্ধিজ্ঞাপক। প্রাসাদাবলী প্রায় ভগ্নমান, কেবল পার্ব্বতীমন্দির, দীপাবলীস্তম্ভ এবং রাণীদিগের পুষ্করিণীর সুদীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টন এখনও অক্ষত দণ্ডায়মান। দুর্গের স্থানে স্থানে নানারূপ দেবদেবীর স্থাপনা, কিন্তু পার্ব্বতীমন্দিরই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবনিকেতন। কেবল দেবীই স্বয়ং নহেন, তাঁহার সমস্ত পরিবার ইহার মধ্যে বিরাজিত। মহাদেব, পার্ব্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকলেরই সুরম্য শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি। ইংরাজ দেশীয় সবারই এখানে সমান প্রবেশাধিকার—কারণ ইংরাজই এখন দুর্গাধিপতি। মন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারি নাই। গভর্ণমেন্টের গুরুজাতীয় একজন বৃদ্ধ দুর্গরক্ষক ধীবর প্রতিসন্ধ্যায় ঘন্টা বাজাইয়া দীপ জ্বালাইয়া একবার করিয়া মন্দিরে আরতি প্রদান করে ; যে কেহ একটি-আধটি পয়সা দিলেই আরতি দেখিতে পায়। বৃদ্ধবর এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু ; এই পুরাতন ভগ্নশ্রী দুর্গের সহিত তাহার ঐকান্তিক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময়ের বহুজনাকীর্ণ মহাপ্রভাবশালী দুর্গ এখন সমাধিস্থানের ন্যায় পরিত্যক্ত। একদিকের ভগ্ন প্রাসাদ দুই একজন ধীবরের মাত্র বাসস্থান। যখন

তাহারা কাজে যায় তখন এস্থান একেবারে শূন্য পড়িয়া থাকে। দুর্গপ্রাকারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের একটি তোপ আছে, জাহাজকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কখনো কখনো ইহা ধ্বনিত হয় মাত্র। দুর্গসন্নিহিত প্রস্তররাশিপূর্ণ দু একটি স্থান অতি ভয়াবহ ; দুই একখানি জাহাজ অতি অল্পদিন মাত্র এখানে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে ; এখনো তাহার ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড ভাঁটার সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ দুর্গ কতদিন নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ ইহা পর্ত্তুগীজ আমলের। কিন্তু ইহার প্রধান ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য,—এই দুর্গে বসিয়া খুব বেশীদিন নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্‌হোজি আঙ্গ্রে তাঁহার প্রবল প্রতাপে জলস্থল সুরাসুর সমভাবে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিবাজির নাম আর্য্যাবর্ত্তে পর্য্যন্ত বিখ্যাত, কেননা তিনি এদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহার বর্গী অর্থাৎ অশ্বারোহী সেনার প্রভাব-গীতিতে আজও বঙ্গশিশু নিদ্রাকৃষ্ট* ; কান্‌হোজির কার্য্যক্ষেত্র দক্ষিণপথেই প্রসারিত বলিয়া বিদেশে তাঁহার ততদূর খ্যাতি নাই। কিন্তু দক্ষিণপথে ইহাঁর প্রভাব শিবাজি অপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রদেশে ইনি শিবাজির পরবর্ত্তী এবং শেষ মহাশূর। ইহাঁর দমনে ইংরাজ পর্ত্তুগীজ হিন্দু মুসলমান রাজগণ একত্র বদ্ধপরিকর হইয়াও ইহাঁকে দমন করিতে পারেন নাই,—ইনি অবশেষে স্বপ্রভাবে পেশোয়াকে বাধ্য করিয়া তাঁহার কোলাবা অঞ্চলের অধিকারে রাজসম্মতি আদায় করিয়া লয়েন।

ইংরাজ ইহাঁকে রাজা না বলিয়া দস্যু বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি দস্যুতা করিয়াই রাজ উপাধি রাজদণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান রাজা তাহা করেন নাই ?

শিবাজি-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ন্যায় ইহাঁর রাজ্যও অধিক দিন ইহাঁর বংশধরগণের ভোগে আসে নাই। দুই তিন পুরুষের পরই রাণীদিগের মধ্যে পোষ্যপুত্র লইয়া বিবাদ বাধায় গভর্ণমেন্ট এ রাজ্য খাসভুক্ত করিয়া লইয়া আঙ্গ্রে পরিবারবর্গকে মাসহারার বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আঙ্গ্রে উপাধিধারীর জমীদারী সম্পত্তি যাহা আছে তাহাও সামান্য। সম্পত্তি ক্ষমতা সমস্তই এখন তাহার হস্তান্তরিত, কেবল শূন্যগর্ভ রাজনামমাত্র তথাপি অবশিষ্ট।

আমি কান্‌হোজি আঙ্গ্রের জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার বংশধরের মুখে শুনিবার জন্য রাজভবনে গিয়াছিলাম। এখনকার আঙ্গ্রেরাজ অল্পবয়স্ক যুবক, দেখিতে

* মহারাষ্ট্র ভাষায় একরূপ অশ্বারোহী সৈন্যদল বর্গী নামে অভিহিত

সুশ্রী, বেশভূষা আরো সুশ্রী; কিন্তু ইহাঁর মাতা ও পত্নীর রাণীজনোচিত চেহারাও নহে, সাজসজ্জাও নহে। রাজা ও দেওয়ান আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত বাড়ীঘর দেখাইয়া বেড়াইলেন। পুরাতন রাজপ্রাসাদ হীরাকোট এখন গভর্ণমেন্ট অফিস; ইহা নব প্রাসাদ, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মাত্র নির্ম্মিত। প্রাসাদের অসাধারণত্ব ইহাতে কিছুই নাই, সাধারণ ধনাঢ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ ধরণের বাটী হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ। বৈঠকখানার দেওয়ালে পূর্ব্বতন কয়েকজন আঙ্গ্রের ছবি রহিয়াছে, কিন্তু কান্‌হোজির ছবি তন্মধ্যে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কথা ইহাঁদের নিকট কিছু শোনা দূরে থাক, ইংরাজ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে খোঁজ তল্লাস করিয়া ইহাঁর ইতিহাস যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, আঙ্গ্রে নামধারী যিনি তিনি ততটুকুও এখন সবিস্তার জ্ঞাত নহেন। দেওয়ান বরঞ্চ ইহাঁর অপেক্ষা অধিক খবর রাখেন। আসল কথা, ইনি নিতান্ত সামান্য লোকের সন্তান, মৃতরাণীর পোষ্যপুত্র বলিয়া দাবী করিয়া একেবারে হঠাৎ নবাব হইয়া পড়িয়াছেন। এখন রাজকন্যা এ দাবী মিথ্যা বলিয়া গভর্ণমেন্টে মকদ্দমা আনিয়াছেন; রাজ-সিংহাসন টলমল।

গেজেটিয়ারে কান্‌হোজির জন্মবৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যায় তাহা ঔপন্যাসিক রসপূর্ণ। ইহাঁর পিতার নাম নাকি তুকাজি সাংখ্যপাল। সন্দেহ প্রকাশ করিলাম এই জন্য এ সম্বন্ধে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে মতভেদ; গোড়াতেই গলদ। গ্রান্ট ডফ বলেন, ইনি কান্‌হোজির পিতা। কিন্তু মিষ্টার গ্রোস একজন বম্বে সিভিলিয়ন; ইনি বলেন পিতা নহেন, পিতামহ। পিতাই হউন আর পিতামহই হউন, সাংখ্যপাল যে পারস্য উপসাগরের কূলবর্ত্তী হর্ম্মূজ সহরের একজন মুসলমান, ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ আগমন কালে চিউলের নিকট সমুদ্রে ইহাঁর জাহাজ ডুবি হয়, এবং ভাগ্যক্রমে ইনি প্রাণ রক্ষা পাইয়া শিবাজির পিতা শাহাজির অধীনে সেনানায়কতা গ্রহণ করিয়া ক্রমে আপন শৌর্য্য বীর্য্যে বড়লোক হইয়া উঠেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ভেদ নাই। কিন্তু আঙ্গ্রে বংশ আবার এ-কথায় খুব খাপ্পা; বংশের যিনি প্রধান তাঁহার যবন রক্ত ইহাঁদের সম্পূর্ণ অননুমোদনীয়। তাঁহারা বলেন নামেতেই ইহার হিন্দুত্বের পরিচয়, অন্যকথা নিরর্থক-শূন্যগর্ভ অপবাদ। এতদূর আবার অন্যে মানিবে কেন? কেবল জনশ্রুতি ছাড়া গ্রোস উক্ত কথার অন্য কোন প্রমাণ পাইয়াছেন কিনা তাহা তিনি যদিও বলেন নাই, তবে সব দিক দেখিয়া মনে হয়, একজন অজ্ঞাতনামা মুসলমানের হিন্দুরাজ্যে আসিয়া হিন্দুর প্রিয় হইয়া হিন্দুনাম গ্রহণ কিছুই আশ্চর্য্য নহে, এবং মারাট্টা জাতিরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত এমনই কুলগৌরব বা জাতিবন্ধনও দৃঢ় নহে, যে বিশেষ কারণে এরূপ কোন মুসলমানকে তাঁহারা হিন্দুনামে নিজদলভুক্ত করিতে না পারেন। আজিও ইহার

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। অপেক্ষাকৃত জাতিমর্য্যাদা-বিশিষ্ট জাম নগরাধিপতির মুসলমানী গর্ভজাত এক পুত্রই যুবরাজ মনোনীত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এ সকল বাকবিতণ্ডার মধ্যে না গিয়া আসল কথা এই ; তুকাজি সাংখ্যপাল একজন অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য ব্যক্তি ; শিবাজির পিতা শাহাজির সৈনিক। শাহাজি দাক্ষিণাত্য সুলতানের সেনাপতিরূপে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় তুকাজির বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উচ্চপদে উন্নীত এবং স্বজাতীয় উচ্চবংশীয়া কন্যাদান করিয়া ধনেমানে পদমর্য্যাদায় স্বদলভুক্ত করিয়া লয়েন। কান্‌হোজি এই বিবাহের ফল ; এবং রত্নগিরির সন্নিহিত অঙ্গারবতী গ্রামে গ্রাম্যদেবী অঙ্গারবতীর প্রসাদ ধারণে জন্ম বলিয়া ইহাঁর অন্য নাম আঙ্গ্রে।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কান্‌হোজি শিবাজির কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের যুদ্ধজাহাজে দ্বিতীয় সেনাপতির পদে বরিত হন। ইহাঁর ভাগ্যক্রমে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জাহাজের প্রধান সেনাপতি সিতোজি গুজরের মৃত্যু হইল। ইনি তাহার পদে উন্নীত হইয়া স্বপ্রভাব বিস্তারের পরিপূর্ণ অবসর পাইলেন। তখন হইতে ত্রিবাঙ্কুর হইতে বম্বের পথে জলে নানাজাতির জাহাজ, এবং স্থলে অরক্ষিত সহর সকল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া জনগণের যুগপৎ ভয় ও সম্মানের কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন। আলিবাগের এই দুর্গ এবং রত্নগিরি-সন্নিহিত সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গই প্রধানতঃ তাঁহার গৌরব নিকেতন।

ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষ কখনই অম্লানবদনে এক সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলে নাই। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্ব স্ব প্রধান রাজাদিগকে দমন করিতে চিরদিনই সম্রাট, সুলতান, মহারাজাদিগের সমান কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমাদের মধ্যে চিরদিনই যে বিদেশীয় ক্ষমতা এত দৃঢ়মূল সঞ্চারে সক্ষম হইয়াছে উক্তরূপ গৃহবিচ্ছেদই তাহার প্রধান কারণ। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন দক্ষিণাপথ একদিকে অন্তর্ব্বিবাদে, অন্যদিকে মোগল নিষ্পীড়নে নিষ্পীড়িত।

ইংরাজ ক্ষুদ্র বোম্বাই সহরটুকু মাত্র দখল করিয়া বসিয়া ; পর্তুগীজ হীনবীর্য্য ; দাক্ষিণাত্য সুলতানও নামে মাত্র সুলতান ; শিবাজি প্রতিষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিও শিথিলমূল, রাজমন্ত্রী অর্থাৎ পেশোয়াই আসল রাজা, শিবাজির বংশ তাঁহার হস্তমুষ্টিতে চালিত ; অন্যদিকে জিঞ্জিরার সিদ্দি নবাববংশ, এবং কান্‌হোজি আঙ্গ্রে প্রভৃতি অনেকেই স্ব স্ব প্রধান ; সর্ব্বোপরি মোগল সম্রাট আরংজীবের দৌরাত্ম্যে সমস্ত রাজ্য ছারখার। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সিদ্দিগণ মোগলের পক্ষ লইয়া মরাট্টাদিগকে অর্থাৎ শিবাজি-বংশীয়দিগকে হারাইয়া রাজপুরী ও রায়গড় দখল করিয়া লইল। রায়গড় শিবাজি-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী, এইখানেই

তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ওরঞ্জিব পুরস্কার স্বরূপ সিদ্ধিদিগকে—রায়গড়ের অধিকার প্রদান করিলেন। কিন্তু আঙ্গ্রে সমুদ্রযুদ্ধে সিদ্ধিদিগকে,—কেবল সিদ্ধি নহে, পর্ত্তুগীজগণকেও ভয়ানক হারাইয়া দিলেন, সিদ্ধি পর্ত্তুগীজ ও মোগল এই তিন বল একত্র হইয়া কান্‌হোজির বিরুদ্ধে সংগ্রামপর হইলেন। কিন্তু কান্‌হোজি এই সমগ্র শক্তিকে হারাইয়া চতুষ্পার্শ্বের দেশাধিকার করিয়া সাগরগড় দখল করিলেন।—শত্রুগণ তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইয়া এই মর্ম্মে সন্ধি করিল ; কোলাবা খানদেরি ও সাগরগড়ের আয় দুইভাগ হইয়া একভাগ কান্‌হোজির ও একভাগ মোগলের হইবে ; রাজকোট ও চিউল সহরের সমস্ত আয় তাঁহার একার, কিন্তু চিউল প্রদেশের আয়ে মোগলে-তাঁহাতে সমভাগ, আর আলিবাগ-সন্নিহিত পার্ব্বত্য প্রদেশের আয়ে মাত্র কেবল সিদ্ধিদের অধিকার।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে জলপথের শিবাজি কান্‌হোজি বম্বে ও ম্যালাবার উপকূলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে জল-বাণিজ্যের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজের যুদ্ধ পোত নির্ম্মিত হইল ; এতদিন পরের জাহাজের সেনাপতি নামে নিজের অদৃষ্ট রচনা করিতেছিলেন ; এখন প্রকৃত প্রস্তাবে স্বপ্রধান রূপে দিগ্বিজয়পরায়ণ হইলেন। শিবাজির বংশধরদিগের মধ্যে এ সময়ে খুব বিবাদ। শিবাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজি মোগল সম্রাটের হস্তে নিহত—তাঁহার পুত্র সাহু রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ; কিন্তু তারাবাই, রাজারামের বিধবা স্ত্রী নিজ পুত্রকে রাজা ঘোষণা করিয়া সাহুর বিরুদ্ধে সংগ্রামপরায়ণ হইয়া বম্বে হইতে শাবন্তবতী পর্য্যন্ত কান্‌হোজির অধীনে প্রদান করিলেন।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বাহিরপন্ত পিঙ্গল সাহুর সেনাপতিরূপে বহির্গত হইয়া কোঙ্কন রক্ষা পূর্ব্বক আঙ্গ্রের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনই কান্‌হোজির পক্ষ, যুদ্ধে পেশোয়াকে বন্দী করিয়া কান্‌হোজি পুনার লৌগড় এবং রাজমাচী অধিকার করিয়া সাতারাভিমুখে গমন করিলেন। বালাজি বিশ্বনাথ তখন কান্‌হোজির দমনে আসিয়া কান্‌হোজির প্রবল প্রতাপ ও যুদ্ধ কৌশলে ভীত হইয়া অবশেষে এই সূত্রে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন ; কান্‌হোজি পেশোয়াকে মুক্তি দিন, রাজারামের পুত্রের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া সাহুর পক্ষ অবলম্বন করুন ; এবং কেবল রাজমাচী রাখিয়া অন্য সকল স্থান ছাড়িয়া দিন, তাহা হইলে দশ দুর্গ, ষোলটা জমীদারী, সমস্ত কোঙ্কন এবং দক্ষিণে দেবগড় হইতে উত্তরে খানদেরী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তাঁহাকে দেওয়া হইবে এবং সেই সঙ্গে বিজারৎমল্ল উপাধির সহিত মহারাষ্ট্র যুদ্ধ-পোতের সেনাপতিও তিনি হইবেন।

এইরূপে নিতান্তই গায়ের জোরে কান্‌হোজি রাজ্য এবং রাজ্যলাভে

রাজসম্মতি অধিকার করিয়া লয়েন। শ্রীবর্দ্ধন প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ ইতিপূর্ব্বে সিদ্ধি নবাবদিগের ছিল, পেশোয়া তাহা আঙ্গ্রেকে প্রদান করায় সিদ্ধিগণ কান্‌হোজির চিরশত্রুতা পণ করিল ; কিন্তু স্বয়ং পেশোয়া পর্য্যন্ত এখন আঙ্গ্রের পক্ষ, সুতরাং এই ঈর্ষাবিষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

উক্তরূপ অধিকার লাভে আঙ্গ্রের প্রভাব প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হইল, তিনি এখন হইতে একজন স্বাধীন রাজা দাঁড়াইলেন। রত্নগিরি-সন্নিহিত প্রবল বিজয়-দুর্গ তাঁহার জলপোত নিকেতন করিয়া বম্বে হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূল তিনি স্বমুষ্টিগত করিয়া রাখিলেন। ইহার মধ্যে এমন কোন নদীমুখ সমুদ্রমুখ বা বন্দর ছিল না—যেখানে তাঁহার নৌকা বা সেনাদল থাকিত না। তাঁহার সেনাদিগের দৌরাত্ম্যে এ সমস্ত স্থানে অন্যের জাহাজ প্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ক্ষমতা প্রায় নির্ব্বাপিত—মোগল অধিকারও এখান হইতে একরূপ অস্তমান, এ-সময় কান্‌হোজি আঙ্গ্রেই এ-অঞ্চলের সর্ব্বেসর্ব্বা। লাভের আশায় ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, আরব, কাফ্রি প্রভৃতি নানা দেশীয় নানা জাতীয় অসমসাহসিক এবং ভীম প্রকৃতির লোক তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইতে লাগিল।

কান্‌হোজির যুদ্ধপোত ইয়োরোপীয় রণতরীর তুলনায় অতি সামান্যবল। ইহা ৪০/৫০ খানি ছোট এবং ৮/১০ খানি সুবিশাল নৌকার মাত্র সমষ্টি। বড় নৌকার চওড়া দিকে ছয় ও নয় পাউণ্ডার কামান এবং আসল ডেকে গর্ত্তের মধ্যে দুই, নয় ও বার পাউণ্ডার কামান সাজান থাকিত। ছোট নৌকায় কেবল বন্দুকরাশি, কখনও কখনও দুই একখানিতে দুই হইতে চার পাউণ্ডারের কামানও থাকিত। নৌকাগুলি ৪০/৫০ দাঁড়ে চলিত।

এইরূপ স্বল্পাস্ত্রসজ্জিত এবং অশিক্ষিত সেনাদলপূর্ণ আট দশখানি বড় এবং ৪০/৫০ খানি ছোট নৌকার প্রভাব মহাবলধারী ব্রিটিশ রণপোতের পক্ষেও অসহ্য হইয়া উঠিল। কান্‌হোজির যুদ্ধকৌশলও যে খুব অসাধারণ ছিল এমনও নহে। কোন জাহাজকে দূরে দেখিবামাত্র সুবাতাস থাকিলে পালে নৌকা তদভিমুখে ভাসাইতেন, বাতাস প্রতিকূল হইলে ছোট নৌকা দ্বারা বড় নৌকা টানাইয়া লইয়া যাইতেন। নৌকাসমূহ লক্ষিত জাহাজের নিকটে পৌঁছিবামাত্র সেনাদল বন্দুক ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে জাহাজ ঘেরিয়া ফেলিত, যদি সহজে জাহাজ আত্মসমর্পণ করিত, ত ভালই, নহিলে যুদ্ধ চলিত। এইরূপে প্রধানতঃ অসমসাহস বলেই তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে কান্‌হোজি ব্রিটিশ জলপোত সাক্‌সন অধিকার এবং ইংরাজের বিজয় দুর্গ আক্রমণ বিফল করেন। পরাজিত হইয়া ইংরাজেরা পুনরায় ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে কান্‌হোজিকে খান্‌দেরী দুর্গের যুদ্ধে পরাস্ত মানাইবার প্রয়াসে নিজেরা ভয়ানক

হটিয়া আসেন। কান্‌হোজির নামে দেশের লোকের এমন আতঙ্ক যে ইংরাজ বহু লোভ প্রদর্শন করিয়াও নাকি মোট ৪০টি নূতন সৈন্য তৎবিরুদ্ধে স্বদলভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ জয়লাভে সাহসী হইয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার কান্‌হোজি আর একখানি ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত অধিকার করিয়া বিজয় দুর্গের বন্দরে লইয়া যান। ইহাতে প্রমাদ গণিয়া ইংরাজ পর্তুগীজ একত্র হইয়া আবার বিজয় দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু কেবল ১৬ খানি নৌকা নষ্ট করা ছাড়া এবারে তাঁহার আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

কান্‌হোজি বিজয়লাভ করিয়া গভর্ণরকে যে পত্রোত্তর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার স্বভাবের গর্ব্ব ও সাহস উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান। কেবল তাহাই নহে, পত্রখানি যেমন স্পর্দ্ধাপূর্ণ, তেমনি কৌতুকজনক। অনুবাদে ইহার তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ সরস স্পর্দ্ধা পূর্ণমাত্রায় যদি প্রকাশিত না হয় তাই ইচ্ছা ছিল মূল পত্রখানি আমরা এই সঙ্গে উদ্ধৃত করি। কিন্তু স্থানাভাবে অবশেষে কেবল অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াই পাঠকের কৌতূহল নিবারণে বাধ্য হইলাম।

"আমি মহামান্য মহোদয়ের পত্র পাইয়াছি এবং যাহা লিখিয়াছেন সমস্তই বুঝিয়াছি। 'এ পর্য্যন্ত দেশে বিবাদ অশান্তি যাহা চলিতেছে তাহার কারণ যে একমাত্র আমি ; অন্যের ধনে লোভ যে নিতান্ত যুক্তি বহির্ভূত ; এ রকম যুদ্ধ যে একরূপ জলদস্যুতা ; এ প্রকার কার্য্য যে বেশীদিন চলিতে পারে না ; আমি যদি প্রথম হইতে ব্যবসায় কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতাম, বণিকদিগকে সাহায্য করিতাম, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসাদে আমার রাজ্য বন্দর যে কতকাংশে সুরাট বন্দরের অনুরূপ হইতে পারিত আর আমিও তদ্দ্বারা যশস্বী হইতাম—যে সকল মহাশয় বলেন, একমাত্র সৎ বাণিজ্য ছাড়া হইবার নহে ; যুদ্ধে অনিপুণ ব্যক্তিকে অবশেষে কষ্টে পড়িতেই হয়—এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধেচ্ছাতেই মাত্র যুদ্ধ করে, কোন না কোন সময়ে তাহার অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী, অতএব ইহা বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেই আমার পক্ষে ছিল ভাল, তাহাতেই আসলে আমার লাভ হইতে পারিত।'

মহামান্য মহোদয় আরো বলেন—'আপনি আমার রাজনীতি কৌশলের সহিত প্রথম হইতে পরিচিত,—সেই কারণে যতক্ষণ আমি আপনার স্বদেশীয় বন্দীদিগকে না মুক্তি প্রদান করি ততক্ষণ আপনি আমার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইবেন না—মুক্তিপ্রদানের পর আপনি আমার প্রস্তাব শুনিবেন, তাহাও যদি সখ্যতা-মূলক এবং আপনার সুবিধাজনক বিবেচিত হয়।'

এ সকলের আমি খুব প্রশংসা করি,—বিশেষতঃ, অতীত বিবাদ অশান্তির কারণ যে আমাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট। তবে ইহা কতদূর সত্য, তাহা আপনি উভয় পক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শীঘ্রই

বুঝিতে পারিবেন।

অন্যের ধনে লোভ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, বণিকদিগকেও আমি এরূপ লোভবর্জ্জিত দেখিতে পাই না। কারণ ইহাই পৃথিবীর নিয়ম, ঈশ্বর আমাদিগকে ঠিক তাঁহার নিকট হইতে কিছু প্রদান করেন না—একজনের নিকট হইতে লইয়া অন্যকে দান করেন মাত্র। ইহা ন্যায় কি অন্যায় তাহা কে বলিতে পারে? আমার রাজ্য জবরদস্তি, যুদ্ধ, দস্যুতায় চালিত, একথা বণিকদিগের মুখে শোভা পায় না।

মহারাজা শিবাজি চতুরাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজ্য স্থাপন এবং ক্ষমতা বিস্তার করেন। আমাদের ক্ষমতার মূল পত্তন ইহাই। এই উপায়ে রাজ্য স্থায়ী হয় কিনা মহাশয় তাহা বিলক্ষণ জানেন,—আপনার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণরগণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীর কিছুই যে স্থায়ী নহে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত, সংসারের নিয়মই এই,—মহামান্য মহোদয়ও যদি এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়া সেইরূপ কাজ করেন ত ভাল হয়।

মহাশয় বলিয়াছেন, আমি যদি প্রজামঙ্গল দেখি, বাণিজ্যে সহায়তা করি, তাহা হইলে আমার ক্ষমতা ঢের বাড়িবে, আমার বন্দর সুরাট বন্দরের মত সমৃদ্ধিশালী হইবে। কিন্তু মহাশয় ইহা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, যে সকল বণিকেরা এ দেশের নিয়মানুসারে বাণিজ্য করে, কখনই আমি তাহাদের সহায়তায় কুণ্ঠিত হই নাই, কিম্বা যাহারা সে নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানেও বিমুখ হই নাই। ক্ষমতার বৃদ্ধি ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। মানুষের বুদ্ধিকৌশল এখানে নিরস্ত। এ পর্য্যন্ত আমি আমার প্রভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছি, চিরদিন সমভাবে রক্ষা করিতে পারিব কি না কে বলিতে পারে— ভগাবানের কৃপার উপর তাহা নির্ভর।

মহাশয় বলিয়াছেন—'যেখানে অস্ত্রব্যবহার প্রকৃতরূপে জ্ঞাত নহে সেখানে ইহার ব্যবহার অতীব প্রাণসংহারক।' কিন্তু মহামান্য গভর্ণর মহোদয় চার্লস বুনের শাসনকালেও যে উভয় পক্ষের প্রাণ ক্ষতি হয় নাই, একথা কেহ বলিতে পারেন না। কেননা জয় পরাজয় ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন—সেই জন্য মহাজনেরা এ ক্ষতির প্রতি বেশী দৃষ্টি না রাখিয়াই কাজ করেন।

মহাশয় বলেন,—যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধস্পৃহাতেই যুদ্ধ করে তাহাকে কোন না কোন সময় সে জন্য অনুতাপ করিতেই হয়। আমার মনে হয়—মহাশয় নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিয়াছেন—কেননা আমরা সব সময় জয়ীও হই নাই, পরাজিতও হই নাই।

মহামান্য মহোদয় বলিয়াছেন—আমার রাজনীতি কৌশল আপনি উত্তমরূপে অবগত বলিয়া আপনার স্বদেশীয় বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদানের পূর্ব্বে আপনি

আমার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইতে পারেন না। আপনি যে আমার শাসননীতি অবগত তাহা আমি বেশ জানি—সেই জন্য আপনার কথায় আশ্চর্য্য হইলাম না। কিন্তু আপনি যদি উক্ত কথা বলেন তাহা হইলে আমিও সেইরূপ বলিব যে, আমার লোক আপনার নিকট যখন বন্দী তখন তাহাদিগকে মুক্তি না দিলে কিরূপে আমিও আপনার স্বদেশীয়দিগকে মুক্তি দিতে পারি।

আমাদিগের বর্ত্তমান বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া শান্তিস্থাপন এবং আপনার স্বদেশীয়গণের মুক্তিদান প্রস্তাবই যদি আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমিও সরলভাবে জানাইতেছি যে, আমারও অভিপ্রায় তাহাই। সেই জন্য এখন আবশ্যক হইতেছে এই,—কোন একজন সম্ভ্রান্তলোক আমাদের মধ্যে মধ্যস্থস্বরূপ দণ্ডায়মান হউন, আমি আপনার স্বদেশী বন্দীদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করি,—আপনি তাহার পর আমার বন্দীগণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। এইরূপে তাহারা মুক্তিলাভ করিবার পর তখন আমরা বন্ধুভাবে উভয়ের সুবিধাজনক সন্ধিস্থাপন প্রস্তাব আলোচনা করিতে পারিব। এই অভিপ্রায়েই আমি মহাশয়কে পত্র লিখিতেছি এবং আশা করিতেছি এ প্রস্তাব আপনার নিকটও সসম্মানে গৃহীত হইবে। এবং যদি মহামান্য মহাশয়ের বন্ধুতা এবং সন্ধিস্থাপনই অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদনুরূপ পত্র লিখিলে আমিও বিবেচনা করিতে পারিব কিরূপ কার্য্য করা সর্ব্বাপেক্ষা বিধেয়। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।”

কান্‌হোজিকে অনবনত দেখিয়া ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার ইংরাজ পর্ত্তুগীজ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার দমন প্রয়াস করেন। আলিবাগের দুর্গ-সন্নিহিত সমুদ্রেই এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজ সৈন্যপূর্ণ তিনখানি রণপোত হটিয়া যায়; এবং ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে আবার বিজয় দুর্গ বন্দরের যুদ্ধে ইংরাজ ওলন্দাজ পর্ত্তুগীজ সৈন্যপূর্ণ সপ্ত জাহাজ পরাভূত হয়। কান্‌হোজির গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়া দূরে থাক, এইরূপে প্রতি বৎসরই তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির আর একখানি বহু দৌলতশালী বাণিজ্য জাহাজ ইনি আত্মসাৎ করেন। অবশেষে কি ভাবিয়া কে জানে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংরাজের সহিত সন্ধি বন্ধনে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে আবার কোম্পানির গেলি উইলিয়ম অধিকার করিয়া কাপ্তেন ম্যাফ্‌লিয়ানকে বন্দী করেন। বম্বে গভর্ণমেন্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আবার ইহাঁর দমন জন্য যখন যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন তখন সহসা বিনাযুদ্ধে দৈব সহায়ে তাঁহার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে কান্‌হোজির মৃত্যু হওয়ায় ইংরাজের আর যুদ্ধ পরাজয়ের হীনতা স্বীকার করিতে হইল না; তাঁহারা ঘরে বসিয়াই তখন

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ইহাঁর পুত্র সাহাজি অবিলম্বে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

কান্‌হোজি শিবাজির অনুরূপ গৌরবর্ণ ও কৃশাঙ্গ ছিলেন না; তিনি সুগঠিত, বলিষ্ঠ কিন্তু স্থূলকায় ও শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহার মুখাবয়ব সুশ্রী ছিল কিন্তু তাহাতে কঠোর দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পাইত। বজ্রনিয়মে তিনি আজ্ঞা পালন করাইতেন, আজ্ঞাভঙ্গজনিত শাসনে তাঁহার অনুগ্রহ ছিল না। অথচ তিনি যে তাঁহার সৈন্য সামন্তের প্রতি স্নেহবান্‌ ছিলেন, মিত্রভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার স্বভাবে যে একটা ক্ষত্রিয় সরলতা পরিব্যাপ্ত ছিল ইহা ইংরাজকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭

গাজিপুর-পত্র

তুমি ত কথায় কথায় রেলের গাড়ীর গতির সহিত মানব জীবনের সাদৃশ্য দেখাইয়া থাক ;—কথাটা অস্বীকার করিবার যো নাই,—রেলের গাড়ী হুহুঃ শব্দে চলে—নিঃশব্দে মানুষের জীবনও সেইরূপ করিয়া চলে,—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই উভয়বিধ রথযাত্রীর অবস্থাগত প্রভেদ যে বিস্তর, তাহা আমি তোমাকে হাতে হাতে বুঝাইয়া দিতে পারি।

প্রথমতঃ, দেখ জীবনের যাত্রা শেষ হইলেই আমরা মরি—আর রেলের যাত্রা শেষ হইলেই আমরা বাঁচি। একের লক্ষ্যস্থান হইতে দূরে থাকিবার জন্য, আর অন্যের লক্ষ্যস্থান পাইবার জন্যই আমাদের প্রাণগত চেষ্টা।

দ্বিতীয়তঃ—আমরণ একঘেয়ে একটানা জীবন বহন করা মানুষের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর, ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে এদিক ওদিক বদল জন্য মানুষ কত উপায়ই না অবলম্বন করে, কিন্তু রেলপথের গম্যস্থানে পৌঁছিবার আগে কোনখানে যদি ইহার একটানা গতি ভাঙ্গা পড়ে অর্থাৎ ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহা হইলেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তুমি আমার সব কথা প্রহেলিকা বিবেচনা কর,—কিন্তু ইহা প্রহেলিকাও নহে, হাসিবার কথাও নহে,—গাজিপুর আসিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইয়া আমার অদৃষ্টে এই জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছে, প্রত্যয় না যাও তুমি বরঞ্চ নিজে একবার গাজিপুর আসিয়া কথাটা যাচাইয়া লও।

তিনজনে ত আমরা রাত্রে হাবড়ার মেলট্রেণে উঠিলাম ; একজন কাশীধামে শ্বশুরালয়ে যাইবেন, আর আমরা দুই ভাইবোনে গাজীপুরের যাত্রী। রাত্রিটা ত ঘুমাইয়া কাটিল, পরদিন সকালটাও বাহিরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেশ এক-রকম আরামে কাটাইয়া দিলাম ; বাকী রহিল কেবল ঘন্টাকতকের মামলা। ভাবিলাম তাহা কাটাইতে আর কতক্ষণ ! কিন্তু তাহার পরেই দেখিলাম দিন যায় তবু ক্ষণ যায় না! যতই বেলা বাড়িতে লাগিল—শ্রাবণের কাঠফাটা রৌদ্রে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত যতই ফাটিয়া উঠিতে লাগিল—আর ততই ঐ কথার মর্ম্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলাম।

এই রৌদ্রে বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমাদের দিলদারনগরে নামিতে হইল, এখানে ট্রেণ বদলাইয়া তাড়িঘাটের ট্রেণে উঠিতে হয়। খর রোদে ভাজা ভাজা হইয়া, তপ্ত বালি পায়ে ভাঙ্গিয়া আমরা দিলদারনগরের অন্য পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম এ ট্রেণ আপাততঃ ছাড়িতেছে না—আধ ঘন্টা বাদে ছাড়িবে। মনটা বড়ই দমিয়া গেল, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া আধ ঘন্টা এইরূপে বন্দী হইয়া থাকিবার মানে মোদ্দা বুঝিয়া পাইলাম না, বড়ই রাগ ধরিতে লাগিল, কিন্তু কাহার উপর—সেটা ঠিক বলিতে পারি না। সে সময় গার্ড দু-একবার আমাদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিল, দু-একজন অপরিচিত লোক দূর হইতে আমাদের গাড়ীর দিকে চাহিয়া সেলাম করিয়াছিল, আর কুলিগুলা আমাদের জিনিসপত্র ট্রেণে তুলিয়া দিয়া দ্বিগুণ ভাড়া পাইয়াও বক্সিসের জন্য আবার ঘ্যানঘ্যান করিতেছিল। ইহার মধ্যে কে যে আমার রাগের পাত্র তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম চারিদিকের এই সকল মহামারী ব্যাপারের মধ্যেও আমার ভায়াটী কাপুরুষের মত অবিচলিতভাবে বসিয়া আছেন, তখন সমস্ত রাগ তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। তাঁহা হইতে কখনো যে ভারত উদ্ধার হইতে পারিবে না ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। রাগে দুঃখে আমার চোখ দিয়া জল পড়িল না, কিন্তু মুখখানা শুকাইয়া যে আধখানা হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে আয়না না থাকাতেও তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ভ্রাতার এমনি মনুষ্য চরিত্রজ্ঞান—তিনি বুঝিলেন আর একরকম! তিনি ভাবিলেন পথশ্রমে আমি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কথাবার্ত্তায় আমাকে তিনি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না, তিনি কথা আরম্ভ করিতেই আমাদের তর্ক উঠিল, আমরা দুজনে একত্র হইলে এরূপ না হইয়া বড় যায় না। তিনি আরম্ভ করিলেন, "যদি চাও সুখ, আগে লও দুখ।" সবুরে মেওয়া ফলে, তাহা ভুলিলে দিদিমণি?

আমি বলিলাম, "যে সুখ চায় সে দুঃখ ভোগ করুক, আমি নির্ব্বাণ মুক্তির ভিখারী।" ক্রমে ঠাট্টা হইতে গম্ভীর তর্ক উঠিল। সুখ দুঃখ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি না, মঙ্গল অমঙ্গল অনন্য-সাপেক্ষ (absolute) কি না, হিন্দুর মোক্ষ বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এক কি না, এই সকল বিচারে আধ ঘন্টা ছাড়া দেড় ঘন্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল আমরা জানিতেও পারিলাম না। ট্রেণ যখন একেবারে তাড়িঘাটে আসিয়া থামিল, তখন আমাদের জ্ঞানোদয় হইল, কিন্তু আমাদের বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তখনো আমরা সমান অজ্ঞান রহিলাম। তাড়িঘাটে আমার জন্য পাল্কি প্রস্তুত ছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া

আমি পাল্কিতে উঠিলাম, ভ্রাতা পদব্রজে চলিলেন। ষ্টেসন হইতে ষ্টীমার নিতান্ত মন্দ পথ নহে। পাল্কি দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম—ষ্টেসন হইতে হাঁটিয়া আমি কি আর ষ্টীমারে উঠিতে পারিতাম না ? কিন্তু পথটা দেখিয়া সে-ভাবটা সহজেই চলিয়া গেল। ষ্টীমারে নূতন প্রকার অভ্যর্থনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা ষ্টীমারে উঠিবামাত্র ষ্টীমারের অগ্নি-গৃহের অগ্নি-বাতাস ঝলকে ঝলকে আমাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, আর দলে দলে বোল্‌তা উড়িয়া আমাদের মাথায়, গায়, মুখে ভন্‌ভন্‌ আরম্ভ করিল। ষ্টীমার ছাড়িতেই কিন্তু এ সকল উপদ্রব শান্তি হইল, নদীর শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। সেই শীতল বাতাস আর তীরের সুদৃশ্য শোভা উপভোগ করিতে করিতে আমরা গাজিপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই ঘাট গাজিপুর সহরের ধারে। (সহর বলিতে দেশীয় লোকের নিবাস-স্থল বুঝিতে হইবে)। ঘাটে নামিয়া ধূলিময় একটা ক্ষুদ্র গলি হাঁটিয়া আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী আমাদের লইয়া সহরের গলি ঘুঁজি ছাড়াইয়া ঘন্টা খানিকের মধ্যে ইংরাজ-পাড়ায় পড়িল। ভাইটি তখন আশ্বাস দিলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই এবার আমরা বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু ক্রমাগত নামা উঠা করিয়া ট্রেণ ষ্টীমার গাড়ীর দোলায় অনবরত পাক খাইয়া খাইয়া আমার শরীর মন এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই অস্থির জগতের কোথায় স্থির মাটি আছে কি না—যদিই বা থাকে তাহা আমাদের পায়ের নীচে কখনো আসিবে কি না—যদিই বা আসে ত এত শীঘ্র আসিবে কি না, তাহাতে তখনো আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী যখন একটি বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া এক বড় বাঙ্গ্‌লার কাছে লাগিল, বেলু-রাণীর টুকটুকে মুখখানি ফুলের মত আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হাত ধরিয়া আমার ভ্রাতৃজায়া যখন বারান্দায় অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে সন্দেহ মুহূর্ত্তে অপহৃত হইল, পথশ্রান্তিও ভুলিয়া গেলাম, নির্ব্বাণ-মুক্ত হইবার জন্যও আর আকুলতা রহিল না।

গাজীপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন আর তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু তবুও অনেক সময় ইহাতে ভুল হয়। আমি আগে শীতকালে ছাড়া অন্য সময় কখনো পশ্চিমে আসি নাই, সেইজন্য পশ্চিম মনে করিতে, সুদূর-প্রসারিত বালুকা তট-মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণা তটিনী, হরিদ্রাবর্ণ শুষ্ক ক্ষেত্র, ধূলিময় জনপথ, মেঘহীন নির্ম্মল আকাশে জলীয় অণুবিহীন শুষ্ক বাতাস—এই সকলই মনে পড়ে। কিন্তু বর্ষার প্রসাদে এখন এখানকার স্বতন্ত্র শ্রী। ঘন পল্লবিত তরুশাখে লুকাইয়া কোকিল পাপিয়া প্রায় সারাদিনই এখন ঝঙ্কার দিতেছে, প্রসারিত প্রান্তর সুদীর্ঘ শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন হইয়া আছে, ভাগীরথী পূর্ণ যৌবনে

উথলিত হইয়া বহিতেছে—আর মাঝে মাঝে মেঘ বৃষ্টি আসিয়া এই নবীন দৃশ্য অধিকতর নবীনতায় সিক্ত করিয়া যাইতেছে। এখন পূর্ণবর্ষার সময় নহে, তাই সারাদিন যদিও মেঘের ঘনঘটা, আর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণের ধূম নাই, তথাপি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই প্রকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কখনো বিনা বৃষ্টিতে কখনো ক্ষণস্থায়ী বর্ষণে এ মেঘ পরিস্কার হইয়া যায়, কখনো কখনো বা দৈবাৎ সমস্ত দিনটাই মেঘ-বৃষ্টিতে কাটে। এরূপ দিনে কোকিল পাপিয়ার স্বর আর শুনা যায় না ; কিন্তু পরদিনের নির্ম্মল বৃষ্টিধৌত দিক বিদিকে প্রভাত সূর্য্যের কিরণ যখন নবশোভা অর্পণ করে, কোকিল পাপিয়া তখন আবার অতি মধুরভাবে গাহিয়া উঠে, তখন বর্ষা বসন্তে পরিণত হয়। এই বসন্ত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আমি পশ্চিম ভুলিয়া যাই, বাঙ্গলার গ্রাম্য দৃশ্য আমার সম্মুখে জাগে, পদ্মাতীরের বিজন ভ্রমণ আমার মনে পড়িয়া যায়, গাজিপুরকে আমার রাজসাই বলিয়া ভ্রম হয়। রাজসাই থাকিতে আমরা প্রায়ই বিকালে পদ্মার তীরে বেড়াইতে যাইতাম, তীরে.একস্থলে একটা প্রকাণ্ড ভগ্ন বটের উন্মূলিত শত সহস্র শিকড়ের উপর দিয়া পদ্মার কাল জলরাশি সকল্লোলে বহিয়া যাইত, আমরা সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া মেঘের চিত্র-বিচিত্র খেলা দেখিতাম। এক একদিন সূর্য্যের আলো ডুবিতে না ডুবিতে চাঁদ উঠিত, সে জ্যোৎস্নালোকে, কোকিল পাপিয়া গীতকুহরিত, বাবলার স্নিগ্ধ গন্ধপূর্ণ বিজন ভ্রমণে হৃদয় যে সুখের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন অনুভব করিতাম সে সুখ স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। তখন মনে হইত না এ সময় যখন চলিয়া যাইবে, এ দৃশ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, এ সুখও তখন ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এমনি সুখের মোহ! এ মোহ যখন থাকে তখন প্রেমের ছলনাও সমস্ত বিশ্ব সংসার অপেক্ষা নিত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন ছুটে তখন ইহার মত মিথ্যা আর নাই। তবে মানুষের জীবনই মোহময়, তাহার এক মোহ ভাঙ্গে কেবল অন্য মোহে পড়িবার জন্য। রাজসাইয়ের সে স্বপ্নদৃশ্য আমি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম—কিন্তু এখন আবার পদ্মার মত দুকূল ভরা গঙ্গার বুকে ছায়াআলোকের আন্দোলন যখন দেখিতে পাই, তৃণমণ্ডিত, তরুলতা-ঘন, বিহঙ্গ-কূজিত বনানীর পুলকশিহরণ যখন অনুভব করি, তখন সেই সুপ্তস্মৃতি নূতন মোহস্বপ্নে আবার জাগ্রত হইয়া উঠে। পদ্মার সেই কাল জল—বটমূলের সেই তরঙ্গাভিঘাত, স্নিগ্ধ বাবলার গন্ধে চাঁদের আলোর সেই হৃদয় কম্পন, এখানকার দৃশ্যের এইরূপ যে শত অভাব, তাহা স্মৃতির উথলিত ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়,—গাজিপুর আর রাজসাই আমার মনে এক হইয়া পড়ে।

কিন্তু সকলেরি সীমা আছে, কৌলি (একজন দাসী) গম ভাঙ্গিতে আরম্ভ

করিয়া যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাশের বারান্দা হইতে যখন বেসুর চীৎকার আরম্ভ করেন— তখন শত মোহদৃশ্যের মধ্যে থাকিলেও গাজিপুরে আছি বলিয়া বেশ মনে থাকে, কিম্বা এখানকার কঙ্কর-রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে তাহা রাজসাইয়ের ধূলিময় পথ বলিয়াও ভ্রম জন্মায় না। বাস্তবিক, এখানকার কঙ্করপথ বড়ই সুন্দর। যতই বৃষ্টি হউক না কেন এ রাস্তায় কাদা হয় না, বৃষ্টি থামিতে না থামিতে রাস্তা শুকাইয়া খটখট করিতে থাকে। এ রাস্তায় চলিয়া সুখ আছে। কিন্তু ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও সুখ নাই—এখানকার সহর যেখানে দেশীয় লোকেরা বাস করেন, সেখানে যে ধূলা সেই ধূলা, সেখানে কাঁকরের চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা রোজই প্রায় বিকালে কখনো হাঁটিয়া কখনো গাড়ীতে বেড়াইতে যাই। বিজন পথ, পথে দৈবাৎ এক একটি এ-দেশীয় লোক দেখা যায়। তাহাদের দুই চক্ষু, আমাদের দেশের লোকের মত ত্রিনেত্র দিয়া তাহারা আমাদের দিকে চাহে না—তাই পথভ্রমণে আমাদের সঙ্কোচ হয় না।

কিন্তু গাজিপুর আসিলাম, যাহাদের লইয়া গাজিপুরের গাজিপুরত্ব, তাহা কিছুই দেখিলাম না। বসন্তের কাল গেছে, এখন আর গাজিপুরের দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত্র গোলাপময় হইয়া থাকে না। যোগীবর পবহারী বাবা এখন গুহামগ্ন, তাঁহার এখন দেখা পাওয়া যায় না, আর আফিনের কুঠি, যাহা ইচ্ছা করিলেই দেখা যাইতে পারিত, তাহাও আমার দেখিতে ইচ্ছা করে না। এখন এখানে একমাত্র দেখিবার যোগ্যস্থল আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরেল কর্ণওয়ালিস সাহেবের কবর উদ্যান। আমরা বেড়াইতে বাহির হইলেই প্রায় সেই উদ্যান প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, ইহা আমাদের বাড়ীর খুবই কাছে। এই স্থানটি বড়ই মনোহর, প্রস্ফুটিত মালতীলতা বেষ্টিত উদ্যান প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী হইলেই তাহার শোভায় ও সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। উদ্যানে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের কেয়ারি, মধ্যস্থলে কর্ণওয়ালিস সাহেবের গম্বুজাকৃতি গোরমন্দির। সিঁড়ি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে এক চতুষ্কোণ শ্বেত প্রস্তর স্তম্ভের উপর লাটসাহেবের মূর্ত্তি বিরাজিত—স্তম্ভের চারিদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি এবং ফুল লতাপাতার কারুকার্য্য খোদিত। আমি এখানে আসিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এই স্থানটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের বন্ধুপ্রবর গাজিপুরের গাজিমহাশয়ের নিকট একদিন এই কথা বলিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। অনধিকার চর্চ্চার যে কত মহৎ দোষ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াসে এ সম্বন্ধে সংলগ্ন অসংলগ্ন যত গল্প তাঁহার জানা আছে—একে একে সমস্তগুলি তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দ্বারা আমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ

অবসন্ন সন্তপ্ত অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়া তাঁহার হৃষ্ট মুখে ও পুষ্ট শরীরে তুষ্ট ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক গাজিপুরের যেখানে যত উৎকৃষ্টতর স্থান আছে, তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দোবে ও চোবের বাগানকেও তিনি ছাড়েন নাই। সেই প্রলোভনে পড়িয়া আমরা একদিন ঐ দুই বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। চোবের বাগানটা দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হই নাই—কেননা সেখানে আমাদের গোটা দুই মোচা ও দু' চারিটা নেবু মিলিয়াছিল, কিন্তু দোবের বাগানে গিয়া আমাদের একটা সাধারণ নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা নিরাশ হইলাম—কেননা আমরা যেরূপটা মনে করিয়া গিয়াছিলাম—সেখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। আমাদের বাড়ীর ভিতরের বাগানকেও তাহা হইতে উৎকৃষ্ট মনে হইবে। আর গাজিমহাশয় নিরাশ হইলেন আমাদের এই সৌন্দর্য্যরুচির অভাব দেখিয়া। এ সম্বন্ধে আমরা উভয়তঃ উভয়কেই কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়াছিলাম।

এইখানে গাজিপুরের গাজিমহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাউক। গাজি শুনিয়া তুমি যদি মনে করিয়া থাক ইনি মুসলমান, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ। ইনি জাতিতে হিন্দু—বর্ণে ব্রাহ্মণ। সে হিসাবে গাজিপুর-স্থাপয়িতার সহিত আমাদের বন্ধুবরের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। তবে আমরা তাঁহাকে গাজি বলি—তাহার কারণ গাজিপুরের নবাগতদিগের ইনি অন্ধের লড়ি। ইনি তাহাদিগের আতিথ্যদাতা—পরামর্শদাতা—আর একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরস আলাপের যোগানদাতা। ইনি আমাদের দাতাকর্ণ। কর্ণ আতিথ্যের অনুরোধে নিজ সন্তানকে বলি দিয়াছিলেন—ইনি অতিথিদের জন্য সর্ব্বদাই আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত। এখানে আসিয়া ইহাঁর সহিত যদি আলাপ কর—তাহা হইলে গোলাপের ক্ষেত আর আফিনের কুঠি না দেখিবার দুঃখ আর তোমার থাকে না। তবে আফিনের কুঠি না দেখিয়া আমার আগেও কখনো দুঃখ হয় নাই, পরেও কখনো হইবার সম্ভাবনা নাই—কেননা ইহা না দেখিয়াও ইহার সম্বন্ধে আমার কতক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। যেদিন দোবের বাগানে যাইতেছিলাম—সেদিন রাস্তায় গরুর গাড়িতে একরূপ পাতার বোঝাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—উহা কি? কোথায় যাইতেছে?

শুনিলাম উহা নীল পাতা, নীলকুঠিতে যাইতেছে। রাস্তার ধারেই দেখিলাম সেই নীলকুঠি, ভাবিলাম একবার ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়, কিন্তু কুঠির দরজার কাছে না যাইতে এমন দুর্গন্ধ পাওয়া গেল, যে আর ভিতরে যাইতে হইল না। আফিনের কুঠির দুর্গন্ধ শুনিলাম ইহাকেও হারাইয়া দেয়। পশ্চিমে নীল জন্মাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলাম। গাজিমহাশয় বলিলেন, "পশ্চিমে তিল পাওয়া যায় আর নীল পাওয়া যাইবে না?" এ-হিসাবে

ইঁহার কালিদাসেরও স্বভাব আছে। রচনার সুবিধা পাইলে এমনতর মিলও কখনো কখনো তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়। ইহা ছাড়া ঠাট্টার বুলি—আর গল্পের টীকা তাঁহার ত মুখে লাগিয়াই আছে। যেদিন কোন কথা কহিবার পর তাঁহার মুখ হইতে একটি গল্প শুনিতে না পাই—সেদিন কথাটাই বৃথা মনে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের মধ্যে কেহ যদি বলিলেন—"মশায়, বড় সর্দ্দি হয়েছে", তিনি বাঁ হাতে হয় ঘড়ির চেনটা নয় কোটের বোদামটা নাড়িতে নাড়িতে (বুকের কাছাকাছি তাঁহার হাত সর্ব্বদাই থাকে) চোখ ভ্রূ একটু তুলিয়া একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিবেন—"চায়ে স্নান করেছিলেন বুঝি ?" বলিয়াই তিনি উচ্চ হাস্য করিবেন এবং যদি দেখেন অন্য সকলেই হাসিল, তখন তিনি বলিবেন, "একটু কস্ত চাই, মাথা ডিঙ্গিয়ে চায়ের জল পিছনে পড়বে তবে শর্দ্দিটা ঠিক জমকে আসবে।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে যে গল্পটি তিনি আগাগোড়া শেষ করিবেন—সে-গল্পটি এই—

"গাজিপুরে একটি চা-ভক্ত বাবু ছিলেন, তিনি স্নানাহার উভয়ই চায়ে চালাইতেন। সম্বৎসর তিনি স্নান করিতেন না—বৎসর পরে শ্রীপঞ্চমীর দিনে বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহার স্নানের আয়োজন হইত ; সে আয়োজন কি—না এক ঘটি উষ্ণ চা। তিনি স্নানে বসিয়া সেই গরম চা মাথা ডিঙ্গাইয়া পিঠের দিকে ফেলিয়া দিতেন, এই সময় অসাবধানতা বশতঃ যদি তাহার ছিটে ফোটা তাঁহার মাথায় কিম্বা গায়ের কোথায় লাগিত—তাহা হইলেই তাঁহার ঝামরিয়া শর্দ্দি আসিত, আর এক সপ্তাহকাল হাঁচিয়া কাঁশিয়া তিনি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তুলিতেন। গাজিপুরে ইনি চা-বাবু নামে খ্যাত।"

গাজিমহাশয় বলেন—এটি সত্য গল্প। তাঁহার গল্পের মজাই এই—তিনি সত্য বলিয়া যাহা বলেন—তাহা গল্পের মত অদ্ভুত, আর গল্প বলিয়া যাহা বলেন—তাহা নিতান্ত দৈনিক কাঠখোট্টা খবরের মত। সুতরাং গল্প যাহা করিয়াছেন তাহা একটিও মনে নাই, সত্য ঘটনা বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মনে আছে। আরো দু-একটী বলি, শুন।

এখানে তাড়িঘাট পর্য্যন্ত যখন রেল হয় নাই, তখন মৈত্রী মহাশয়ের ডাক-গাড়িতে লোকে জামালিয়ার ষ্টেসন হইতে তাড়িঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। মৈত্রী মহাশয় পাকাচালের লোক, যেখানে সিকি পয়সায় চলে, সেখানে তিনি আধ পয়সা বাহির করিতেন না। পশ্চিমে রেল হইবার আগে যে গাড়ী ডাকে চলিত, সত্যযুগের সেই সকল পুরাণ পচা পচ্‌কা গাড়ী—ও বেতো শস্তা ঘোড়া কিনিয়া তিনি ব্যবসা চালাইতেন, অথচ ঘোড়াদের নামডাকে গগন ফাটিয়া উঠিত, কোনটার নাম ভ্যান-ডিম্যান্‌স্ ল্যান্ড, কোনটার নাম ইংল্যান্ডস্ গ্র্যান্ড ইত্যাদি। যেমন গাড়ী ঘোড়া, সাজও তেমনি ; দড়াদড়ির

প্রসাদে কোন প্রকারে গাড়ি ঘোড়া ও সাজের সঙ্গে সম্বন্ধ কষিয়া রাখিলেও ৭ ক্রোশ রাস্তার মধ্যে অন্ততঃ তিন চারবার সে সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইত। এই ত ডাকগাড়ীর অবস্থা, সুবিধার মধ্যে কেবল ভাড়া তেমন অধিক নহে ; দেশের লোক হইলে চার, ইংরাজ হইলে পাঁচ টাকা ভাড়া দিলেই চলিত।

মৈত্রী মহাশয়ের আড্ডা ছিল জামালিয়া। গাজিপুর ঘাট হইতে তাঁহার গাড়িতে যাহারা জামালিয়া আসিত—তিনি স্বয়ং আগুয়ান হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। কিন্তু যাহারা অন্য গাড়িতে আসিত, মহা পরিচিত হইলেও তাহাদের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না।

একবার গাজিপুরের আফিং কুঠির কর্ত্তাসাহেব রিবেট কার্নাক তাঁহার মেমসাহেবের সহিত এই ডাকগাড়ীতে জামালিয়া যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে গাড়ীর একখানি চাকা বিদ্রোহী হইয়া একেবারে ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইল, সাহেব রাস্তার মধ্যে সস্ত্রীক নামিতে বাধ্য হইয়া ক্রোধে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একাকার করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু তথাপি ক্ষুদ্র গাড়ী ঘোড়া তাঁহাকে বড সাহেব বলিয়া মানিল না। কোচমানের নিকট দড়াদড়ি প্রভৃতি কোন সরঞ্জাম না থাকায় সে বেচারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন উপায় করিতে পারিল না। সাহেব রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেবল তর্জ্জন গর্জ্জনেই রাগ নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে এক এক্কারোহী এই পথে যাইবার সময় এই ব্যাপার দেখিয়া গিয়া জামালিয়ায় মৈত্রী মহাশয়কে সংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়াই ত মৈত্রী মহাশয়ের চক্ষুস্থির! বড় সাহেব রাগিয়াছেন, আর রক্ষা নাই! তাঁহার একমাত্র ভরসা-স্থল তখন পটকামায়ী। সাহেবের সাহায্যের জন্য লোকজন কিম্বা ঘোড়া পাঠাইতে তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলবর্ত্তী সিন্দূর চর্চ্চিত ইষ্টকরূপা পটকামায়ীর সদনে 'রক্ষা কর মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। আসিবার আগেই মনে মনে তিনি পাঁচ সিকির সিন্নি মানিয়া আসিয়াছিলেন, এখন পৈতা হাতে লইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে আবার সেই লোভ দেখাইতে লাগিলেন—আর মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন—সাহেব আসিতেছেন কিনা। সাহেব ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে এক পরিচিত বন্ধুর টমটম দেখিয়া তাহাতেই সস্ত্রীক আরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মৈত্রী মহাশয়ের স্তব শেষ হইবার আগেই জামালিয়া আসিয়া পৌঁছাইলেন। পৌঁছিয়াই ডাকগাড়ীর কর্ত্তাবাবুকে তলব হইল, মৈত্রী মহাশয় পটকামায়ী স্মরণ করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সাহেব রাগের মাথায় জিহ্বার প্রলয়কাণ্ড সমাধা করিয়া যখন থামিলেন—তখন মৈত্রী মহাশয় মৃদু স্বরে বলিলেন—

"স্যর, বেগ পার্ডন। আয়রণ রোড, আয়রণ ক্যারেজ—এলাহাবাদ, ক্যালকাটা স্যর, ফিফ্‌টি রুপি, দেয়ার এক্‌সিডেন্ট, আর আই পুয়োর ম্যান, ডাকগাড়ি জামালিয়া—ফাইফ রুপী ফ্রেট, নো এক্‌সিডেন্ট? আয়রণ ষ্টীমার, লন্ডন-ক্যালকেটা, থাউজেন্ড রুপী ফ্রেট—হোয়াই কর্ককোট ব্রিং? ইবন দেয়ার এক্‌সিডেন্ট, নট—হিয়ার?"

অর্থ এই—মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাতায়াত করিতে হইলে লোকে ৫০ টাকা ভাড়া দিয়া লোহার পথে লোহার গাড়ীতে যায়—ইহাতেও মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে, আর লন্ডন হইতে কলিকাতায় আসিতে ১০০০ টাকা খরচ আছে আর লোহার ষ্টীমারের বন্দবস্ত, তবু বিপদভয়ে লোকে কর্ককোট সঙ্গে রাখে। আর আমি গরীব মানুষ, আমার গাড়ীর ভাড়া পাঁচ টাকা মাত্র, এখানে কোন বিপদ হইবে না?

তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র আর যুক্তি আর ইংরাজি ভাষা শুনিয়া সাহেব হাসিয়া জল হইয়া গেলেন। খুসী দেখিয়া মৈত্রী মহাশয়েরও প্রাণ শীতল হইল—তিনি ভরষা করিয়া বলিলেন—"সাহেব—তোমরা ফাদার মাদার, আমার এই ডাকগাড়ীতে লোকসান অনেক, তুমি যদি ইচ্ছা কর—তবেই আমি উদ্ধার পাই"—

সাহেব বলিলেন—"আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?"

"আপনি যদি আমাকে একখানি সার্টিফিকেট দেন যে আমার গাড়ী ঘোড়া ভাল, বন্দবস্ত ভাল—তাহলে সকলেই এই গাড়ীতে আসেন—লোকসান না হলে আমি ভাল গাড়ীও করতে পারি।" সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া সেইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। মৈত্রী মহাশয় জয়জয়কার করিয়া তাঁহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিলেন এবং বাড়ী গিয়া তৎক্ষণাৎ পটকামায়ীর জন্য পাঁচসিকির সিন্নি প্রেরণ করিলেন।

মৈত্রী মহাশয় পটকামায়ীকে সিন্নি দিয়া আফিং কুঠির কর্ত্তাসাহেবকে বশ করিয়াছিলেন—গাজিপুরের আর একটি বাবু আর একটি অকাট্য উপায়ে সমস্ত সাহেবকে বশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তারিত শরীর ও রাস্তার ধারের বাড়ীর প্রসাদে তাঁহাকে অনেক ইংরাজেই চিনিত। বিকালে তিনি ভুঁড়ি বাহির করিয়া রাস্তায় বসিতেন—কোন সাহেবকে পথ দিয়া যাইতে দেখিলেই সেই অনাবৃত দেহে দৌড়িয়া তাহাকে সেলাম করিতে আসিতেন। সাহেবপ্রবর তাহাকে দেখিয়া—well অমুক—বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে যাইত,—কিন্তু তিনি সেলাম করিয়া দুহাত তুলিয়া বলিতেন—"Wait shar (sir) I have the honour to be shar (sir) your most obedient sharvant (servant.)—আমার নাম—অমুক—আর আমি অমুক আফিসের অমুক কর্ম্মচারী।"

বলিয়াই তিনি আর একবার সেলাম করিবার পর হাত নাড়িয়া বলিতেন—now go on shar (sir), অর্থাৎ, আপনি কি বলিতেছিলেন বলুন। সাহেবেরা তাঁহার এই ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি হইয়াছিল।

ইনি জাতিতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন—এবং ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত মান্য ভক্তি করিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ অনেকদিন হইতে ইহাঁর নিকট কর্ম্মের উমেদারী করিয়াও কোন কর্ম্ম আদায় করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ একদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক নির্ঘাত উপায় অবলম্বন করিলেন—সেলামবাবু যখন পাল্কী করিয়া কাছারীতে যাইতেছিলেন, তখন সেই পাল্কী ধরিয়া জোর জবরদস্তিতে একজন বেহারাকে সরাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিজের স্কন্ধ পাল্কীতে প্রদান করিলেন। গোলমাল শুনিয়া বাবু পাল্কীর ভিতর হইতে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন ব্যাপারখানা কি, তখন আমূল জিহ্বা বাহির করিয়া পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান করিলেন না। ইহার পর ব্রাহ্মণ শীঘ্র কর্ম্মপ্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সেলামবাবু তাঁহার মনের শান্তি আর কিছুতেই শীঘ্র ফিরিয়া পাইলেন না।

কেবল ইহাঁরা নহেন; এমন অনেকে মিলিয়া আমাদের বন্ধুবরের গাজিপুরের ইতিহাস পুষ্ট করিয়াছেন। এখানে হান্টিং ঘোষাল নামে এক বিখ্যাত অবতার ছিলেন। তিনি ভূতলে কখনো রাত্রি যাপন করিতেন না, একখানি খাটিয়া ও চারিজন বেহারা অবলম্বন করিয়া সমস্ত রাত্রি তিনি ভ্রমণ করিতেন। মানব-স্কন্ধের ঝাঁকানি না খাইলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। রাত্রি ত এইরূপে কাটিত, দিনের বেলাও তাঁহার যে কোন একটা স্থায়ী নিবাস ছিল তাহাও নহে, তিনি চাল-চুলাশূন্য ছিলেন, থাকিবার মধ্যে তাঁহার নিকট তাঁহার বন্ধুদের নম্বর-সন্নিবিষ্ট একখানি বড় ফর্দ্দ ছিল—সেখানি তিনি কাছ ছাড়া করিতেন না। সেই নম্বর দেখিয়া প্রতিদিন প্রভাতে পালাক্রমে তিনি এক একদিন এক একজন বন্ধুর গৃহে আবির্ভূত হইতেন। কিন্তু যে বন্ধুর ঘাড়ে তিনি যেদিন চাপিতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা ছিল না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেদিনটা ঘোষাল মহাশয়ের আহার যোগাইয়াই তিনি নিস্তার পাইতেন না, সন্ধ্যাবেলা বিদায় কালে তাঁহার খাটিয়া বেহারার এক রাত্রের বেতন পর্য্যন্ত সে বন্ধুকে যোগাইতে হইত। এইরূপে তিনি দিনের বেলা বন্ধুবর্গ—ও রাত্রে খাটিয়া বেহারাকে পাইয়া বসিতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন—কেহই তাঁহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

কত আর বলিব, আমাদের বন্ধুবর এমন অনেককে গাজিপুরে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন—আর তাহাদিগকে অমর করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অমরত্ব

লাভ করিয়াছেন। তবে এ অমরত্বে শ্রেষ্ঠ কে—কালিদাসগণ কি মল্লিনাথ—তাহা এখনো ঠিক হয় নাই। আমার মতে অবশ্য মল্লিনাথ। আর তিনি নিজেও এ-কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহা কিছুতেই স্বীকার করেন না—তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা প্রামাণ্য কি না তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ—একটা ত প্রবচনই আছে—নিজের ঘরে নিজে কেহ নায়ক নহে।

গাজিমহাশয়ের গৃহিণীর কৃপায় আমাদের এখানে অনেকগুলি বঙ্গ-পরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছে। এখন কেবল ইচ্ছা এদেশের ভদ্র-মহিলাদিগের দু একজনের সহিত আলাপ করি, কিন্তু এখানকার জানানা নিয়ম এত কড়াক্কড় যে তাহা হইবার সুবিধা নহে। এ হেন গাজিমহাশয়—যাঁহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য সাধন নাই, তিনি পর্য্যন্ত ইহাতে হার মানিয়াছেন। তবে তিনি ইহার অন্যরূপ কারণ দিয়া থাকেন—তিনি বলেন যত অসাধ্য সাধন তাহাই তাঁহার পক্ষে অধিক আয়ত্তাধীন, আকাশের চাঁদ মাটিতে আনা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সেরূপ ফরমাস না করিলে তিনি তাহা রক্ষা না করিতেই বাধ্য। কারণ যাহাই হৌক, আমাদের ইচ্ছাসত্ত্বেও এ দেশের ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের সহিত আমাদের আলাপ হয় নাই। সুতরাং তাহাদের কোন সংবাদ দিয়া তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। তবে এদেশের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা বরঞ্চ তোমাকে বলিতে পারি। প্রথমতঃ, তাহাদের চেহারা মানুষেরি মতন—ঠিক মেয়েমানুষেরি মতন, দাঁড়াও, তাহা নাও হইতে পারে—কেননা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে গড়ে ইহারা অনেকটা লম্বা চৌড়া, সেইজন্য কেহ কেহ তাহাদিগকে পুরুষালি মেয়েও বলিতে পারেন। এখানকার মেয়েরা দাসীর কাজ হইতে বাগানের মালীর কাজও করিয়া থাকে, এ হিসাবেও তাহাদের ঐ নাম খাটে। তবে গহনা পরার সাধে ইহারা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকেও হারাইয়া দেয়। এমন কোন কষ্ট নাই গহনা পরিবার জন্য বোধ হয় ইহারা সহ্য করিতে অপ্রস্তুত। সমস্ত গায়ে ত ইহাদের উলকির চিত্র বিচিত্র, তাহার উপর ইহারা হাতের কুনুই পর্য্যন্ত একরূপ মোটা মোটা কাঁসার চুড়ি আর পায়েও অনেকদূর পর্য্যন্ত এমন একরূপ আঁট গহনা পরে যে তাহার নীচের মাংস কখনো দেখা যায় না—এইরূপ আবদ্ধ শরীরাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শ্বেত হইয়া যায় এবং প্রথম প্রথম ইহাতে তাহারা নাকি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে, তথাপি তাহারা তাহা খোলে না, ইচ্ছা করিলেও খুলিবার যো থাকে না, কামারে সে গহনা তাহাদের পরায়, কামার নহিলে সে গহনা খুলিতেও পারে না। যাহারা এ ভয়ঙ্কর গহনা না পরে তাহাদের হাতের জল নাকি শুদ্ধ হয় না। কিন্তু এইরূপ গহনা পরা স্ত্রীলোক দেখিলেই আমাদের গা

কেমন করিয়া ওঠে।

এদেশের মেয়েদের মধ্যে মেলভেট বলিয়া কাঁদিবার নিয়ম বড় অদ্ভুত। এক-দিন গাড়ী করিয়া যাইতে পথে দেখি—দুইজন স্ত্রীলোক জড়াজড়ি করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে—ভাবিলাম কি না জানি তাহাদের বিপদ হইয়াছে। কিন্তু শুনিলাম ঠিক বিপরীত। অনেকদিনের পর হঠাৎ রাস্তায় আত্মীয়াতে-আত্মীয়াতে দেখা হইলে পরস্পর এইরূপ করিয়া তাহারা কাঁদে। ইহা ছাড়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় কন্যার, কিম্বা অন্য কারণে যাহার স্থানান্তরে যাইতে হয়, তাহার বাড়ীর সমস্ত আত্মীয়ার এক একবার গলা ধরিয়া ও আত্মীয়ের পা ধরিয়া রীতিমত কান্নাকাটি করিতে হয়, নহিলে বড় নিন্দা রটে। এদেশের ছোটলোকদের বিবাহ-রীতি আরো অদ্ভুত। ইচ্ছা করিলেই স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে ময়লা কাপড়ের মত পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন বিবাহ করিতে পারে। ভজিয়া বলিয়া আমাদের একজন দাসী আছে, তাহার বয়স ২৫/৩০ হইবে, প্রথম স্বামীকে সে ছাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে ছাড়িয়াছে, তাহার পর সে এখন চাকরী করিতে আসিয়াছে। তাহার মায়ের ইচ্ছা চাকরী না করিয়া সে আবার বিবাহ করে। সে তাহাতে অসম্মত বলিয়া মায়ের আর দুঃখের সীমা নাই—সে রোজ রোজ গঙ্গামায়ীর নিকট তাহার বিবাহে মতি হৌক— এই প্রার্থনা করে।

বিবাহের এই স্বাধীনতায় তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট। বড়লোকদের মধ্যে এ রীতি নাই বলিয়া তাহাদিগকে ইহারা বড়ই কৃপাপাত্র মনে করে। কিন্তু এ রীতি সত্বেও মাঝে মাঝে স্বামী মাঙ্ঘা হয় বলিয়া ইহাদের সন্তাপ করিতে হয়। ভজিয়ার মা, তাহার বয়স ৬০ হইবে, শুনিলাম ৫/৬ বৎসর আগে ইনিও বিবাহ হইতেছে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের গানের মধ্যে স্বামী-মাঙ্ঘার কথা শুনা যায়। আমাদের একটি আত্মীয়া গাজিপুরে আছেন—তিনি ছোটলোকী হিন্দুস্থানী গান অনেক জানেন, এইখানে দুই একটি তুলিয়া দিতেছি—তোমার ইহাতে মস্ত জ্ঞানলাভ হইবে।

বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ মোরি স্বজনি—গঁউলো আঙ্‌য়োয়ামে শোয়ি।
যো মোরি গোদিমে রোয়েল বালকওয়া ননদীয়ে দিইলি জাগায়ি।
একতু মহগ ভয়ি সিঁদুরে সে কাজরা দুসরা মহগ ভয়ি ফুলেলরে—
তিসরে মহগ ভয়ি ননদীকা বিরানা—কৈসে কাটে দিন-রাত।

অর্থ এই। স্বজনি গো! পূর্ব্বদিকের বাতাস বহিতেছিল, আমি আঙ্গিনায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কোলের বালক যেই কাঁদিয়া উঠিল, অমনি ননদী আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। একে ত সিঁদুর, কাজল মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে আবার ফুলেল তেলও মহার্ঘ হইয়াছে, ইহার উপর ননদীর

ভাইও মহার্ঘ হইয়াছে—কি করিয়া দিন-রাত কাটে বল ? (এই অবস্থায় যদিই-বা দৈবাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পোড়া ননদী আবার জাগাইয়া দিল !) আর একটা গান—

সৈঁয়া চলে পরদেশ পরসিনো বরজ কস নাহি।
হম শাবনোকে বিজুলিরে তুম পিয়া ভাদরকে মেহ্ ঝম ঝম বরষ কৈস নাহি।
হম মাঙ্গেকে সিঁদুরারে তুম পিয়া কাজরকে নীর ঘুঁমরকে চিতয়ো কেস নাহি।
হম বেলেকি কলিয়ারে তুম পিয়া আতর গোলাপ মহা মহা, মহকো কৈস নাহি।

"প্রিয় পরদেশ যাচ্চেন, হে প্রতিবাসিনীগণ, তোমরা কেন বারণ করিতেছ না। হে প্রিয়, আমি শ্রাবণের বিজুলি, তুমি ভাদ্রের মেঘ, ঝমঝম বৃষ্টি করিতেছ না কেন ? আমি সিঁথির সিঁদুর, তুমি নয়নের কাজল, চিত্তকে শান্তি দিতেছ না কেন ? আমি বেলের কলি, তুমি মহা মহা আতর গোলাপ, গন্ধে আকুল করিতেছ না কেন ?"

ইহার মধ্যে কোনটা তোমার ভাল মনে হয় ?

২

আমি যেদিন জানিয়াছি তুমি গাজিপুরের ইতিহাস জানিতে চাও, সেইদিনই ওল্ডহ্যামের মস্ত মস্ত গেজেটিয়ার দুইখানা সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিবার জন্য আমি সব করিতে পারি—এই বই দুখানা শেষ করা কোন ছার কথা ! তবে যে গেজেটিয়ারখানা সমুখে খুলিলেই তাহার এক অক্ষর পড়িবার আগেই আমার ঢুলুনি আরম্ভ হয়, আর সমস্ত দিনেও এক পাতার বেশী শেষ করিয়া উঠিতে পারি না— তাহার অন্য কারণ আছে। কারণটা তোমাকে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারিব না, বুঝাইতে গেলেই খুব সম্ভব ভুল বুঝাইয়া বসিব, তাই বলি সে কথা থাক, একেবারে ইতিহাস আরম্ভ করি। তুমি ভাবিও না গেজেটিয়ার না পড়িয়া লোকে ইতিহাসজ্ঞ হইতে পারে না, —তাহা হইলে আদৌ গেজেটিয়ারই সৃষ্টি হইত না। কিন্তু এরূপ পুরাতন যুক্তির প্রধান দোষ ইহাতে কোন ওরিজিনালিটি নাই, সুতরাং আমার ভ্রাতৃবর প্রণীত গাজিপুরের ইতিহাস-সার-সংগ্রহ উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে এ সম্বন্ধে আর এক নূতন অকাট্য প্রমাণ দেখাইব। ইহাতে কেবল ইতিহাস নহে, গাজিপুরের ভূগোল বৃত্তান্তও আছে। ভূগোল শুনিয়া চমকিয়া উঠিও না—সাধারণ ধারানুসারে এ ভূগোল লিখিত নহে, ল্যাটিটিউড, লংজিটিউড, জলস্থল বিভাগের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। লেখকের মতে এ সকল নিতান্তই অসার, অনুপকারী, অনাবশ্যক জ্ঞান, সুতরাং এরূপ অসার

গর্ব্বেচ্ছুকগণ ওল্ডহ্যামের গেজেটিয়ার বা সরভে ডিপার্টমেন্টের ম্যাপ খুঁজিয়া মরুন, তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি কিন্তু কোন ম্যাপে না দেখিয়াই ইহা প্রত্যক্ষ জানেন যে—"মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ঠিক নীচেই গাজিপুর অবস্থিত—যদি প্রমাণ চাও—দ্বিপ্রহরে গাজিপুরের মাঠে আসিয়া দাঁড়াইও, ছায়া পায়ে পড়িবে। কিন্তু অধিকক্ষণ দাঁড়াইও না, তাহার কারণ আছে।" কারণটা তিনি বলেন নাই। আমার বোধ হয় তাহারও কারণ আছে। ইহার পরেই তিনি একেবারে এমন হুড়মুড় করিয়া ইতিহাসে আসিয়া পড়িয়াছেন যে, সেই ঘটনার মধ্যে পড়িয়া উহার কারণটা নিজে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। শালিবাহনের সময় হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গাজিপুরের সমস্ত ঘটনাই অবলীলাক্রমে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের এমন 'Instructive' এবং 'Interesting' ইতিহাস কোন ইংরাজেও যে এ-পর্য্যন্ত লিখিতে পারে নাই, ইহা আমি খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি। (ইংরাজি কথা দুইটা তাঁহার ইতিহাস হইতেই আমি উদ্ধৃত করিলাম ; এই দুটার ভাল বাঙ্গলা করিতে পারিলে তিনি পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—চেষ্টা করিতে ছাড়িও না।) এখন ইতিহাস শুন। লেখক বলেন—

"হয় সাদত আলি, নয় মুরাদ খাঁ, নয় বলবন্ত রাও, নয় বিশ্বামিত্র মুনির বাবা গাধিরাজ প্রথম গাজিপুর স্থাপন করেন। তারপরে তিন চারি শত বৎসর কি হোল তা কেউ বলতে পারে না। সফদৎজঙ্গ হজুরীমলের পেটে তিনটে চারটে ছুরীর খোঁচা মেরে যখন গাজিপুরের তক্ত দখল করে বসেন, তখন শালিবাহনের বা বিক্রমাদিত্যের বা খৃষ্ট-মৃত্যুর বা মহম্মদ-জম্মের কোন শক বা শাল বা অব্দ তা এখনো স্থির হয়নি, কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে না। কিন্তু এটা স্থির হয়ে গেছে যে ফজল আলি অত্যন্ত মোটা লোক ছিল। সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আপনার পা দেখতে পেত না—দৃষ্টি পেটের উপর বেধে যেত, শ্রীচরণ পর্য্যন্ত পৌঁছত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার চরণ দৃষ্টিগোচর হবার প্রধান কারণ এই যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান একটি বড় গোছের ভূজালি নিয়ে বাপের জঠরভার লাঘব করেছিল। এর থেকে কোন তত্ত্ব বা নীতি বেরোতে পারে কিনা জানিনে, কিন্তু বহুৎ পরিমাণে অন্ত্র তন্ত্র যকৃৎ ও প্লীহা বেরিয়েছিল। তারপরে মামুদ খাঁর সঙ্গে আমুদ খার ভয়ানক যুদ্ধ হয়—কিন্তু মাঝে থেকে মন্ত্রী হামুদ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক দুই দলকে ফাঁকি দিয়ে প্রভু এবং প্রভুর তিন পুত্র, তের জামাই ও আঠারটা ভাগ্‌নেকে সাফ করে ফেলে পৌনে দুশ বেগম ও গাজিপুর দখল করে বসে, তারপর থেকে অনেকগুলো খাঁ, আলি, বক্স, উল্লা, নেড়ে, দেড়ে, বিষ, ছুরী, মড়ক উত্তরোত্তর গাজিপুর ভোগ দখল

করে। তারপরে অনেকদিন আর বড় একটা শিক্ষা বা আমোদজনক ঘটনা কিছু ঘটেনি। কেবল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে গাজিপুরের ইতিহাসে চিরদিন জাজ্জ্বল্যমান থাকবে।"

এ ঘটনাটা যে কি তাহা বোধ হয় তুমি অনুমান করিতে পারিয়াছ? অন্ততঃ আমি ত পারিয়াছিলাম। পারিয়া এতদূর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম যে সেদিন গেজিটিয়ারের একটা আস্ত পরিচ্ছেদ সমস্তটা পড়িতেও আমার কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু পরিচ্ছেদটা শেষ করিয়া তাহার ত্রিসীমার মধ্যে কোথায় গাধির নামোল্লেখ না দেখিয়া মনটা বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাস লেখকের একচোখো দৃষ্টির ইহা অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, গাজিপুর যে গাধিপুরের অপভ্রংশ—অন্য কথায় গাধিরাজ যে গাজিপুরের স্থাপয়িতা, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, আমার বিজ্ঞ ভ্রাতৃপ্রবর এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন ;

দ্বিতীয়তঃ, শ্যামবাবুর মুখে ইহা আমরা শুনিয়াছি।

তৃতীয়তঃ, শ্যামবাবুর বিশ্বাস—দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত।

চতুর্থতঃ, আমরা এ-সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিলেই তাঁহার কথার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ তিনি আমাদিগকে সহরের মধ্যে লইয়া গিয়া গাধি-দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট দেখাইতে উদ্যত। আমরা কিন্তু তাহা দেখিতে যাই নাই, কিম্বা উক্ত প্রবাদ বা উক্ত দুর্গের সত্যতা নিরূপণেরও অন্য কোন চেষ্টা করি নাই। এত প্রমাণের উপর অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা নিতান্তই অনাবশ্যক, তাহাতে মূর্খতা প্রকাশ পায় মাত্র। এই পত্রখানি কোন ইংরাজের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি মনে করিতে পারেন—এইরূপে Oldham-কে মূর্খ বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠিক উল্টা। আমার বিশ্বাস, ইহার একটী প্রমাণও তাঁহার চক্ষু-কর্ণ-গোচর হয় নাই। বেশী নহে, ইহার মধ্যে কোন একটি জানিতে পারিলেই তিনি যে মান্ধাতার তক্তায় গাধিরাজকে বসাইয়া নির্ব্বিবাদে সমস্ত গোল মিটাইতেন, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই।

মান্ধাতার আমল হইতে গাজিপুর বর্ত্তমান—মনে করিলেও শরীর কন্টকিত হইয়া উঠে। তবে যদি তুমি এ মান্ধাতাকে রামের আদিপুরুষ মনে করিয়া থাক, তবে সে দোষ আমারো নহে—ওল্ডহ্যামেরো নহে।

দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ পরাজিত হইবার পর মান্ধাতা নামে তাঁহার বংশজ এক ক্ষত্রিয় পুরুষ কোন রোগ হইতে আরোগ্যলাভের বাসনা করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার সীমানায় পদার্পণ করিবার আগেই তাঁহার

মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গাজিপুরের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত কুতোট নামে এক গ্রামে পৌঁছিয়া সেখানকার পুষ্করিণীতে স্নান করিতেই তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন, এবং কৃতজ্ঞতার প্রাবল্যে এই দেশকে তাহার অসভ্য শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে মুক্তিপ্রদান পূর্ব্বক নিজে তাহার সিংহাসনে চাপিয়া বসিলেন।

ক্রমে দুর্গাদিতে কুতোটের এক স্বতন্ত্র শ্রী হইয়া উঠিল। মান্ধাতার পুত্রাদি ছিল না, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজরূপে বরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবে ক্ষত্রিয়োচিত লক্ষণের কোন ব্যতিক্রম ছিল না। একদিন একজন মুসলমানী তাহার বালিকা-কন্যা লইয়া রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল,—যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইলেন এবং বিবাহ অভিপ্রায়ে মুসলমানীকে ডাকিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মুসলমানী তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে বালিকাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বালিকা তখন নিতান্ত অল্পবয়স্কা—সুতরাং তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে মানস কবিয়া তাহাকে রাজান্তঃপুরে রাখিলেন। (রাজার জাতিকুল ইহাতে কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।) এদিকে কন্যাপহৃতা ক্রুদ্ধা মুসলমানী নিকটস্থ এক মুসলমান প্রধানের নিকট এই সংবাদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। মুসলমান সমস্ত শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল, কিন্তু রাজবিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া মুসলমানীকে দিল্লিসম্রাটের নিকট ইহা আবেদন করিতে পরামর্শ দান করিল। মহম্মদ টোগলক তখন দিল্লির সম্রাট, কিন্তু তিনি তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ ফিরোজ টোগলককে দিল্লিতে রাখিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। ফিরোজ টোগলক ৪০ জন দরবিস-যোদ্ধবর্গকে মুসলমানীর সাহায্যের জন্য প্রদান করিলেন। তাহারা মুসলমানীকে বলিল, "আমরা আহ্লাদের সহিত তোমার পক্ষ অবলম্বন করিব,—কিন্তু তোমার একটি কাজ করিতে হইবে,—বিখ্যাত সায়েদ মসায়ূদকে আমাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত করাইতে হইবে।"

মুসলমানী বলিল, "তাহাকে কোথায় পাইব?"

তাহারা বলিল, "আজ রাত্রে খুব একটা ঝড় উঠিবে এবং কেবল তাঁহার শিবির ব্যতীত এই ঝড়ে অন্য সমস্ত দলপতিদিগের শিবির ভূমিসাৎ হইবে। সেই শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তুমি যাহাকে কোরাণ পাঠে নিযুক্ত দেখিবে, তিনিই মসায়ূদ।"

ইহার পর অবশ্যই সে রাত্রে ঝড়ও উঠিয়াছিল, মুসলমানী মসায়ূদকে শিবিরে কোরাণ পড়িতেও দেখিয়াছিল—এবং মুসলমানীর অনুনয়ে তিনি দরবিসদিগের সেনাপতি হইতেও সম্মত হইয়াছিলেন।

মসায়ূদের সপ্ত পুত্র ছিল, সেই সপ্ত পুত্র ও ৪০ দরবিস এবং অন্য

সেনাবর্গের সহিত তিনি যখন মান্ধাতার দুর্গ সন্নিকট হইলেন তখন একজন ফকীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, এই ফকীর হিন্দুদিগের ভয়ে তাহার ধর্ম্ম গোপন রাখিত। সে দরবিসদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরামর্শ দিল— "প্রকাশ্য যুদ্ধে তোমরা হিন্দুর সহিত পারিবে না, গুপ্তযুদ্ধ কর।" তাহার কথায় মসায়ূদ লুক্কায়িতভাবে রাত্রিকালে দুর্গ বেষ্টন করিয়া প্রাতঃকালে আক্রমণ আরম্ভ করিল। রাজা মান্ধাতা সকালবেলা স্নানে যাইবার আগে নদীতীরে বসিয়া আয়েশে কুস্তি দেখিতেছিলেন, সহসা কোস্তাদিগের কুস্তি এবং তাঁহার দেখা সমস্তই শেষ হইল। এইরূপে যুদ্ধের আগেই যুদ্ধজয়, পরে দুর্গ গৃহীত এবং অবশেষে মুসলমানী তাহার কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ,—কন্যাকে পাইয়া মুসলমানী গৃহে লইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবাদ— পৌত্তলিকের সহবাস করিয়াছে বলিয়া অপমানিত জ্ঞানে তাহাকে পাইয়াই সে বধ করিয়াছিল। মান্ধাতার ভ্রাতুষ্পুত্র এ সময় স্থানান্তরে ছিলেন— দুর্গাভিমুখে প্রত্যাগমনকালে সমস্ত ব্যাপার তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সহিত আর একবার মুসলমানদিগের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু সেবারও হিন্দুগণ পরাজিত হইল, যুবরাজ ও তাঁহার পুত্র সিদ্ধরাজ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

সিদ্ধরাজের নাম হইতে গাজিপুরের পুরাতন মহলের নাম সিধবার। সিদ্ধরাজ ও তাঁহার পিতার গোরস্থান নাকি এখনো এইস্থানে দেখা যায়। হিন্দুদিগের গোরস্থান বড় নূতন কথা। বোধ হয় মসায়ূদ আপনাদিগের প্রথানুসারে সম্মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে সমাধিস্থ করিয়া থাকিবেন।

মসায়ূদ কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ পরাস্ত ও নিহত শুনিয়া দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া মসায়ূদকে গাজি উপাধি প্রদানপূর্ব্বক মান্ধাতার সিংহাসনে অধিকার দান করিলেন। গাজি নাম হইতেই এই রাজ্য গাজিপুর নাম প্রাপ্ত হইল।

এখানে প্রতিবৎসরে সায়েদ মসায়ূদের নামে গাজিমিন নামক একটি উৎসব হয়—ইহাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগদান করে। উৎসবমেলায় সহরের উত্তর ময়দানে একটি গোরস্থান নির্ম্মিত হয়।

গাজিমিন উৎসবে যেমন হিন্দু-মুসলমানে ভাব, বখরীদ উৎসবে তেমনি বিপরীত। প্রতি বৎসর এই উৎসবে পরস্পরের মধ্যে একটা দাঙ্গা হেঙ্গাম না হইয়া প্রায় যায় না। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে মর্ম্মাহত করিবার জন্য তাহাদিগের দ্বারদেশ দিয়া উৎসর্গীকৃত গোকে বধ করিতে লইয়া যায়—এবং তাহাদিগের বাসস্থানের নিকটস্থ ময়দানে তাহাকে হত্যা করে, হিন্দুগণ ইহাতে বাধা দিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে। গভর্ণমেন্ট ইহার একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিলে গোল মিটিয়া যায়, গোবধের জন্য হিন্দুদিগের দৃষ্টি-বহির্ভূত স্বতন্ত্র স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে এরূপ দাঙ্গা আর হইতে পায় না,

কিন্তু মুসলমানদিগের প্রতিই তাঁহাদিগের সহানুভূতি। এবার বখরীদে দাঙ্গা নিবারণ অভিপ্রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া হিন্দুদিগের চোখের উপর গোবধ করাইয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমানের উল্লাস ও হিন্দুর হতাশের সীমা ছিল না। এইরূপে অপমানিত ও আহত হইয়া ক্রুদ্ধ হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিল। গমওয়ালা, তরকারীওয়ালা, কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি হিন্দু ব্যবসাদারগণ মুসলমানদিগকে কিছু বিক্রয় করিবে না বলিয়া এককাট্টা হইল। বাস্তবিক জব্দ করিবার উপায় বটে ! মুসলমানগণ দিনকতক মহা ত্রস্ত হইয়া উঠিল, অবশেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া ভদ্র মুসলমানগণ ভদ্র হিন্দুদিগকে ধরিয়া আপোষে এই গোল মিটাইয়া ফেলিলেন। এই সময় হিন্দুদিগের যথার্থ একটা সাহস দেখা গিয়াছিল। এক ভদ্র ব্রাহ্মণ বালক কোন মকর্দ্দামার সাক্ষীতে এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আনীত হয়। আসিবার আগেই সে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে জুতা মারিবে এবং ইহার জন্য যে শাস্তি পাইতে হয় গ্রহণ করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ধীরভাবে পায়ের একপাটি জুতা খুলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিল, এবং আবার মারিবার জন্য আর এক পাটি খুলিতেছে—এই সময় ধৃত হইল। তিন মাস তাহার কয়েদ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সে কাতর নহে। মার খাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—এবং অন্য ইংরাজেরা বলিতেছেন—কি Coward ! কোর্টের ভিতরে দাঁড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জুতা মারিল—Cowardই বটে ! যাক্, কি বলিতে কি কথায় আসিয়াছি ?

কি করিয়া গাজিপুরের নামকরণ হইল তাহা ত শুনিলে ? গাজি বংশের পর আফগানেরা এখানে রাজত্ব করে। আফগান বংশ যখন বিদ্রোহী হয় তখন আকবর তাহাদের রাজ্যচ্যুত করিয়া পাহাড়খানকে এখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। পাহাড়খাঁর গোরস্থান এবং পুষ্করিণী এখনো তাঁহার নাম গাজিপুরে জাগ্রত রাখিয়াছে। ফজল আলি গাজিপুরের শেষ নবাব। তিনি সত্যই এত স্থূলকায় ছিলেন—যে নিজের উদর তাঁহার নজরে পড়িত না। তিনি নাকি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন ; তবে ইহা প্রবাদ কিনা জানি না, গেজেটিয়ার লেখক এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাঁর নিকট হইতে ইংরাজেরা গাজিপুর গ্রহণ করেন।

এই ত গাজিপুরের ইতিহাস ! ইতিহাসের যাহা প্রধান বিষয় অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোক এবং তাহাদের অবস্থা,—তাহার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই, ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসেরি নাই। রাজা-রাজড়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহারা উলুখড়ের দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইবারি কথা, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা ইতিহাস-লেখকগণ বাহুল্য বিবেচনা করিয়াছেন। তুমি যদি

বেশী কিছু জিজ্ঞাসা কর, আমিও বাহুল্য বিবেচনা করিব। তবে যদি দেশের লোকের কথা ছাড়িয়া বলিয়া যাইতে বল, তাহা হইলে বরঞ্চ আরো দুচার কথা বলিয়া যাইতে পারিব। গাজিপুর অতি পুরাতন সময়ে বৌদ্ধদিগের অধিকারভুক্ত ছিল ; তাহার পর গুপ্তবংশগণ এ অঞ্চলে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের লোপের পর সপ্তশতাব্দী যে এ অঞ্চলের কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত। ইহার পর একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে গাজিপুরের আসল ইতিহাস আরম্ভ, এই সময়েই মান্ধাতার আমলে গাজিপুর স্থাপিত হয়। মুসলমান আসিবার বহুপূর্ব্বেই যে এ অঞ্চল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং এ প্রদেশ আদিম অসভ্যদিগের বাসভূমি হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়। এই অসভ্যগণই ভড় ও শিওড়ি নামে খ্যাত। অসভ্যদিগের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষাও এদেশে এতদূর লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যে মুসলমান সময়ের হিন্দুগণ গুপ্তবংশের সমসাময়িক স্তম্ভাদি-খোদিত পালিভাষা কিছুমাত্র পড়িতে পারিতেন না। তাঁহারা সেই সকল চিহ্ন অতি পুরাতন কালের জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। বর্ত্তমান কালেও সাধারণ্যে এই সকল ভগ্নাবশিষ্ট ভড় রাজা ও শিওড়িদিগের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত, কোনটি বা মহাভারতের কোন ঘটনার সহিত অদ্ভুত গল্পে সম্বদ্ধ। কনিংহ্যাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের যত্নে এই সকল মিথ্যার মধ্য হইতেও সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রদেশের সৈয়দপুর এবং ভিৎরি নামক স্থানে গুপ্তবংশের কীর্ত্তি-চিহ্নাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। সৈয়দপুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান। ইহা নিজ গাজিপুর হইতে মোট ১২ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। ভিৎরিও গাজিপুর হইতে অধিক দূরে নহে।

ভিৎরি পূর্ব্বে একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল। গুপ্তবংশের বিবরণ খোদিত একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ, ভগ্ন ইষ্টকরাশি, ভগ্নাবশিষ্ট খোদিত প্রতিমূর্ত্তিরাশি এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিদিগের মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তিও আছে। ইষ্টকে কুমারগুপ্তের নাম পাওয়া গিয়াছে। সায়েদপুর এখনো একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। অনেক লোক এখানে বাস করে, অধিকাংশই বাণিজ্যব্যবসায়ী। এখানে নূতন মন্দিরাদির ত অভাবই নাই, দুইটি পুরাতন চৈত্যও এখানে অদ্যাপি বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্মের এত দুর্দ্দশার পর এই পুরাতন চৈত্য দুইটি যে এখনো এখানে অবস্থান করিতে পাইয়াছে, তাহার একটি কারণ—একজন মুসলমান ফকীর সিক সামন ইহার একটিতে বাস করিত, এবং মরিবার পর ইহার মধ্যে গোরস্থ হইয়াছে,—দ্বিতীয় চৈত্য নবাব মুকদুম সার গোরস্থান। সায়েদপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে হিংচুর নামক গ্রামে এই চৈত্যাদির অপেক্ষাও পুরাতন কালের মন্দিরাদি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলমান হস্তে তাহা এত পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে যে, তাহার পুরাতনত্ব সহজে নির্ণয় করা যায় না।

৩

আমরা একদিন বিকালে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, পশ্চিমে স্তরবিন্যস্ত নানাবর্ণ উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে সূর্য্য অস্তে যাইতেছিলেন, পূর্ব্বাকাশ সিন্দূর মেঘে ছাইয়া পড়িযাছিল, উভয়দিকের এই বিচিত্র আভায় নদী লালে-লাল হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গার উপর কতবার এ শোভা দেখিয়াছে—তথাপি সমস্তই নূতন লাগিতে লাগিল। লোহিত আভাময় শ্যামল গাছপালার মধ্য দিয়া হঠাৎ এক একবার যখন পশ্চিমের বিচিত্র বর্ণ ঘন লোহিত আকাশখণ্ডে চোখে পড়িতে লাগিল, গঙ্গার উপর আকাশের লাল ছায়া যখন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া চলিতে লাগিল, আকাশের বর্ণ-সৌন্দর্য্য-স্নাত পিককুল কুহরিত শ্যামল দিগন্ত হইতে যখন প্রতিহত কিরণকণা আনন্দ হিল্লোলরূপে বিকিরিত হইলে লাগিল—তখন মনে হইতে লাগিল জ্যোৎস্না-দৃশ্যও এত মনোহর নহে। মানুষের জীবন এমনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের উপর স্থিত!

ভ্রাতা গাহিতে লাগিলেন—

আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—
(এ কি) প্রেম কুসুম ফুটে হৃদি-কাননে।
ভগবত মঙ্গল কিরণে—উজল জগৎ শত বরণে
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি
গায় সবে একতানে, পূরে দিশি দিশি আনন্দ তানে।

এই আনন্দ গান, আনন্দ দৃশ্যের মধ্যে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহসা উপকূলের এক কুটীরতীর হইতে জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলাম তীরে আসীন বিভূতি-চর্চ্চিত রুদ্রাক্ষধারী এক সাধু দুই হাত তুলিয়া আমাদের আশীষ করিতেছে, অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ সেইখানে দাঁড়াইয়া আমাদের অভিবাদন করিতেছে। সাধুপুরুষটি আমাদের গোয়ালিনীর স্বামী—এখানে সকলে ইহাকে ভক্ত বলে। ইহার অবস্থা অনেকটা তুকারামের মত। ধ্যান ভজন হরিনামেই ইহার দিন কাটে, স্ত্রী পুত্র সংসার মরুক বাঁচুক, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, গোয়ালিনী তাই সর্ব্বদাই তাহাকে গালি পাড়ে—কিন্তু তাহাতেও তাহার আনন্দের কিম্বা ভজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ হয় না।

ভক্তের হৃদয়ের আনন্দ ভক্তিভাব তাহার মুখেতেও প্রকাশ দেখিলাম—তাহাকে দেখিয়া আমাদেরও আনন্দ হইতে লাগিল।

তাহাদের কুটীর ছাড়াইয়া কিছু দূরে-দূরে দুইটি মাটির ঢিবি সতীদাহের

চিহ্ন-স্বরূপ এখনো বর্ত্তমান।

পবহারী বাবার আশ্রমও নদীতীরে। আশ্রম শিষ্যপূর্ণ দেখিলাম, কিন্তু গুরুর সহিত তাঁহাদের এখন দেখা হয় না—তিনি গুহামধ্যে ধ্যানমগ্ন, কবে তিনি উঠিবেন তাহাও কেহ তাহারা জানে না। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার আশা আমার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গাজিপুরে আর একজন সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়াছি, তিনি গাছে ঝুলিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া ভক্তি হওয়া দূরে থাক—তাহার বিপরীত ভাব মনে উদিত হয়, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই।

পবহারী বাবার আশ্রম হইতে আরো কিছুদূর গিয়া আমরা ফিরিলাম। তাহার আগেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—চাঁদ উঠিয়াছিল, উজ্জ্বল লোহিত আভার পরিবর্ত্তে ম্লানতর রজতাভায় চারিদিক আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল, আবার গান আরম্ভ হইয়াছিল ; জলের মৃদু কল্লোল, দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দ, আর সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি অপূর্ব্ব এক মিলন তান তুলিয়াছিল। নৌকা যখন আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি স্বল্প জলের মধ্যে আসিয়া পড়িল, দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া লগী ঠেলিতে লাগিল—তখন গান বন্ধ হইল—আমাদের স্বপ্নের ভাবও ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা কঠোর সত্য জগতে ফিরিয়া আসিলাম, বন্ধুবর গাজিমহাশয় তখন রাজা বৈদ্যনাথের লগী ঠেলার গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পটি আমরা অনেকবার শুনিয়াছি, তোমাকে একবার না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কানপুরের রাজা বৈদ্যনাথের নিজের শরীরটি যেমন প্রকাণ্ড—তাঁহার চড়িবার ঘোড়াটি তেমনি ক্ষীণকায় ছিল। তদারোহণে তিনি প্রত্যহই গঙ্গাস্নানে যাইতেন। যাইবার সময় তেমন বাধা বিঘ্ন হইত না, কিন্তু আসিবার সময় গঙ্গাজলপূর্ণ দুইটি কলস অশ্বপৃষ্ঠের দুই দিকে ঝুলাইয়া নিজে মধ্যে অধিরোহণপূর্ব্বক যখন গৃহাভিমুখী হইতেন, তখন অশ্ব চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িত,—সেই সময় নদীতে যেমন করিয়া লগী ঠেলে, সেই অনুকরণে তিনি এক বংশদণ্ড মাটীতে চালনা করিতেন এবং এইরূপে ঘোড়া, গঙ্গাজল ও আপনাকে লইয়া নিরাপদে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেন।

নৌকাভ্রমণ সেদিন আমাদের এত ভাল লাগিল, যে সকলেই একবাক্যে কিছুদিন বোটে করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রথমে দূর দূরান্তর, শেষে কাশী পর্য্যন্ত যাইবার কথা হইল। গাজিপুর হইতে কাশী জলপথে ৪/৫ দিনের রাস্তা, সুতরাং এই প্রস্তাব আমাদের পার্লামেন্টে সে-রাত্রে মহা উৎসাহ সহকারে উত্থাপিত, অনুমোদিত এবং পেষীকৃত হইয়া গেল, কিন্তু রাতটা পোহাইবামাত্র সমস্তই শৃগালের যুক্তিতে পরিণত হইল। আমাদের গাজিমহাশয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি পরদিন এই যাত্রার নানারূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে নিরুৎসাহ করিয়া

দিলেন। হইলে কি হয়—কাঙ্গালকে একবার ধানের ক্ষেত দেখাইলে কি রক্ষা আছে? কাশী দেখিব বলিয়া আমি তখন এমনি বাঁকিয়া বসিলাম যে ভ্রাতা অগত্যা স্থলপথে আমাকে কাশী দেখাইয়া আনিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতা হইতে গাজিপুরের পথে যে নামা উঠার হেঙ্গামের কথা বলিয়াছি, কাশীর পথের নিকট তাহা সামান্য। গাজিপুর হইতে কাশী মোট ৪/৫ ঘন্টার পথ—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ৪/৫ বার নামা উঠা করিতে হয়। ষ্টীমার হইতে তাড়িঘাটে নাম—তাড়িঘাট হইতে দিলদারনগরে নাম—তাহার কয়েক ষ্টেসন অগ্রসর হইয়া আবার মোগলসরাইয়ে নাম,—সেখানে ভিন্ন ট্রেণ ধরিয়া তবে কাশীতে পৌঁছাও। সমস্ত পথটা তুমি যেন বিলিয়ার্ডের একটা গোলা,—ঢুঁ খাইয়া কেবলি ফেরাফেরি করিতেছ—আর মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য ট্রেণরূপ থলিগত হইতেছ। যাহা হউক, বেলা থাকিতেই আমাদের যাত্রার বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হইল; আমরা গোলা-গুলা প্যাক হইয়া বিশ্রামস্থলে পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটি ঘটনা হইয়াছিল উল্লেখযোগ্য। আমরা দুইজনে দিলদারনগরের গাড়ীতে বসিয়া আছি—দুইজন ভদ্র মুসলমান—(তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ) আমাদের গাড়ীর নিকট আসিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল, একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আপলোক কাহাঁসে আতা?" ভ্রাতা কি উত্তর দিবেন ইতস্ততঃ করিতেছেন — তাহারা ভাবিল আমরা তাহাদের ভাষা বুঝি না, বৃদ্ধ সেই মর্ম্মে তাহার সঙ্গীকে বলিল— "দেখিলে ত, আমি বলিয়াছিলাম—উহারা এখানকার নয়", বলিয়াই আবার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপলোক কোন মুলুক্কা আদিম?" ভ্রাতা প্রসন্নমুখে হাসিয়া বলিলেন —"হামলোক বাঙ্গলা মুলুক সে আয়া।" এই কথায় কি জানি তাহাদের কি ভাবোদয় হইল, উভয়েই হাত তুলিয়া সেলাম করিতে করিতে গদগদ হইয়া বলিল— "বহুত খুব, বহুত খুব", বলিয়া, চলিয়া গেল।

এখন তুমি কাশীর বিবরণ শুনিতে চাও? কোথা হইতে আরম্ভ করিব? ইতিহাস হইতে? আচ্ছা সেই ভাল, নহিলে দস্তুর রক্ষা হয় না। মান্ধাতার আমল হইতে গাজিপুরের ইতিহাস পাইয়াছ—কিন্তু কাশীর স্থাপয়িতা স্বয়ং বিশ্বেশ্বর—সুতরাং কাশী অনাদি পুরাতন—অর্থাৎ পৃথিবী যখন সমুদ্রমগ্ন ছিল, সেই প্রলয়কাল হইতেই কাশী বর্ত্তমান। কথাটা বিশ্বাস না কর কাশীপুরাণ পড়িয়া দেখ। তবে এ পরামর্শ দিয়া কতটা বন্ধুর কাজ করিতেছি বলিতে পারি না; কাশীপুরাণ পড়িলে জীবন্তে গাধা হইবার একটা সম্ভাবনা আছে। অন্ততঃ একজন এইরূপ হইয়াছিলেন। তিনি আগে চুনারে বেশ মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন; হঠাৎ কাশীপুরাণ পড়িতে পড়িতে একদিন দেখিলেন—কাশীর পরপারে মরিলে

লোকে গাধা হয়। চুনার কাশীর পরপার, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ত তাঁহার গাধা হইবার সম্ভাবনা মনে জাগিতে লাগিল। তিনি সেইদিনই চুনারের কর্ম্মত্যাগের দরখাস্ত করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া চুনার পার হইয়া ট্রেণে উঠিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এইরূপে তিনি ভবিষ্যৎ গর্দ্দভত্ব হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া বর্ত্তমানে গর্দ্দভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চুনারের কর্ম্ম ছাড়িয়া ইনি গাজিপুরে এক সামান্য মাহিনার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাজিপুরে ইনি গাধাবাবু নামে খ্যাত। ভরসা করি মৃত্যুর পর তিনি মুক্তিলাভ করিবেন।

এখন কাশীর ভূ-বিবরণ ! কাশীতে মন্দির অজস্র, তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। কাশীতে ঘাট অনেক—সকল ঘাটই পুণ্যঘাট। মহারাজ মানসিংহ নির্ম্মিত কাশীর মানমন্দির বিখ্যাত, কাশী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে সারনাথের মন্দির—ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধকীর্ত্তি বিরাজমান, কাশীর কলেজবাটী প্রকাণ্ড, কাশী পণ্ডিতপ্রধান স্থান ; কাশীর জরির কাপড় প্রসিদ্ধ—কাশীর খেলেনা সুন্দর। আর কত বলিব ? তবে যদি তুমি বল কলিকাতায় বসিয়াই তুমি এসব জান, এ আর নূতন কথা কি—তাহা হইলে আমাকেও স্বীকার করিতে হয়, যাহা বলিলাম তাহা আমারো নূতন জ্ঞান নহে, কেননা কাশী আসিয়া আমি কাশীর প্রায় কিছুই দেখি নাই। কাশী বেড়াইবার মধ্যে—পোঁছিবার পরদিন বিকালে বোটে করিয়া সহরের দৃশ্যটা একবার দেখিতে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু হাতে হাতে তখনি কাশীপ্রাপ্তির সম্ভাবনার সূত্রপাত হওয়ায় তাহার দিকে বড় ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। বোটে চড়িয়াই আমরা দেখিলাম বোটখানার নিতান্ত ভগ্নদশা, কিন্তু তখন ফিরিলে আর বোটে বেড়ানই হয় না—সুতরাং কি করা যায়—সেই জীর্ণ ক্ষুদ্র বোটেই কয়জনে প্যাক হইয়া বসা গেল। বোট স্রোতের টানে বেশ চলিতে লাগিল, তীরের অবিচ্ছিন্ন সংলগ্ন মন্দির, বাটীর পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। নানা বর্ণের, নানা আকৃতির নানারূপ দৈর্ঘ্যের মন্দির অঙ্গে অঙ্গে সংলগ্ন, মাঝে মাঝে কোন মন্দিরের চূড়া স্বর্ণময়, কোন মন্দিরের অর্দ্ধভাগে মসজিদ, মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাট—ঘাটে ঘাটে কত দেশের স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছে। কোন কোন মন্দিরের নিম্নতলায় গঙ্গার জলে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজগণের এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্দির এখানে বিরাজিত। সম্প্রতি নেপালরাজ এক নূতন মন্দির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গঙ্গার উপর নৌকা হইতে কাশী দেখিলে মনে হয় যেন সহরটি গঙ্গার জলের মধ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। সহরের মধ্য হইতে যে বাড়ীগুলি একতালা, দোতালা দেখায়, গঙ্গা হইতে দেখিলে সেগুলিকে ৪/৫ তালা বলিয়া মনে হয়। জলের মধ্য হইতে এইরূপ উচ্চ অট্টালিকা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে পাকা ঘাটগুলি পরস্পর সংলগ্ন

হইয়া থাকায় গঙ্গার দিক হইতে কাশীর অত শোভা দেখায়। আমরা মুগ্ধনেত্রে এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় নৌকার মুখ ফিরিল। মাঝি বলিল, যদি সন্ধ্যার আগে বাড়ী যাইতে হয় ত এখনি ফেরা আবশ্যক—কেননা স্রোতের বিপরীতে যাইতে হইবে। সে কি ঘোরতর সংগ্রাম! বর্ষার দুর্দ্দম্য স্রোত-জলের মাঝে মাঝে মগ্ন বাড়ীর অংশ মস্তক তুলিয়া আছে—তাহার চারিদিকে ভীষণ আবর্ত্ত ঘূর্ণায়মান—নৌকা সেই আবর্ত্তের দ্বারা ভীমবলে আকৃষ্ট হইয়া তাহার উপর পড়িতে চাহে — মাঝিরা প্রাণপণে তাহা অতিক্রম করিয়া নৌকাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে চাহে; একবার যদি এই মগ্ন ভিত্তিতে আসিয়া নৌকা আহত হয় ত আর রক্ষা নাই—এইরূপে কত নৌকা এ সময় ডুবি হয়। মাঝিরা মহা চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের বিপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; আমাদের মনে হইতে লাগিল—কাশী-দর্শনের পুণ্যফল বুঝি আমরা সদ্য সদ্য হাতে হাতেই লাভ করি। অধম আমরা—তাহাতে কিন্তু আমাদের মনে কিছুমাত্র আনন্দের উদয় হয় নাই, যখন কোনপ্রকারে এই পুণ্যের হস্ত হইতে আমাদের অব্যাহতির সম্ভাবনা দেখিলাম, তখনি পরম পুণ্যজ্ঞান করিলাম।

এই ত কাশীর কথা আমার সাঙ্গ হইল; না, আর একটি বলিবার আছে। নৌকা হইতে ফিরিয়া বাড়ী আসিবার সময় পথে একস্থলে দেখিলাম—বৃক্ষ-বিলম্বিত এক দড়ির দোলনায় উপবিষ্ট এক যুবতীকে দুইজন বালক দুলাইয়া দিতেছে। কাশীর যত দৃশ্য দেখিয়াছি—সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটি সুন্দর লাগিল, রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রতি দোলায় দোলায় যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল—সেখানে বাঁশরী বাজিতেছিল না, কিন্তু সেই ঝুলনে শ্যামের বাঁশরীরব শুনিতে শুনিতে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেই রাতটা কাশীতে ছিলাম—পরদিনই আমরা গাজিপুরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার শীঘ্রই কলিকাতায় গিয়া পড়িব।

ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ১২৯৬

নীলগিরি

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল।

মহীশূরে সকালে ৯টার সময় ট্রেণে চড়িলে সেই দিন সন্ধ্যাবেলা মান্দ্রাজ লাইনের জলারপেট জংসন ধরিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মেটপলিয়মে পৌঁছান যায়। এইখানে রেলপথের সমাপ্তি। এখান হইতে উৎকামন্দ সহর ত্রিশ মাইল উর্দ্ধে। ধূমযানে এই পথটুকু দু ঘন্টার পথও নহে, কিন্তু আমরা প্রায় দ্বিপ্রহরে টাঙ্গায় চড়িয়া প্রতি তিন মাইল অন্তর ঘোড়া বদল করিতে করিতে উৎকামন্দে পৌঁছিলাম প্রায় সন্ধ্যা ছয়টার সময়। একে জ্যৈষ্ঠ মাস তাহাতে জলারপেট হইতে মান্দ্রাজের বিষুবরৈখিক উত্তাপ আরম্ভ, ট্রেণে সমস্ত রাত্রি যেন অগ্নিকুণ্ডের দাহ ভোগ করিয়াছি, আর মান্দ্রাজের নাইডু মহাশয়কে মনে পড়িয়াছে। আমরা যখন তাঁহার বন্ধুর বাড়ী বসিয়া গরমে ছটফট করিতেছিলাম, তখন তিনি ক্রমাগত বলিতেছিলেন—মান্দ্রাজ কলিকাতার মত গরম নহে। এ সময় ট্রেণে থাকিলে তিনি কি বলিতেন একবার দেখা যাইত। মান্দ্রাজের গ্রীষ্মাধিক্য তাঁহাকেও স্বীকার করাইতে পারিলে বোধ করি এ উত্তাপকষ্টও আমাদের অনেকটা শমিত হইয়া আসিত।

মনে করিয়াছিলাম রেলপথে যেমন গরম পাইয়াছি পাহাড় পথে তেমনি শীত পাইব। কিন্তু চড়াই পথের শীতল বাতাসটুকু আমাদের গ্রীষ্মক্লান্তদেহে স্নিগ্ধতা সিঞ্চন করিতে লাগিল মাত্র। তাহার অধিক আর কিছুই নহে। উৎকামন্দে পৌঁছিয়াও শীতের তীব্রতা তেমন বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের স্নায়বীয় প্রণালীতে যে পরিমাণ উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ বিক্ষেপণ শেষ না হইলে দেখিলাম শীতক্লান্ত হইবার ভয় নাই। এ অভিজ্ঞতা আমার নূতন নহে। গ্রীষ্মস্থান হইতে শীতদেশে আসিলে প্রথমে তাহার শৈত্য ততদূর অনুভব করা যায় না, ইহা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। ইংলণ্ডে যাঁহারা যান, তাঁহারাও শুনিয়াছি প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে অধিক শীত অনুভব করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবেও এখানকার শীত দারজিলিং নইনিতাল প্রভৃতি হিমালয় অন্তর্গত পাহাড়নিবাস হইতে অনেক কম। যদিও ইহার উচ্চতা দারজিলিং-

এরই মত—৭০০০ হাজার ফুট। এখানে রাতে একটি লেপের উপর একখানি কম্বল গায়ে দিলেই বেশ আরাম পাওয়া যায়, দারজিলিংয়ে ইহার দ্বিগুণ আবরণ আবশ্যক। এখানে একজোড়া গরম মোজা পায়ে দিলেই পা বেশ গরম থাকে, দারজিলিংয়ে দুই জোড়া মোজাতেও কূল পাইত না। হিমালয়ের তুলনায় নীলগিরির শীতও যেমন মৃদুমন্দ, দৃশ্যও তেমনি মৃদু মধুর। এখানে হিমালয়ের সেই অভ্রভেদী রজতশুভ্র তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গশ্রেণীর সুমহান সৌন্দর্য্য নাই, দিনে নিশীথে ঝিল্লিধ্বনিমুখরিত নিবিড় গম্ভীর অরণ্যানীর রুদ্র শোভা নাই, পথপার্শ্বে কোথাও লতাশৈবালজড়িত মহাবৃক্ষনিবিড়তা, কোথাও বা অত্যুঙ্গ মসৃণ পর্ব্বতদেয়াল, কোথাও বা গভীর খদের ভয়ঙ্কর ভাব নাই। যত্রতত্র বিবিধবর্ণ বনফুল ও বিচিত্র লতাগুল্ম পর্ণীতরুর অপরূপ শোভা সমাবেশ নাই। নির্ঝর প্রপাতের ফেনময় উচ্ছ্বসিত কল্লোল এবং মেঘরৌদ্রের মুহুর্মুহু লীলাখেলাও নাই। এমন কি এখানে যে সুবৃহৎ সুবঙ্কিম বহুদূরব্যাপী সরোবরগুচ্ছ আছে তাহাও ঠিক নইনিতালের মত অতি ভীমকৃষ্ণ শোভাবিশিষ্ট নহে। পাহাড়গাত্র যে সকল সুন্দর সুদৃশ্য তরুরাজি সমাচ্ছন্ন তাহাও রুদ্রভাববিরহিত, কাননশোভাসঙ্কুল ; ভ্রমণেও পার্ব্বত্য শ্রমক্লান্তি নাই, পথ দুরারোহ্য উচ্চ নীচ নহে, ঘূর্ণ্যমান সমতল চড়াইপথে নিম্নভূমির মত গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে, সহরের যত উর্দ্ধেই উঠিতে চাও গাড়ীতে যাইতে পার ; বাতাসও মলয়ানিলের মত উপভোগ্য। এইরূপে, এতদিন ধরিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের যেরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, পার্ব্বত্যনিবাস বলিতেই মনে যে ভাবসমূহের উদয় হইয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত ইহার আশ্চর্য্য অসঙ্গতি!

নূতনতার সংসারে এত ব্যাখ্যা, কিন্তু নূতনে যতক্ষণ পুরাতন না মেলে, তাহার সহিত যতক্ষণ পরিচিত না হই, ততক্ষণ কি তাহার মধ্যে প্রকৃত সুখ মেলে? স্ত্রী মরিলে পুরুষ যে শ্যালিকাকে বিবাহের জন্য এতটা উৎসুক সে কেবল তাহাতে পুরাতন স্ত্রীকে অনেকখানি পাইবার আশায় বই ত নয়! হায় হায়! ইংরাজ এখানে বড় ঠকিয়াছেন, তাঁহাদের শ্যালিকা-বিবাহ প্রথা এখনো চলিল না!

*

অসঙ্গতি পদার্থটা ত' আর স্বতন্ত্র কিছু নহে—অনভ্যাস, অনভিজ্ঞতা, নূতনতার অন্য অর্থই অসঙ্গতি। আমরা চিরকাল যেস্থলে যেরূপ শৃঙ্খলযোজনা দেখিতে শিখিয়াছি তাহার বিপর্য্যয়ই আমাদের নিকট অসংগত। তাই প্রথম প্রথম এত সুখেতেও কেমন অসুখ বোধ হইত ; নীলগিরির এ সকল মধুরতা কিছুই ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তায় মানুষ যেমন দোষেগুণে প্রিয় হইয়া উঠে, সেইরূপ নীলগিরির সহিত যতই আমরা ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইতে লাগিলাম, যতই সে আমাদের নিকট পুরাতন

হইতে লাগিল, ততই তাহার অসঙ্গতিতেও আমরা সঙ্গতি দেখিতে লাগিলাম ; তাহার অভাবগুলি পর্য্যন্তও তখন আমাদের নয়নে ভাবপরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। হিমালয়ের আদর্শ ছাড়িয়া তখন তাহার আদর্শেই তাহার মধুরতা মধুররূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম বনফুল সেঁউতিরাণীকে কানন-গোলাপের সহিত সর্ব্বতোভাবে তুলনা করিতে গিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছিলাম, তাহার রূপেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। আপন রূপেই সে আপনি অতুল। আর তখনই এই পুরাতন কথা নূতনের মত করিয়া অনুভব করিলাম যে,—নূতন যদি চিরনূতনই থাকিত, তাহা হইলে সংসারে এত প্রেম এত সৌন্দর্য্য মিথ্যা হইত। নূতনে পুরাতন, পুরাতনে নূতন মেলে বলিয়াই জগৎ ভাবময়, জগৎ মধুময়।

এখন দেখিতেছি উৎকামন্দ অতি সুন্দর, চিত্রে বিচিত্র, দৃশ্যে সুদৃশ্য, বাতাসে মধুমাস, ভ্রমণে মনোরম। ইহার দিগন্তবেষ্টিত, মেঘহীন স্বচ্ছ শুভ্র আকাশের কোলে স্তরে স্তরে নীলিমায় তরঙ্গায়িত, অতিনীল, নীলাকাশ অপেক্ষাও ঘন নীল স্বনামে সার্থক অনতি-উচ্চ শৈলাবলী অতি সুদৃশ্য। এত নবঘন নীল মাধুরী অন্য কোনও পাহাড়ে দেখা যায় না। ইহার বক্ষস্থিত সর্পগতি পথ, সুবিশাল হ্রদগুচ্ছ, সুদূরবিস্তৃত শ্যামল চা ক্ষেত্র, সরল সুদীর্ঘ পত্রমুকুটশোভিত সুরূপ সুন্দর নীলনির্যাস তরুসমাচ্ছন্ন, স্তরবিন্যস্ত পাহাড়পুঞ্জ, তৎগাত্রস্থিত রক্তবর্ণ খোলার ছাদবিশিষ্ট কুটীরমণ্ডলী ও অট্টালিকানিচয় সকলই মনোহর ; অধিকতর মনোহারী কেননা মেঘহীন শুভ্র সুনির্ম্মল দিন, রৌদ্রদ্রব সুখকর শীত, বসন্ত মধুর সুশীতল বাতাস, এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ অনায়াস ভ্রমণে এই দৃশ্য সৌন্দর্য্যকে আমাদের প্রকৃত উপভোগের মধ্যে আনিয়া দিতেছে। দারজিলিংয়ে এই বর্ষার দিনে অনবরত বৃষ্টিবর্ষণশীল মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে একটা অন্ধকার বিরক্তির ভাব আছে, শীতে ক্লান্তি আছে, সেখানকার রৌদ্রস্ফুট তুষার দৃশ্যও অতি মহান, অতি গম্ভীর, অতি সুন্দর, অতি বিস্ময়কর, তাহা কেবল দূর হইতে দর্শনের, স্পর্শনের নহে ; তাই তাহার মধ্যে তৃপ্তির পূর্ণ সুখ নাই, নীলগিরির সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তৃপ্তির মহাসুখ। ইংরাজের সুন্দর শিশু অপেক্ষা নিজের কাল ছেলেটিতে আত্মীয়তার যে তৃপ্তিসুখ, দারজিলিং ও উৎকামন্দ সম্বন্ধেও কতকটা সেইরূপ বলা যাইতে পারে। হিমালয় দেবালয় ; তাহার দুর্ভেদ্য দুর্গম্য গূঢ় গম্ভীর রহস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আপনার করিতে পারে না, নীলগিরি মর্ত্ত্যে মানবের নন্দনকানন। অন্ততঃ দারজিলিং হইতে অতি দূরে, তাহার সৌন্দর্য্য যখন আমার মানসনেত্রে ছায়া হইতেও অস্পষ্ট, অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, তখন নীলগিরির সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুবসন্ত উপভোগ করিতে করিতে আমার এখন এইরূপ মনে হইতেছে।

আমরা মহীশূরের দেওয়ানের প্রাসাদে আছি। ইহা দেওয়ানের নিজস্ব নহে, রাজসম্পত্তি। রাজপ্রাসাদের অতি বিস্তৃত পাহাড়ভূমির মধ্যেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু মধ্যে এক উচ্চ পাহাড়-দেয়ালের ব্যবধানে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী নজরে পড়ে না, পরস্পর সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মহীশূরের রেসিডেন্ট এবং রাজপুত্রদিগের শিক্ষক প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর আবাস-বাটী রাজপ্রাসাদেরই আশেপাশে দেখা যায়। মহীশূররাজের যত বাড়ী আছে তন্মধ্যে দেওয়ানের বাড়ীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এমন কি এত সু-উচ্চ সুদৃশ্য রৌদ্রবায়ুসুগম স্বাস্থ্যকর, সর্ব্বতোভাবে এত ভাল বাড়ী মহীশূর রাজারও নহে। রাজোদ্যান যদিও চমৎকার, প্রাসাদও প্রকাণ্ড, প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন মহল ; রাজমহলে আমলাদিগের জন্য আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ, রাণীর অঞ্চলেও তাঁহার নিজের এবং তাঁহার মাতা ও সহচরীদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মহল ; ড্রয়িংরুম, শয়নাগার প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্টভাবে সাজান ; কিন্তু প্রাসাদের গৃহাবলী দেওয়ানের বাড়ির মত এত সুউচ্চ বৃহৎদ্বারযুক্ত ও রৌদ্রবায়ুসুগম নহে। কারণ, রাজপ্রাসাদ অনেকদিন পূর্ব্বে ক্রীত হইয়া ক্রমাগত সংস্কৃত হইয়া আসিতেছে। দেওয়ানের বাড়ী নবনির্ম্মিত, সুতরাং সুবিধা আরাম শোভা সহজেই এখানে একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে দেওয়ানও প্রাসাদ সংলগ্ন গৃহে থাকিতেন ; অতি অল্পদিন মাত্র দেওয়ানখানা পৃথক হইয়াছে ; বাড়ীর উদ্যান রাস্তা প্রভৃতি এখনো সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই, প্রতিদিন কম্পাউণ্ডে এখনো অনেকজন করিয়া বর্গা কুলি-মজুর খাটিতেছে। বর্গারা এখানকার ঔপনিবেশিক পাহাড়ি জাতি। টিপুসুলতান এক সময় নীলগিরিতে গিরিনিবাস স্থাপনের অভিপ্রায়ে মহীশূর হইতে অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া এখানে আসেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা সেই অবধি এখানে রহিয়া গিয়াছে তাহারাই বর্গা। ইহারা ক্রমে নীলগিরির আদিমনিবাসী টোডাদিগের আচার ব্যবহার অনেক গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের সাজসজ্জা, ভাষা মহীশূরী রহিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত শ্রমশীল ও সৎ। সেই যে ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মাটী খুঁড়িয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ফেলিতে আরম্ভ করে, একবার বিশ্রাম করিতে দেখি না। এতটা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ইহারা কি করিয়া করে—ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। অথচ কোন প্রহরী লাঠি হস্তে তাহাদের কাজের যে তদারক করে তাহা নহে। শুনিলাম তাহাদের এই শ্রমশীলতায় দেওয়ান সন্তুষ্ট হইয়া বস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন। এখানে কুলিদিগের, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরি বেশ ভাল কাপড় পরা। স্ত্রীলোকেরা লাল বেগুণি গোলাপি প্রভৃতি নানাবর্ণের কাপড় সুদৃশ্য রকমে কুঁচাইয়া পরিয়া মাটীর ঝুড়ি বহিয়া একসঙ্গে অনেকে যখন চলে তখন বড় সুন্দর দেখায়। আমি দেখিতেছি ভারতবর্ষের

অন্য সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ-ব্যয় আছে, কেবল বাঙ্গালিই এ সম্বন্ধে ভাগ্যবান। মহীশূরে আমাদের যে দাসী ছিল তাহাকে মাঝে মাঝে ১০/১২ টাকা দামের রেশমী শাড়ি পরিতে দেখিয়া বলিতাম, "তোর মাইনে মাসে ৪ টাকা, এত ভাল কাপড় পরিস কোথা থেকে?" সে বলিত, "আমরা খাই না-খাই কাপড় পরিতে হয়।" দাসীর এই বাবুগিরী বাঙ্গালী জীবনে যদিও অসহ্য হইবে তথাপি আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—তাহার সেই পরিস্কার সাজসজ্জা আমাদের বড় ভাল লাগিত, আর এখানেও মজুর রমণীদিগকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তিলাভ করে। তাহারা যেন দেওয়ানের বাগানের অন্যতম সজ্জাস্বরূপ। বাস্তবিক দেওয়ানের বাড়ীটি যেমন সুন্দর সুগঠিত, তেমনি চমৎকার সাজান। আমরা ইংরাজি দস্তুরে আজকাল ড্রয়িংরুমই কার্পেটে ওয়ালপেপারে এবং অন্যান্য সুদৃশ্য আসবাবে সাজাইয়া রাখি, এ-বাড়ীর প্রতি গৃহই যেন ড্রয়িংরুম। ভাল ভাল কৌচ চৌকি টেবিল খাট আয়না আলমারি প্রভৃতি গৃহ সরঞ্জামের ত অভাবই নাই, তাহা ছাড়া বাড়ীর সমস্ত গৃহ-দেয়ালই সুন্দর সুচিত্রিত কাগজে মণ্ডিত, এবং প্রতি গৃহতলই মখমল সুকোমল কার্পেটে আবরিত। ফুলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যেমন মন কেমন করে, তেমনি প্রতিদিন সেই অতি নূতন অতি সুন্দর অতি কোমল কার্পেটের উপর জুতার ধূলি সঞ্চয় করিতে অস্বস্তি বোধ হয়।

এই বাড়ীর কম্পাউণ্ডে পাহাড়ের আড়ালে গেট পর্য্যন্ত অতি সুদীর্ঘ বিজন পথ। প্রতিদিন উষাকালে এখানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার নয়নের উপর নীল পাহাড়ের আড়াল দিয়া তরুলতার মধ্য হইতে ক্রমে মুক্তাকাশে সূর্য্যের সুবর্ণ গোলক ভাসিয়া উঠে, মেঘকান্তিময় দিগদিগন্ত তাহার কিরণ ছটায় উদ্ভাসিত বিকশিত হইয়া উঠে, চারিদিকে নয়নপথে কোথাও ফুল নাই, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ নীলনির্য্যাস পত্রের মৃদুমন্দ সুগন্ধ হিল্লোলে চারিদিক তরঙ্গিত হইতে থাকে। বৃক্ষপত্র সূর্য্য আকাশ বায়ু সকলে মিলিয়া স্তব্ধ প্রাতঃকাল জগৎপিতার মহিমাস্তুতিতে আনন্দপ্লাবিত করে। এই আনন্দরাজ্যের পাশ দিয়া যখন এক একটি মলিনবেশা দীনহীনা রমণী কাষ্ঠভার মস্তকে বা শতছিন্ন চিরখণ্ডাবরিত শিশু ক্রোড়ে চলিয়া যায় তখনি কেবল যেন এই সুখের স্রোত সহসা বন্ধ হইয়া যায়, এই আনন্দময় সুপ্রভাতে প্রাণীজগতে কত হিংসাদ্বেষ, জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, মনুষ্যাবাসে কত ঘরে শোক দুঃখ হাহাকার চলিয়াছে, তাহা মনে পড়িয়া যায়—নৈরাশ্যব্যথিত হৃদয় তখন দেখিতে পায় বিধাতাপুরুষ অমিশ্রিত পরিপূর্ণ আনন্দ কেবল তাঁহার জড়সন্তানের মধ্যেই বিতরণ করিয়াছেন ; আর জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ তাপ তাঁহার অনিবার্য্য দান। তখন কাতর প্রাণ হইতে এইরূপ প্রার্থনাসঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকে।

এ মধু প্রভাতে মধুর রবি, মধুরূপময়ী ধরণী-ছবি,
মধুর মিলনে আলোকিত সবি, দশদিকে প্রেমপুলক বয়।
লতাপাতাফুল ঢালিছে সুগন্ধ, পবন বহিছে শীতল সুমন্দ,
নির্ঝর তটিনী গাহিছে আনন্দ, তব নামে বিভু উঠিছে জয়।
এত সুখ-ভরা এই নিকেতন, দ্যুলোক ভূলোক প্রেমে অচেতন;
কেন, পিতা, তবে এ সন্তানগণ, দীন দুখী শুধু তোমার ঘরে?
এমন প্রভাত, এত সুখালোক, মেলিতে ফেলিতে সুখের পলক,
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ, বেদনার অশ্রু-সলিল-ভারে।
এ মহা আঁধার প্রভু হে ঘুচাও, এ সুখ-প্রভাতে তাদেরও জাগাও;
তব রাজ্য হতে দূর করে দাও, শোক পাপ তাপ বিপদ-লেশ।
দিলে যদি জ্ঞান কেন এই মোহ, কেন ঈর্ষা দ্বেষ দিলে যদি স্নেহ;
এ আনন্দরাজ্যে কেন, প্রভু দেহ, এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তরুলতার বৈচিত্র্য এখানে অধিক নাই। দারজিলিং-এর পার্কের ন্যায় এখানে স্থানে স্থানে সহরপ্রান্তে যে কয়েকটি অরণ্য রক্ষিত আছে, সেই সকল স্থানে ছাড়া সহর মধ্যে পাহাড়-গাত্রে ফার্ণ অর্কিড বা শৈবাল-লতা কদাচিৎ দেখা যায়। বনফুলও বিরল, বৃক্ষাণীও প্রকারে অল্প, কিন্তু সুদৃশ্য ও সংখ্যায় প্রচুর। নীলনির্যাস তরুরই উপবন যেখানে সেখানে। অন্যান্য তরু যে নিতান্ত বিরল তাহা যদিও নহে, ঝাউ, বাবলা, দেবদারু, মুকুল-তরু প্রভৃতি পরিচিত ও অপরিচিত বৃক্ষাবলীও নানা প্রকার আছে বটে কিন্তু তাহারা অধিকাংশই নীলনির্যাসের বহুলতার মধ্যে নগণ্যভাবে মিলিয়া তাহারি শোভা যেন বর্দ্ধিত করিতেছে। কেবল এক একটি অতি সুদৃশ্য অপরূপ তরু—সহস্র তারকা মধ্যে সিরিয়স নক্ষত্রের মত নীলনির্যাসের বনে স্বপ্রকাশিত। একরূপ সুরূপ বৃক্ষ তাহার পাতাগুলি বিভিন্ন আভাযুক্ত ধূসর বর্ণের মখমলের ন্যায়। এই পত্ররাজি আবার দলে দলে এক একটি বৃন্তে পদ্মের আকারে ফুটিয়া অতি সুন্দর শোভা বিকশিত করে। আর একরূপ বাবলা জাতীয় গাছ, একই বৃন্তে তাহার দুইরূপ পাতা। বাবলার মত সরু সরু পাতার মাঝে মাঝে খেজুর পাতার মত এক একটি সুদীর্ঘ পত্র; অতি বিচিত্র!

নীলনির্যাস তরুর ইংরাজি নাম ব্লুগম। ইহা তালগাছের ন্যায় সরল সুদীর্ঘ, কিন্তু ইহার গাত্রে স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ বৃন্ত, তাহাতে তেজপত্রের ন্যায় সুদীর্ঘ পত্রাবলী আলম্বিত। শিরোভাগ পত্রঘন, পত্রগুচ্ছ মুকুটের মত শোভাময়। এই বৃক্ষরাজি শৈশবে ও যৌবনে ভিন্নরূপ। শৈশবাবস্থায় ইহাদের পাতা নেবুপাতার মত চেপটা, এবং আকাশের মত সুনীল; আর বড় গাছে ইহা শ্যামকান্তিময়। তরুণ ও বয়স্ক বৃক্ষকে পাশাপাশি একত্র দেখিলে বিশ্বাসই

হয় না যে ইহারা একই জাতি। এই শিশু কিশোর ও বয়স্ক তরুর সমাবেশে, শ্যাম ও নীলকান্তির অপরূপ সম্মিলনে, উৎকামন্দের বনস্থলী একদিকে বিচিত্র শোভাপন্ন, অন্যদিকে সুগন্ধে আমোদিত। ইহার পত্র অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। কেবল তাহাই নহে, স্বাস্থ্যকারিতায় এবং জলশোষণ গুণে ইহা নীলগিরির প্রধান ভূষণস্বরূপ। উৎকামন্দের মাটিতে জলীয়তা পূর্ব্বে এত বেশীমাত্রায় ছিল যে শুনা যায় রাস্তার যেখানে সেখানে খুঁড়িলেই জল পাওয়া যাইত; যেখানে সেখানে পাহাড়-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর দেখা যাইত। রাস্তা ঘাট গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ষণ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিত না, শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খারাপ হইয়া যাইত। নীলনির্যাসের জলশোষণকারী গুণ জানিয়া উৎকামন্দের মাটী কঠিন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা এখন এত অধিক পরিমাণে রোপিত যে ইহা দ্বারা পাহাড়ের মাটী আবার অতিরিক্ত কঠিন নির্জ্জল হইয়া পড়িয়াছে, এখন এইজন্য এখানে একরূপ জলাভাব বলিলেই হয়; নির্ঝর প্রপাত দুর্লভ দর্শন, কোন দূর অরণ্যে দৈবাৎ পাহাড়ের কোন গুপ্ত কোণে ঝুরু ঝুরু করিয়া একটু জল পড়িতে দেখা যায়। মাটী খুঁড়িলে ত আর জল উঠেই না, সহরের ব্যবহারের জন্য এখন কলের বন্দোবস্ত হইয়াছে, রক্ষিত সরোবর হইতে কলে জল আসে। নীলনির্যাস তরু সজিনা গাছের ন্যায় অমর, মুড়াইয়া কাটিয়া ফেল, আবার মূল হইতে গাছ উঠিবে। ইহার শিকড়ে জল শোষণ করে, পত্রে তারপিণ তেল হয়। দেশীয় লোকে সর্দ্দি হইলে পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করে।

সহরের আশেপাশে যে সকল প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি রক্ষিত সেখানে নীলনির্যাসের গাছ অপেক্ষাকৃত বিরল, অন্যান্য নানাজাতীয় বন্য গাছেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। যে মখমল পত্রশালী বৃক্ষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে বনস্থলী অতি সুশোভিত। এই সকল অরণ্যকে এখানে সোলা বলে। এখানে হিমালয়ের প্রকৃতি দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্তি লাভ করে। অরণ্যের পাশ দিয়া বেশ প্রশান্ত গাড়ীর পথ, পথের স্থানে স্থানে তরুশাখা দুই দিক হইতে খিলানের মত মিলিত হইয়া পথ ছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জের মত করিয়াছে। লতাজড়িত মহীরুহে, ফলবৃক্ষে, ফার্ণে, বনফুলে অরণ্য স্তব্ধ গম্ভীর, অথচ ফুলন্ত ফলন্ত শোভা-সমাকুল। সহরের ফুলের অভাব এখানে যথেষ্ট বিদূরিত হইয়াছে। নইনিতালের ন্যায় বন্য সেঁউতি যূঁথিতে বনভূমি স্থলে স্থলে আলোকিত, অন্যান্য বনফুলও নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অর্কিড বা শৈবাল-লতা প্রায় দেখিলাম না। ফার্ণও তত প্রচুর বা নানাজাতীয় নহে। এখানে চন্দ্রমল্লিকার মত একরূপ হরিদ্রা বর্ণের ফুল ফোটে, তাহা চিরসৌন্দর্য্যবতী, শুকাইয়া গেলেও তাহা সুন্দর দেখিতে থাকে, সোলার নির্ম্মিত ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। কোন কোন

বনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুইনাইনের চাষ দেখিলাম। বন্য ফলের গাছ সমস্ত সোলাতেই প্রচুর। বেরি নানারকম। রাসবেরি ও গুসবেরির গাছ গোলাপ গাছের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। কিন্তু বেরির গাছ অতি ক্ষুদ্র। পাহাড়ের গায়ে তাহার ছোট সরু ডাঁটা লতাইয়া থাকে, দেখা যায় কি না যায়। খানিকটা আমরুল গাছের মত ; ডাঁটার আগায় ঐ-রূপ গোল গোল দু একটি পাতা, আর সমস্ত ডাঁটা ফলে ফলে ভরা। দেখিলে আমাদের দেশের বালিকা মাতাদিগকে মনে পড়ে। বনে বড় গাছে আর একরূপ সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়, তাহা খাইতে অনেকটা বেরিরই মতন, খানিকটা আঙ্গুরের স্বাদ মিশ্রিত। এ দেশের লোকে ইহাকে বুন পেয়ারা বলে। যদিও গাছের কিম্বা ফলের আকারে অথবা স্বাদে পেয়ারার সাদৃশ্য কিছুই পাওয়া যায় না।

আপেল, পেয়ার্স অর্থাৎ নাসপাতিও বনে পাওয়া যায়। কিন্তু বাগানের যত্নকর্ষিত ফলের ন্যায় ইহা তেমন সুস্বাদু নহে। ফলপূর্ণ নাসপতির বাগান দেখিতে বড় সুন্দর। গাছগুলি বাতাপি নেবু গাছের মত ; শাখাসমূহ পূর্ণ, অবনত করিয়া ফলগুলি বৃন্তে বৃন্তে ঝুলিয়া রহিয়াছে, বহু কষ্টে হাতে করিয়া পাড়িবার লোভ সামলাইতে হয়। নাসপাতি যে এত চমৎকার সুস্বাদু ফল তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। কলিকাতায় যে সকল নাসপাতি পাওয়া যায় তাহার মত কচকচে আদপেই নহে। ইহা যেমন রসাল তেমনি নরম। ভাল পেয়ারার ভিতরের শাঁসের মত মুখে মিলাইয়া যায়। এখানে যে সকল পিচ-প্লম ও এপ্‌রিকট পাওয়া যায় তাহাও খুব ভাল। তবে নাসপাতি ছাড়া নিজ উৎকামন্দে এ সকল ফলের চাষ নাই। কুনুর হইতে আসে। কুনুর উৎকামন্দ হইতে ৭ মাইল নীচে। টঙ্গায় যাতায়াতে তাহা পথে পড়ে।

উৎকামন্দে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। সুল্‌তান সোলার পদপ্রান্তে তাহা প্রবাহিত। টিপু সুল্‌তান এখানে আসিয়া যে উচ্চ পাহাড়-শিখরে কেল্লা নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম সুলতান শিখর। সেই নাম হইতে আমি এই শিখর সংলগ্ন অরণ্য শ্রেণীরও নাম দিয়াছি সুল্‌তান সোলা। কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া বেশীদিন টিপুর এখানে বাস করিতে হয় নাই, শীতক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই এ নিবাস তিনি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। এখনো অরণ্যে পরিণত পাহাড় চূড়ায় গড়ের ভগ্নাবশেষ ইষ্টক-চিহ্ন বর্ত্তমান। আমাদের বাড়ী হইতে এই অরণ্যে যাইতে হইলে প্রথমে খানিকটা নীচে নামিয়া তাহার পর উচ্চে উঠিতে হয়। বাঁধা রাস্তায় না গিয়া পদনির্ম্মিত ক্ষুদ্রপথে চলিলে পাহাড়ের পদতলে পৌঁছিয়া সেই নদীটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পার হইয়া তবে পাহাড়ে উঠিতে হয়। নদীটি এমনই স্বল্পগভীর আর ছোট যে মাঝে মাঝে পাথর রাখিয়া জুতা না ভিজাইয়া আমরা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যাইতাম। নদীর ধারে স্থানে

স্থানে সেঁউতি যূথীর চমৎকার বাহার। একস্থানে একটি নির্জ্জন শিবমন্দির—মহীশূরের এক রাজকর্ম্মচারী দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ধারে নদীতে বাঁধ দেওয়া, তাই সেখানে জলধারা বেশ বড় হইয়া নির্ঝরাকারে পড়িয়া পার্শ্বের স্তব্ধগম্ভীর অরণ্যময় উচ্চ পর্ব্বতপদ ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সুল্‌তান সোলা পাহাড়ের উচ্চাংশে অবস্থিত, আমাদের বাড়ী হইতেও অনেকটা উপরে, ফার্ণহিল অরণ্য উৎকামন্দের অনেকটা নীচে, আমাদের বাড়ীর নীচে দিয়াই ইহার পথ ; সেইজন্য এই পথটার নামই ফার্ণহিল রোড, আর মহীশূর রাজপ্রাসাদের নাম ফার্ণহিল হাউস। ফার্ণের আধিক্য হইতেই এই অরণ্য যে ফার্ণহিল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। যদিও এদিকে নদী নাই, তথাপি সুল্‌তানসোলা অপেক্ষাও যেন ফার্ণহিল অধিকতর সুদৃশ্য। অরণ্যের একদিকে সুবিস্তৃত শ্যাম চা ক্ষেত্র, অন্যদিকে প্রশস্ত হ্রদ, শিরোপরি উচ্চ পাহাড়ে রোমাণ-কাথলিক নানদিগের সাদা ধবধবে বাড়ী, অরণ্যের কিঞ্চিদূর্দ্ধে তরুঘন ছায়াপথ, পথের একস্থলে পাহাড় গাত্রস্থিত এক গুপ্ত অন্ধকার কোণ হইতে ক্ষুদ্র জলধারা পড়িতেছে। বনপথের বহুদূর সেই গম্ভীর শব্দে মুখরিত। আমরা এখানে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতেছিলাম। সেই অতি শীতল, জলকল্লোলিত, অন্ধকার পাহাড় পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে মহীশূররাজ্যের ভৃত্যের নিকট শনিলাম, তিন চার বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলে এতই অধিক শীত, এবং এই পথ এত দুর্গম ও জলময় ছিল যে তখন কেহ এদিকে সহজে আসিতে .পারিত না। এই সঙ্গে সে উৎকামন্দের আর একটি বিস্ময়জনক প্রাকৃতিক ঘটনার কথা কহিল—বলিল, "এখানে গরমের দিনে তুষার পড়ে।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে গরমের দিনটা কখন ? কি মাস ?" সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "ডিসেম্বর জানুয়ারি। তখন সূর্য্য সমস্তক্ষণ আকাশে থাকে, বৎসরের সমস্ত সময় অপেক্ষা রৌদ্র প্রচণ্ড, অথচ সন্ধ্যায় বরফ পড়ে—শীত বিষম।" আরো এক বিষয়ে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখি। ইংরাজ যত জংলি গাছ বটানিকাল গার্ডেনে আনিয়া মস্ত মস্ত লম্বা চওড়া নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়া বেশী বেশী দরে যে বিক্রয় করে ইহা তাহার অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অত্যন্ত হীন ছলনা মনে হয়। আমরা বটানিকাল গার্ডেনে গিয়া সেখানকার স্তরবিন্যস্ত কাননসজ্জা, ফুলের শোভা, তরুলতার বৈচিত্র্য, ফোয়ারার সুদৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ বিস্মিত হইতেছিলাম ; আর সে তাহার পরিচিত জংলি গাছে গাছে বড় বড় নাম লটকান দেখিয়া অসন্তোষজনক বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতেছিল, "Madam, they bring them all from jungle and only give a name and sale." লোকটা আসলে বেশ ভাল। পরিশ্রমী বিনয়ী ও বিশ্বাসী। সাধারণ

ভৃত্যশ্রেণীর মত নহে, বাজারের পয়সার মধ্যে সে কখনো লাভ রাখে না।

মাদ্রাজ অঞ্চলের ভৃত্যেরা প্রায় সকলেই ইংরাজিতে কথা কয়। কিন্তু এ ভাষা ইহাদেরই অদ্ভুত সৃষ্টি, কোন ইংরাজ নিজের ভাষা বলিয়া ইহা গ্রহণ করিবেন না। ইহাদের ইংরাজির একটি বিশেষত্ব, সমস্ত অতীত ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহাতে একটা done দেওয়া হয়। যেমন done eat : খাইয়াছে বা খাইয়াছি, done put—রাখিয়াছে বা রাখিয়াছি, ইত্যাদি। প্রথম প্রথম ইহাদের ভাষা বুঝিয়া লইতে অনেকটা কষ্ট পাইতে হইত, এখন একরকম দখল করিয়া লওয়া গিয়াছে। ইংরাজি ভাষাই যে ভবিষ্যতে ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে,— ইহাদের এই বিকৃত ইংরাজি শুনিলে তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হয়।

উৎকামন্দে বেশ একটি বাজার বাড়ী আছে। প্রতি শুক্রবারে সেখানে হাট বসে। রূপের হাটই সেদিন বিশেষ দর্শনীয়। অধিকাংশ ইংরাজ রমণী সেই দিন নিজে বাজার করিতে হাটে আসেন। এত অধিক না হউক, হ্রদের ধারেও প্রতিদিন এইরূপ রূপের মেলা দেখা যায়। প্রতি সকালে বিকালে, বিশেষতঃ বিকালে, অনেক ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ হ্রদ প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ুসেবন করেন। যেমন পদ্মের শোভা জলে, আর জলের শোভা পদ্মে ; তেমনি ইংরাজ ললনার রূপ পাহাড়ে, এবং পাহাড়ের রূপ ইংরাজ ললনায় একত্রে ফুটিয়া উঠে। এখানে ইংরাজ বৃদ্ধারও গণ্ডদেশ গোলাপ-লাবণ্যময়, যুবতী বা বালিকাদিগের ত' কথাই নাই। তদ্ব্যতীত নীলগিরিতে ইহাদের যত অধিক নিখুঁৎ সুন্দর মুখ দেখিতে পাই, এমন কলিকাতা দারজিলিং বা নইনিতালে দেখি নাই। যেন ইংলণ্ডকে শ্রীহীন করিয়া তাহার পরীসুন্দরীগণ ভারতবর্ষের এই রম্য নিকেতনে ক্রীড়া করিতে আসিয়াছেন। সেই ললিত লাবণ্যযুক্ত অতি সুশ্রী অতি ঢলঢল মুখগুলি দেখিলে যথার্থই চন্দ্রমাকেও নিরূপ বলিয়া মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সত্য এই উপলব্ধি করি, রমণী সুরূপা সুন্দরী দেখিলে আমরা যেরূপ মুগ্ধ হই, আমাদের সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, পুরুষ সুন্দর দেখিলে তাহা হয় না। কোন সুশ্রী পুরুষ দেখিলে একটু ভাল লাগে, মনে হয়, হাঁ বেশ দেখিতে—এইমাত্র ; কিন্তু সুন্দরী রমণী দেখিলে হৃদয়ে যেমনতর একটা আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠে তেমনতর কিছুই নহে। ভাবিয়া দেখিলাম ইহার কারণ মনুষ্য অন্তরে দ্বিবিধ সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আছে, বাহ্য সৌন্দর্য্যের এবং অন্তর সৌন্দর্য্যের, রূপের এবং গুণের। পুরুষে আমরা প্রধানতঃ গুণের অন্বেষণ করি, সুতরাং যতক্ষণ তাহাতে কোন গুণের পরিচয় না পাই ততক্ষণ কেবল-মাত্র রূপে আমরা তেমন প্রীতিলাভ করি না ; সংসারে পুরুষের রূপ প্রধানতঃ গুণে, আর স্ত্রীলোকের গুণ প্রধানতঃ

রূপেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ইহাই কি প্রাকৃতিক বিভাগ বিধান, অর্থাৎ, স্ত্রীলোকে রূপ এবং পুরুষে গুণ অধিক বলিয়াই কি পুরুষে গুণ এবং রমণীতে রূপ অধিকতর সম্মোহন, অথবা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে স্ত্রীলোক গুণের এবং পুরুষ রূপের সমধিক পক্ষপাতী?

হ্রদ সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত, ইহার জলরাশি স্থানে স্থানে প্রণালীর আকারে সঙ্কীর্ণ হইয়া আবার বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য ইহা গুচ্ছাকৃতি। হ্রদ আমাদের বাড়ীর কাছেই, আমরা প্রতিদিন প্রায় হ্রদের ধার দিয়া দূরে অদূরে গাড়ীতে পদব্রজে বেড়াইতে যাই; কিন্তু ইহার পূর্ব্বদিকে পাহাড় স্তূপের উপর যে একটি মন্দির আছে এ পর্য্যন্ত কোনদিন তাহা নজরে পড়ে নাই। একদিন হ্রদের ধার দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, দূর হইতে ঘন্টার শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্রমে নিকটে আসিয়া দেখিলাম আলাদিনের গুহার মত পাহাড়ের মধ্যে এক মন্দিরদ্বার উদঘাটিত, ভিতরে ঘন্টা বাজিতেছে। আমাদের দেখিয়া পূজক সন্ন্যাসী নামিয়া আসিয়া দেব-প্রসাদ ভস্ম ও লেবু উপহার দিলেন, তখন প্রত্যুপহার দিবার মত আমাদের নিকটে কিছুই ছিল না, সেজন্য তাঁহাকে গৃহে আসিতে বলিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম তাঁহার আর কেহই নাই, এখানে সম্বৎসর একাই থাকেন; পূজার প্রসাদ একাই উপভোগ করেন না, গ্রামের গরীব লোকদিগকেও দান করেন। মন্দির সংস্কার জন্য তিনি আপাততঃ টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

মন্দিরদেবের নাম মুনীশ্বর। ইহার মাহাত্ম্যে উৎকামন্দের লোকের অকাট্য বিশ্বাস। আমাদের একজন খৃষ্টান ভৃত্য (মহীশূর-রাজভৃত্য নহে) গল্প করিল, হ্রদের ধারে এই মন্দির ইংরাজের চক্ষুশূল হওয়ায় তাঁহারা ইহা ভগ্ন করিতে আদেশ দেন। কিন্তু দেবের এমনি মহিমা, ইঞ্জিনিয়র যে দিন মন্দির ভাঙ্গিবে সেই দিন হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল। দেবতার এইরূপ সাক্ষাৎ মহিমাদর্শনে গভর্ণমেন্টও ভীত হইয়া আদেশ প্রত্যাহৃত করিলেন। চাকরদের বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার ভূত হইয়া রাত্রে হ্রদের ধারে এখনো বেড়াইয়া বেড়ায়। এই ভৃত্য আমাদের একবার বড় জব্দ করিয়াছিল, সেই গল্পটি এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও হ্রদের ধার দিয়া প্রতিদিনই যাতায়াত করি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনদিন হ্রদ প্রদক্ষিণ করা ঘটে নাই। একদিন গাড়োয়ানটা বায়না লইয়াও আসিল না, আমরা ভাবিলাম এখন আর কি করা যায়, হ্রদটা প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফেরা যাউক। পাশ হইতে হ্রদের বেষ্টনদৈর্ঘ্য সামান্য বলিয়া মনে হয়, কেবল যেন শীতের দেশে একটুখানি সুখজনক পদপ্রসারণ স্থান মাত্র, এক মাইলও হয় কি না হয়। প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পার্শ্বান্তরে আসিয়া পড়িলাম, আমাদের অনুমানটি তখন আরো

ঠিক বলিয়া মনে হইল, যেন সমস্ত পথটাই এখনি ফুরাইল, এই বাঁকটি শেষ করিয়া আর একটি পাশে পড়িলেই এখনি হ্রদের সীমানা ছাড়াইব। এই ভাবিয়া বাঁক ঘুরিলাম, কিন্তু দেখিলাম এইখানেই শেষ নহে, সমুখে আর একটি বাঁক, তাহাও ঘুরিলাম, দেখিলাম আবার একটি, এইরূপে বাঁকের পর বাঁক ঘুরিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরিতে লাগিলাম ; প্রতিবারই মনে হইতে লাগিল এই বাঁকের শেষে প্রদক্ষিণ শেষ হইবে, প্রতিবারই দীর্ঘ বাঁকের পর দীর্ঘ বাঁক ধরিয়া গোলকধাঁধার চক্রে যেন ঘুরিতে লাগিলাম, পাশে একই ভাবে হ্রদের জল তল-তল ঢল-ঢল করিতে লাগিল ; তাহার অন্য পার্শ্বে আসিবার সম্ভাবনা ক্রমশই আমাদের মন হইতে তিরোহিত হইলে লাগিল। দুর্দ্দৈববশতঃ সেদিন আবার আমার সহচারিণীর পায়ে নূতন আট জুতা, নিতান্ত কষ্টেশ্রেষ্ঠে এক ক্রোশের উপর চলিয়া তিনি ত নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যকে তখন জিজ্ঞাসা করা গেল, আর কত পথ বাকী—সে বলিল, মাইল খানেক হইবে। শুনিয়া ত' চক্ষু স্থির, কিন্তু পদ স্থির করিবার উপায় কোথায় ! পথে গাড়ী ঘোড়ার অভাব নাই, কিন্তু তাহা মরুভূমে মরীচিকা মাত্র, একখানিও ভাড়াটিয়া গাড়ী নহে। হঠাৎ বুদ্ধি জোগাইল, চাকরকে বাড়ী হইতে জুতা আনিতে পাঠান যাউক, এখনো খানিকটা বেলা আছে, পাহাড়ী লোক ছুটিয়া গেলে আধ ঘন্টার মধ্যে—অন্ততঃ সন্ধ্যার আগে ফিরিতে পারিবে ; আমরা ততক্ষণ বাঁধের ধারে গিয়া অপেক্ষা করি। চাকরটার একটা মহৎ দোষ ছিল, একবার তাহাকে কোথাও পাঠাইলে সে শীঘ্র ফিরিত না। কিন্তু আজ আমাদের হুকুম পাইবামাত্র সে যেরূপ অশ্বের ন্যায় দীর্ঘ দ্রুতপদে মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল তাহাতে বিশ্বাস জন্মিল যে শীঘ্র ফিরিবার আবশ্যকতাটা নিদেনপক্ষে আজ সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। সে চলিয়া গেলে আমরা খানিকক্ষণ ঘাসের উপরে বসিয়া, পরে আস্তে আস্তে বাঁধের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নির্ঝরের মত নির্ঝর দৃশ্য উৎকামন্দে এই একটি ! দুই পাশে অন্ধকার পাহাড়ে অন্ধকার গাছপালা, মধ্যে জলাহত প্রণালী-গর্ভে ছোট বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ—হ্রদের জল বাঁধের উপর হইতে নিম্নে শতোচ্ছ্বাসে পড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ প্রবাহে [মন্থর] গতিতে কে জানে কোথায় বহিয়া যাইতেছিল, আর আমরা সেই গতির পাশে গতিহীন কাতরভাবে দাঁড়াইয়া গতির মাহাত্ম্য অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের হিন্দু দর্শনের সমস্ত সারতত্ত্ব মায়াবাদের প্রকৃত মর্ম্ম সেইখানে দাঁড়াইয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ, সেই দিন বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি, মায়া আর কিছুই নহে, গতিই সংসারে মায়া। এই জন্যই এক মুহূর্ত্তে যাহা আছে, অন্য মুহূর্ত্তে তাহা নাই। এমন কি, তোমার নিজের অস্তিত্বও তোমার নিকট সর্ব্বৈসর্ব্বা

অক্ষুণ্ণ সত্য নহে; আজ তোমার যা আছে, আজ তুমি যা আছ, কাল তাহা ঠিক থাকিবে কিনা সন্দেহ; আর একদিন যে বেঠিক হইয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়ই; কেননা তোমার অস্তিত্বেও গতি বহিতেছে। এই গতিই সংসারে মায়া, অথচ এই গতিতেই ইহার স্থিতি, অতএব এই মায়াতেই সংসার সত্য। অর্থাৎ, তুমি আজ যাহা আছ কাল তাহা থাকিবে না সত্য, কিন্তু তোমাতে যে গতি বর্ত্তমান তাহা সর্ব্বকালেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, গতিরূপে তুমি চিরবিরাজিত থাকিবে। অন্য কথায়, তোমার কিছুই চিরকাল একরূপ থাকিবে না; অথচ কিছুই বিনষ্ট হইবার নহে; অনন্তগতির চক্রে তুমি রূপান্তরিত হইয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং যাঁহারা মায়া ত্যাগ করিতে বলেন, তাঁহারাই নিতান্ত মায়া কথা বলেন। এই মায়াময় অর্থাৎ গতিময় সংসারে প্রকৃতপক্ষে তোমার অগতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কেবল গতিটা যাহাতে সুগতি হয় তাহাই মাত্র তোমার চেষ্টাসাধ্য, তাহাই মাত্র তোমার করণীয়। ইহাই বুঝিয়া সংসারের উন্নতিগতির চক্রে বুদ্ধিগতির পরিচালনে নিজের এবং অন্যের দুর্গতি দূর করিয়া সুগতিতে অগ্রসর হইয়া চল। আমার বিশ্বাস, এতদর্থেই শাস্ত্রীয় মায়াবাদীরা মায়া ত্যাগ করিতে বলেন। বাস্তবিকপক্ষে মায়াত্যাগের অর্থ সংসারকে অবহেলা বা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপদেশ নহে। কেননা তাহা তোমার সাধ্যাতীত। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তুমি সংসার হইতে আপনাকে লোপ করিতে পারিবে না, কেবল তোমার গতি দুর্ব্বল হইলে সবল দ্রুতবল গতির সমষ্টিভূত হইয়া রূপান্তরিত হইবে মাত্র।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর নিস্তব্ধভাবে এখানে দাঁড়াইয়া গতির মাহাত্ম্য চিন্তা করিবার অবসর রহিল না; দেখিলাম আমাদেরও গতির একান্ত আবশ্যক। সন্ধ্যা হয় হয়, গাড়ী ঘোড়া আর দেখা যায় না, দু একজন পদচারী ইংরাজ দুইটি অবলা বালাকে সেই সন্ধ্যাকালে বাঁধের ধারে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া অবাকনেত্রে চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে, ক্বচিৎ দু-একজন পাহাড়ী কাষ্ঠবোঝা বহন করিয়া কোনদিকে দৃকপাৎ না করিয়া হন হন করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। কি জানি এই কাষ্ঠের বোঝার নীচে যদি বা আমাদের ভৃত্যের মুখটি সহসা নজরে পড়িয়া যায়! আমরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের মুখে সেই সাদৃশ্য অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু হায়! সূর্য্যের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত গগন-প্রান্তে মিলাইয়া পড়িল, তথাপি আমাদের ভৃত্যের কোন চিহ্নই পাইলাম না। সহচারিণীর ক্লান্তি শ্রান্তি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বিপদের উপর বিপদ! কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলাম উপর নীচে দুইটি রাস্তা, মধ্যস্থলে লেখা ফার্ণহিল রোড। তাহার কোনটি ধরা যায়? আমার

পথজ্ঞান আদপে নাই, সুখের বিষয়, তাহা আমি জানিয়া সঙ্গিনীর জ্ঞানের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া আছি, তাঁহার উপর এমনি অগাধ বিশ্বাস, তিনি যদি হিমাচলের রাস্তা বলিয়া মলয়াচলের রাস্তায় লইয়া যাইতেন তাহাতেও আমি দ্বিধা করিতাম না। কিন্তু এই দ্বিমুখী রাস্তায় আসিয়া তিনিও যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন তখনি বিভ্রাট বাধিল ; আমার সেই অটল বিশ্বাসও তখন টলিয়া উঠিল, আমি তখন তাঁহারি হাতে পথনির্ণয়ের সম্পূর্ণ ভার রাখিতে সম্মত না হইয়া বেশ জোর করিয়া নিজেরও মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলাম। জীবনের এমন সুযোগটা কি ছাড়া যায়! কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর উপরের পথই ধরিয়া চলা গেল।

অন্ধকার পথে দুজনে একাকী চলিতেছি, একে সন্ধ্যা, তাহাতে পথের দুইদিকে গাছের শ্রেণীতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া সম্মুখের বস্তুকেও ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বুঝিতেছি বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছি ; কিন্তু অন্ধকারে তাহার দূরত্ব বা দিকনির্ণয় করা অসাধ্য। ভয়ও হইতেছে, দিকহারা হইবার ভয় তেমন নাই, মনে জানি বাড়ীতে কোনরকমে পৌঁছিব ; কিন্তু বেশী ঘুরিতে হইলে সহচারিণীর পায়ের দশা কি হইবে ; আর আমাদের এই দিকভ্রান্তির বিবরণ শুনিলে বাড়ীতেই বা না জানি কিরূপ সমাদর পাইব! এই ভয়, অথচ এই বিপদের মধ্যেও একটা ঔপন্যাসিক রস উপলব্ধি করিতেছি। সহসা পাশের একটা বাড়ীর আলোক নজরে পড়িল ; ভাবিলাম পথহারা পথিক রূপে উহাদের নিকট গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করা যাউক। উপন্যাস চূড়ান্ত হইবে ; পথ হারাইবার ভয়ও আর থাকিবে না। উদ্যানে প্রবেশ করিলাম, কেহ কোথাও নাই, দ্বারদেশে আসিয়া বন্ধ সারসির মধ্য দিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে সারি সারি অনেকগুলি চাঁদমুখের আলোক ফুটিয়াছে, তাঁহারা পিয়ানো বাজাইয়া গীতবাদ্য করিতেছেন। আমরা সেখান হইতে ঘুরিয়া গিয়া সদর দ্বারে আঘাত করিলাম, একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তাহাকে সংক্ষেপে বিপদের পরিচয় দিয়া একজন লোক সঙ্গে দিতে অনুরোধ করিলাম। সে গৃহকর্ত্রী বা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই মালীকে ডাকিয়া আমাদের সঙ্গে যাইতে বলিল। তাহার সৌজন্যে বিশেষ প্রীত হইয়া ধন্যবাদ সহকারে, আমরা মালীর অনুবর্ত্তী হইলাম। বাড়ীর কম্পাউন্ড ছাড়াইয়া রাস্তায় পড়িয়াই প্রায় দেখি ভৃত্যবর জুতা হস্তে হাজির। আনন্দের আতিশয্যে রাগটা কেমন তখন হঠাৎ পড়িয়া গেল। তাই মনের মত করিয়া আর বকা হইল না, তবুও দু দশ কথা তাহাকে যে শুনিতে না হইয়াছিল এমনো নহে। অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে ; এই কথাটা বোধ হয় একবারের বেশীও বলিয়া থাকিব। কিন্তু তাহাতে দেখিলাম সে লজ্জায় মরিয়া গেল না। ইহার

পর একটুখানি পথ গিয়াই দেখি, ডাইনে আমাদের গেট ; সত্যই বাড়ী আসিয়াছি। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম,—অহো ! গতির এ আবার কি বিচিত্র রহস্য ! নিকটের জিনিষ দূরে লইয়া যায়, আবার দূরের জিনিষ নিকটে আনিয়া ফেলে !

ভারতী, পৌষ ১৩০২

নীলগিরির টোডা জাতি

প্রথম যেদিন টোডা দেখিলাম মনে এক নূতনতর আনন্দ জন্মিল। মনুষ্যসমাজের সেই আদিম যুগ—যখন মানুষের বুদ্ধি অপরিস্ফুট, সুবিধা আরাম কৌশল স্বল্পায়ত্ত, পর্ব্বতগুহা বা সামান্য পর্ণকুটীরই তাহাদের নিবাসস্থল, মৃন্ময় ও লৌহ দ্রব্যাদিই তাহাদের কারুকার্য্য ও গৃহদ্রব্য, সমাজ নিয়ম অজটিল অথচ বিশৃঙ্খল, স্ত্রী পাওয়া সহজ নহে, বহু কষ্টে কোন পরিবার হইতে কোন এক নারী কাড়িয়া আনিতে পারিলে বহু ভ্রাতা মিলিয়া তাহাকে গ্রহণ করে,—এখনকার সভ্য সময়ে যে যুগের সমস্তই উপন্যাস কল্পনার বিষয় মাত্র, সে দিন তাহাই যেন চোখের সম্মুখে জ্বলজীবন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যে উপন্যাসে, অতীতে বর্ত্তমানে, নূতনে পুরাতনে, মনের মধ্যে মিশিয়া গিয়া, সমগ্র মনুষ্যজাতির বিস্ময়জনক পূর্ব্বাপর মহান্ একত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। আজিকার দিনের মনুষ্যজাতির শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক মহাবুদ্ধি, এবং প্রবলপ্রতাপ রাজা মহারাজা সকলেরি ছবি ইহাদিগের ক্যামারার মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত দেখিলাম।

আদিম অসভ্যজাতি শুনিয়া যদি কেহ মনে করেন ইহারা কাফ্রিদিগের মত ভীষণমূর্ত্তি, অথবা ভুটিয়াদিগের মত খর্ব্বনাসা, বিশাল-মাংসপেশী, তাহা হইলে ভুল করিবেন। ইহাদের চেহারায় অসভ্যত্ব, অনার্য্যত্ব বিশেষ কিছুই নাই। আর্য্যগণ সন্তুষ্ট হইবেন কিনা জানি না, অধিকাংশেরই গঠন আকৃতি তাঁহাদেরই বরঞ্চ অনুরূপ। ইহারা সুশ্রী, সুগঠিত, বলিষ্ঠকায় বলিয়া ইংরাজ বংশতত্ত্ববিদগণ ইহাদের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ইহাদের মূল ইতালীয় হইতে, কেহ বা ইহুদিজাতি হইতে, কেহ বা আরবজাতি হইতে টানিতে চেষ্টা করেন।

আমরা ইহাদের যতজনকে দেখিয়াছি তাহার মধ্যে টোডা পুরুষগণের মুখশ্রীই অধিকতর সুন্দর। এক একজনের ত একেবারে গ্রীক প্রস্তর-ছবির ন্যায় সৌম্যগঠন, বর্ণ কাহারও কাল নহে, বেশীর ভাগ শ্যাম; কেহ-কেহ সামান্য গৌরবর্ণ। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিতরে ঘাগরার ন্যায় কটীবদ্ধ বস্ত্র, একখানা লম্বা, আর আমরা যেমন করিয়া শাল জড়াই অনেকটা সেই

রকম ধরণে চাদর গলা হইতে পা পর্য্যন্ত জড়ান ; ঈষদ্দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ আস্কন্ধলম্বিত। এইরূপ বেশ বলিয়া যাহাদিগকে সুশ্রী দেখিতে তাহাদিগকে আরো ছবির মত দেখায়। ইংরাজ আসিবার আগে নাকি ইহারা নগ্ন থাকিত, গভর্ণমেন্টের আইনে এখন ইহারা কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা দূর অরণ্যে থাকে তাহাদেরও শুনিলাম এখন এইরূপ বেশ। নিতান্ত শিশুদিগকে ইহারা এই চাদরের মধ্যে বুকে করিয়া রাখে। যে সকল বালক-বালিকারা একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে তাহাদের কাহারো কাহারো গাত্রে ইংরাজি জ্যাকেট, ফ্রক দেখিলাম। টোডাগণ নোংরা বলিয়া তাহাদিগের একটা কুনাম আছে। মহীশূর রাজভৃত্য বলিয়াছিল—ইহারা ভাত খাইয়া মাথায় হাত মোছে। কিন্তু দেখিয়া তাহাদিগকে সেরূপ অপরিস্কার মনে হইল না ; এবং যখন জিজ্ঞাসা করা গেল, "তোমরা খাইয়া মাথায় হাত মোছ ?" তখন জিজ্ঞাসিত যুবতী ঘৃণার ভাবে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছি ছি ! আমরা হাত ধুই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা স্নান কর ?" সে বলিল, "হ্যাঁ, দুই একদিন অন্তর আমরা নদীতে গিয়া স্নান করি।" তাহাদের কাপড় যদিও পরিস্কার ধোপ নহে, কিন্তু নিতান্ত কাল কিটকিটেও নহে, কাপড় ধোবার বাড়ী না দিয়া জলে কাচিলে যেরূপ রং হয় সেই রকম। সাধারণতঃ যুবতীগণ বেশ ফিটফাট, সাজসজ্জার দিকে বিশেষ একটু মনোযোগী। সকলেরি সমুখের চুল বেশ পরিপাটী করিয়া আঁচড়ান, হাত মুখ দাঁত মার্জ্জিত পরিস্কার, কেহ কেহ কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত করিয়া মাথার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত সময়ে ঝুলাইয়া দিবে, কাহারো অলক দ্বিধাযুক্ত সীমন্তের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত। কি করিয়া তাহারা চুল কোঁকড়ায় আমরা দেখিতে চাহিলাম। একজন তাহার মাথার গুটান অলকগুচ্ছ খুলিয়া আবার আঙ্গুলে জড়াইয়া দেখাইয়া দিল। ইহাদের কাহারো কাহারো গাত্রে অল্পস্বল্প রৌপ্যালঙ্কার। উল্কিভূষাও ইহাদের দেখিলাম, কিন্তু অধিক নহে। চেহারায় না হউক, ইহাদের বাসস্থলে, আচারে ব্যবহারে অনার্য্যত্ব অসভ্যত্ব প্রত্যক্ষ। বাঙ্গলার সাঁওতাল, পশ্চিমের ভীল জাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে প্রায় তদনুরূপই হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু টোডাজাতির আদিমত্ব অল্পই পরিবর্ত্তিত দেখিলাম। তাহার প্রধান কারণ, অপেক্ষাকৃত অল্পদিন ইহারা সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে,—দ্বিতীয়তঃ, এখনো ইহারা বিজনবাসী। পারতপক্ষে ইহারা লোকালয়ে ঘেঁসিতে চাহে না ; যেখানে যেখানে অরণ্য সেই সেইখানে মাত্র ইহাদের বসতি। তাহাও সহরের কাছাকাছি অরণ্যে অল্প টোডারই বাস। সুদূর উচ্চ নিভৃত অরণ্য—যেখানে লোকালয়ের সহিত কোন যোগ নাই, উৎকামন্দ সহর হইবার পর অধিকাংশ টোডা সেই সকল স্থানে পলায়ন করিয়াছে। কখনো কখনো তাহাদের কেহ দ্রব্যাদির

বিনিময়ে লবণ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যাদি লইবার জন্য মাত্র সহরে আসে।

উৎকামন্দের চারিদিকেই সোলা, আমরা কেবল ফার্ণহিল ও সুলতান সোলায় গিয়াছিলাম, উভয় স্থলেই টোডার বাস দেখিলাম। নিভৃত অরণ্যপ্রান্তের মুক্ত প্রশস্ত বিজন স্থলে কাছাকাছি তিন চারিখানি কুটীর, ইহাই এক এক অরণ্যের টোডাপাড়া। এমন এক একটি পাড়ায় স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে মিলিয়া ২০/২৫ জন টোডার বাস, আর সেই অতি ক্ষুদ্র তিন চারিখানি কুটীরই সেই সমগ্র ২০/২৫ জনের রাত্রিকালের আশ্রয়স্থল। কুটীরের আকার ধনুকাকৃতি, তিন দিক বন্ধ, একদিক একটুখানি খোলা ; একেবারে গুড়িসুড়ি না মারিয়া সেই অতিনিম্ন দ্বারপথে গৃহপ্রবেশ করা যায় না। দ্বারের কাছে বসিয়াও মাথা নীচু করিয়া উঁকি মারিয়া তবে গৃহমধ্য আমাদের নজরে পড়িল। কুটীর মধ্যে একদিকে একটুখানি রোয়াক, তাহাই শয়নস্থল, অন্যদিকে উনুনের কাছে বাসন কোসন প্রভৃতি সাজান। এমন তিন চারি দল স্বামী স্ত্রী কিম্বা বিবাহিত অবিবাহিত দল মিলিয়া একসঙ্গে সেই রোয়াকে শয়ন করে।

মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রাদি প্রস্তুত কৌশল অনাবিস্কৃত ছিল—যখন কুটীর নির্ম্মাণ সহজ ছিল না, তখনকার কালে শীত নিবারণের জন্য এরূপ একত্র শয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভ্যতার সুবিধার এত সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা সেই হীন আদিম প্রথা এখনো রক্ষা করিতেছে দেখিয়া বড় একটা অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতেছিল এই প্রথার ত্যাগ তাহাদের পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক সুখজনক তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই। আমরা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেই যেন তাহারা এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিবে ! কিন্তু বুঝাই কিরূপে ? তাহাদের ভাষা জানি না—তাহারাও হিন্দুস্থানী বোঝে না ; মহীশূর-রাজভৃত্য আমাদের মধ্যস্থ, আমরা সামান্য যে সকল প্রশ্ন করিতেছি তাহাই সে ঠিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে কিনা বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছিল। তথাপি আমরা এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলাম না। তাহাতে উত্তর পাইলাম, এ নিয়ম তাহাদের ভাঙ্গিবার নয়। এমন কি যদি এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় ৮/১০ জন অতিথি আসিয়া কিছুদিন বাস করে তাহা হইলে উভয় দলই এই কয়খানি কুটীরের মধ্যে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে—তথাপি স্বতন্ত্র বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবে না।

সুখের বিষয়, তাহাদের বিবাহপ্রথাও এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় অভঙ্গনীয় জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে এখনো আলিঙ্গিত নহে। সমস্ত ভ্রাতার এক স্ত্রী গ্রহণ করাই ইহাদের জাতিগত নিয়ম, কিন্তু দুই অরণ্যের মধ্যে কোন রমণীরই একাধিক স্বামী দেখিলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, "না, এখন সকল ভ্রাতাই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করে", সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে আমাদের দেখাইয়া

দিল। মহীশূর-রাজ্যের এক বর্গা অর্দ্ধ-বৃদ্ধ কুলি সরদার আছে, তাহার কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, "মিছে কথা বলিতেছে। উহাদের দেখাদেখি আমাদের মধ্যেও ঐ প্রথার চলতি হইয়াছে, এই আমরা কয় ভ্রাতাতে এক স্ত্রী বিবাহ করিয়াছি, আর ইহাদের কাহারো সেরূপ নাই—এও কি কখনো হয়! মিথ্যা বলিতেছে।"

যে টোডা পুরুষ আমাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেছিল, সে এই কথা শুনিয়া লজ্জিতভাবে বলিল, "আগে ঐরূপ হইত বটে, এখন কিন্তু আর সেরূপ হয় না।"

বর্গার কথা যদিই বা সত্য হয়, এখনো টোডাদিগের পূর্ব্ব বিবাহপ্রথা যদি বা পূর্ণলোপ না হইয়া থাকে, তথাপি এ কথায় তাহারা যে লজ্জা পাইতে শিখিয়াছে ইহাই যথেষ্ট শুভ লক্ষণ!

প্রত্যেক টোডা পাড়ায় বাসকুটীর কয়খানি হইতে দূরে একখানি করিয়া শূন্য কুটীর থাকে। ইহা টোডাদিগের দেবস্থান। দেবস্থান শুনিয়া ভাবিলাম, ইহার মধ্যে বুঝি বা ইহাদের পূজনীয় কোন প্রস্তর বা কাষ্ঠমূর্ত্তি আছে। কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, এইখানে ইহারা মহিষ দুগ্ধ আনিয়া মাখন ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। ইহাই দেবপূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পুরুষেরই কার্য্য।

ফার্ণহিল সোলার দেবস্থানের কাছে আসিয়া আমরা ভিতর হইতে একটা ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের সঙ্গের একজন টোডা চীৎকার করিয়া কি বলিল ; তৎক্ষণাৎ কৌপিনধারী এক টোডা যুবা দেবস্থানের দ্বারদেশে দেহ মস্তক অবনত করিয়া উঁকি মারিল। সে ভিতরে মাখন করিতেছিল। আমরা মাখন তুলিবার যন্ত্র দেখিতে চাওয়ায় সে তাহার ঘোলমন্থনি আনিয়া আমাদের দেখাইল।

দেবস্থানের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "যেখানে হারিয়া ডারিস, অর্থাৎ ঈশ্বর থাকেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঈশ্বর কে ?"

উত্তর। যিনি এ সব সৃষ্টি করেছেন।

জিজ্ঞাসা। তিনি কি ঐখানে থাকেন ?

উত্তর। আমাদের পূজা লইতে ঐখানে তিনি আসেন। দুধ ঘিতে তিনি সন্তুষ্ট।

এ সকল কথা তাহারা কতদূর কি বলিল, আর আমরাই বা মহীশূর-ভৃত্যের নিকট কতদূর বা পরিবর্ত্তিত আকারে শুনিলাম—তাহা কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

ইহাদের সকলেরি অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ দরিদ্র নহে। ২৫/৩০/৪০/৫০ করিয়া এক একজনের মহিষ আছে, তাহা হইতে ইহারা প্রচুর ঘৃত-মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন টোডার মহিষ মরিয়া যায়, তবে অন্য টোডারা নিজেদের মধ্য হইতে দুই একটি করিয়া দান করিয়া তাহার মহিষ-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহিষ রাখিতেও ইহাদের কোন খরচ নাই, তাহারা সমস্ত দিন পাহাড়ে চরিয়া খায়, আর বিকালে টোডা রমণীর ডাকে কুটীর-সন্নিধানে আসিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দেয়—তাহার পর রাত্রে কুটীরের কাছাকাছি যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে। মহিষগণ ক্ষুদ্র টোডাবালকের হস্তেও পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু সহরের লোকের পক্ষে ইহারা ভয়ানক। যে পাহাড়ে মহিষ চরে সেখানে কেহ আসিতে চাহে না। বিশেষত, ইংরাজ ঘোড়-সওয়ার দেখিলে ইহারা মহা ক্ষেপিয়া আক্রমণ করে। মহিষ ঘৃত দুগ্ধাদি বা বাসস্থানের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেন্টকেও ইহাদের কোন কর দিতে হয় না। ইংরাজ নীলগিরি লইবার আগে এ স্থান ইহাদের ভোগদখলে ছিল বলিয়া গভর্ণমেন্ট ইহাদের অধিকার মানিয়া চলেন, বাস অরণ্যভূমি কতকাংশ করিয়া তাহারা একেবারে নিষ্কর দান পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিক্রয়াধিকার নাই।

ইহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা, গভর্ণমেন্টের ইহাদের প্রতি এত অনুগ্রহ, আবশ্যকের অধিক ইহাদের উপার্জ্জন, তথাপি ইহাদের সন্তানাদি নিতান্ত অল্প। Survival of the fittest এখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। প্রতি অরণ্যে ২০/২৫ জনের বেশী টোডা নাই, দূর অরণ্যেও শুনিলাম টোডার সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। টোডারা অত্যন্ত অলস। স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্য, এবং পুরুষের ঘৃতাদি প্রস্তুত ও বাজারের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। ইহারা কৃষিকার্য্য সহজেই করিতে পারে, কিন্তু তাহা করে না ; চাকরী করা ত নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞান করে। আসল কথা, ইহাদের অন্য কোন কাজের আবশ্যক নাই। ঘৃত বিক্রয়ে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে বেশ বাবুগিরি করিয়া থাকিতে পারে—দুঃখের বিষয়, ইহারা বাবুগিরি করিতে জানে না, অর্থের প্রকৃত ব্যবহার এখনো ইহাদের নিকট অজ্ঞাত। অন্য সভ্যতর জাতি ইহাদের মত স্বচ্ছল অবস্থায় যেরূপ আয়াস আরাম সুবিধা কিনিতে পারিত—ইহারা উপায় সত্ত্বেও তাহা করে না। বন্য ফলমূল দুধই ইহাদের প্রধান আহার। গোধূম চাল আলুও আজকাল ইহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাছ মাংস ইহারা খায় না, অন্যান্য তরীতরকারী মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সহর হইতে যাহা সহজেই পাইতে পারে—তাহাও তাহারা দৈবাৎ কেনে।

ফার্ণহিল পাড়ায় দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক একখানা লম্বা ভাঙ্গা পাথরের

সিল করিয়াছে, আর তাহার উপর একটা মোটা পাথরের টুকরা রাখিয়া তাহাই নোড়া করিয়া গম পিষিতেছে। সহর এত কাছে, সেখান হইতে একটা যাঁতা আনিলেই আটা করিবার কত বেশী সুবিধা হয়—কিন্তু সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই।

নূতন আয়েসের মধ্যে তামাক ও নস্যের আয়েস তাহারা বুঝিয়াছে, আর বুঝিয়াছে ভিক্ষার আয়েস। দাস্যবৃত্তি তাহারা অপমানজনক জ্ঞান করে—কিন্তু ভিক্ষায় তাহাদের অপমান নাই। মেমসাহেবেরা তাহাদিগকে দেখিতে গেলেই তাহারা বক্‌সিস বৃপ কর চাহে। আমাদিগের নিকটেও অবশ্য চাহিল, আমরা কিন্তু তখন তাহাদিগকে কিছু না দিয়া পরদিন বাড়ী আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম। তাহাদের নৃত্যগীতের পরিচয় লওয়াটাই অভিপ্রায়।

পরদিন উভয় অরণ্য প্রায় খালি করিয়া আমাদের বাড়ীতে দলে দলে টোডা স্ত্রী পুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত। আগে তাহাদিগের বাসস্থলে দেখি নাই এমন দুই চারিটি নূতন মুখও দেখিলাম, তাহারা শুনিলাম সেদিন সহরে গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন যুবা চমৎকার সুশ্রী দেখিতে। বর্ণ গৌর, সুন্দর সুদীর্ঘ দেহ, সুঠাম উন্নত নাসা, আয়ত চক্ষু, কেশহীন চারু অধরোষ্ঠ, ঈষৎ লম্বিত চিবুক, সুশ্রী ললাটের উপর সুগঠিত মস্তকে কুঞ্চিত কেশরাশি দ্বিধাবিভক্তভাবে আলম্বিত, এবং পূর্ব্বোক্ত ছবির মত সুদীর্ঘ বস্ত্রে অঙ্গাবরিত ; যেন আপলোর ছবি মূর্ত্তিমন্ত। তাহার একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেশে পাঠাইতে ভারী ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সুবিধা হইয়া উঠিল না। তাহার বাপও বেশ দেখিতে, তবে এখন বুড় হইয়াছে আর রং অমন পরিষ্কার নহে। ইহার মাকে আমরা দেখি নাই, সম্ভবতঃ মায়ের রং পাইয়া থাকিবে। শুনিয়াছি এক একজন টোডা রমণীর রং হাতীর দাঁতের মত নাকি ধবধবে, এবং চমৎকার সুশ্রী মুখ ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা টোডা নারীদিগের মধ্যে কাহারও তেমন মোহিনী মূর্ত্তি দেখি নাই। অন্য সোলায় যাইলে হয়ত দেখিতে পাইতাম।

টোডার নাচ বড় অদ্ভুত। স্ত্রীলোকে নাচে যোগ দেয় না। ৭/৮ জন পুরুষ মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়ায়, দাঁড়াইয়া ও-হাউ-হাউ ও-হাউ-হাউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তালে তালে একসঙ্গে পা ফেলিয়া ফেলিয়া ঘুরিতে থাকে। আসল কথা, ইহা আনন্দ নৃত্য নহে—মৃত্যুৎসব। কেহ মরিলে তাহারা মৃতব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে—প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া উক্তরূপে শব বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরস্তব করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন মৃতব্যক্তি স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার স্বকুটীরে সমস্ত তৈজস অলঙ্কার দ্রব্যাদির সহিত দগ্ধীকৃত হয়। অধুনা এ

প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটীর ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মসাৎ না করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবদাহ করা হয়, এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া দুই-একখানি করিয়া তৈজসপত্রাদি যাহা দান করে তাহাই মৃতব্যক্তির সহিত পোড়ান হয়।

শবদাহ হইয়া গেলে যুবা পুরুষেরা শড়কি দিয়া ৮/১০টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা নারীগণ সুর করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই তাহাদের গান। ইহাদের মেয়েরা যেমন নাচে না, পুরুষেরা তেমনি গাহে না। আমরা গাহিতে বলায় মেয়েরা গালে হাত দিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে বসিল, আর টক খাইতে খাইতে বা বেশী শীত লাগিলে যেমন লোকে মুখে হি হি শব্দ করে—কান্নার সুরের মাঝে মাঝে সেইরূপ হি হি করিতে লাগিল। ইহাই টোডাদিগের নৃত্যগীত। টোডা নারীরা মহিষদিগকে মাঠ হইতে গৃহে আহ্বানকালে এইরূপ সুর করিয়া ডাকে। ইহারা মাছ মাংস খায় না, সুতরাং মহিষ-বধ মৃত্যুভোজের জন্য নহে। আমার মনে হয়, মৃতব্যক্তি লোকান্তরে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে এই বিশ্বাসে—তাহার সঙ্গে তাহার কুটীর তৈজসপত্র মহিষ প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, মরিলে কি হয়? উত্তর পাইলাম, "ওবুনরে (মহালোক) যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূত বিশ্বাস কর?"

উত্তর, "না, আমরা জঙ্গলে থাকি, কখনো ভূত দেখি নাই ; ভূত বিশ্বাস করি না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মৃত আত্মাকে পূজা কর?"

উত্তর। "না, একবার মরিয়া গেলে তাহার কথা আর আমরা ভাবি না।"

এই মৃত্যুৎসব ছাড়া আর কোনরূপ উৎসব ইহাদের নাই। এমন কি বিবাহও ইহাদের পর্ব্বদিন নহে। বিবাহে কোন আমোদ প্রমোদ হয় না। বাপ মায়ে স্থির করে যে আমার কন্যার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিব, সেই স্থির করাকেই তাহারা বিবাহ বলে। তাহার পরে কোন এক সময়ে কন্যা স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—স্ত্রী পুরুষে পছন্দ করে বিবাহ করে, না বাপ মা তাহাদের বিবাহ দেয়?

বলিল—"বাপ মা।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত বয়সে তাহাদের বিবাহ হয়?"

বলিল—স্ত্রীলোকের ৩/৪ বছর বয়সে, পুরুষের কিছু বেশী ৮/১০ বছর।

বিবাহে আমোদ হয়?

বলিল—"না। বাপের বাড়ী থেকে বড় হলে স্বামীর কাছে যায় মাত্র।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা ছেলে হইলে সন্তুষ্ট হও না মেয়ে হইলে ?

উত্তর। ছেলে হইলে।

জি। কে বিষয় পায় ?

উত্তর। ছেলে।

এ সকল প্রথা কতদূর তাহাদের নিজের, কতদূর এখন গ্রহণ করিয়াছে বোঝা গেল না।

সেদিন নাচগানের শেষে তাহাদের মুড়ি নারকেল মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে আতিথ্যদান করিয়া ও নগদ মুদ্রা কিছু দক্ষিণা দিয়া বিদায় করা গেল।

টোডাদিগের নাচ দেখিলাম। বর্গাকুলিরা ধরিয়া পড়িল, আমাদেরও নাচ দেখিতে হইবে। একদিন তাহারাও দলে দলে আসিয়া হাজির। ইহাদের নাচগান নাচগানের মত বটে। বৈষ্ণবেরা যেমন হাত তুলিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নাচে, অনেকটা সেই রকম। গানেরও সুর আছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক বাজায়। নিজেদের নাচ শেষ করিয়া ইহারা টোডাদের নাচও নাচিল। বর্গা স্ত্রীলোকেরা নাচগান করে না, সাধারণ ভারতনারীর মত ইহা তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয়। একখানা ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম টোডারা বর্গাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করে, বর্গারাও আপনাদিগকে নীচু জ্ঞানে টোডাদিগকে মান্য করিয়া চলে ; কিন্তু মহীশূরভৃত্য অন্যরূপ জানাইল—বলিল, টোডাগণ বর্গাদিগকে উচ্চজাতি ভাবিয়া সম্মান প্রদান করে। আমরাও দেখিলাম, আমাদের বাড়ীতে টোডাগণ বর্গা সরদারের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। টোডারা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়, বর্গা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। টোডাগণ নিজেদের মধ্যে মাথায় পা তুলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

নীলগিরিতে কোটা কুড়ুম্বা ইরুলা প্রভৃতি নামে আরো কয়েক জাতি পাহাড়ি আছে। ইহাদের মধ্যে কুড়ুম্বারা যাদুকর বলিয়া খ্যাত। ইহারা সহর হইতে দূরস্থিত অরণ্যে বাস করে। বর্গারা ইহাদের অত্যন্ত ভয় করে, বর্গা কেন, এ দেশের অন্যান্য অশিক্ষিত লোকেও ইহাদিগকে ভয় পায়, কেবল টোডারা ভয় করে না। মহীশূর-ভৃত্যের নিকট গল্প শুনিলাম, কুড়ুম্বাজাতির পশু বানাইবার ক্ষমতা আছে, নিজেরাও বাঘ প্রভৃতির বেশ ধরিয়া লোককে ভয় দেখায়। আর ভিক্ষা চাহিলে যদি কেহ ভিক্ষা না দেয় ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পশু বানাইয়া ফেলে। এইরূপ মানুষ-পশুর কেবল লেজ থাকে না ; তাহা হইলেই বোঝা যায় সে যাদুপ্রাপ্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি কখনো এরূপ মানুষ-পশু দেখিয়াছ ?" সে বলিল, "দেখি নাই বটে ; কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে ; সত্যই কুড়ুম্বারা এরূপ করিয়া থাকে।" দেখিলাম তাহার বিশ্বাস আমাদের কথায় ভাঙ্গিবার নহে।

নীলগিরির অনেক স্থলে ঘেঁসাঘেঁসি পাহাড়ে পুরাতন সমাধি স্তূপ দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার কোনটাই প্রায় খুঁড়িতেই বাকী রাখেন নাই। খুঁড়িয়া ইহার মধ্যে যে সকল দগ্ধ পিত্তলপাত্র, অস্ত্র, পশু ও মনুষ্যের মৃন্মূর্ত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, সকলই তাঁহারা লুঠ করিয়াছেন, এমন কি অঙ্গার পর্য্যন্ত। অনেক মূর্ত্তি তাতার উষ্ণীষধারী। কোন কোন মতে এই সকল মূর্ত্তি টোডাদিগের সাইথিয় পূর্ব্বপুরুষদিগের। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপত্তি এই, টোডাগণ নিজেদের বিজাতীয় উৎপত্তি স্বীকার করে না, স্থানীয় নিবাসী বলে; দ্বিতীয়তঃ, এই সকল সমাধিও তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বলিয়া মানে না, সেই জন্য অবাধে খনন ও লুণ্ঠন করিতে দেয়। টোডাদিগের এবং অন্যান্য পাহাড়িদিগের মতে পাণ্ডিয়া বংশ বহু পূর্ব্বে নীলগিরিতে রাজ্য করিতেন, এ সকল সমাধি তাঁহাদিগেরই। নীলগিরির পুরাতন গভীর জঙ্গলের মধ্যেও স্থানে স্থানে যেরূপ ভগ্নাবশেষ দুর্গ-চিহ্ন এবং দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় এবং তৎসংলগ্ন দেব ঋষি ও রাক্ষসের গল্প শুনা যায়, তাহাতে বহুপূর্ব্বে ইহা যে আর্য্যদিগের নিবাস-ভূমি ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সম্ভবত পাণ্ডুবংশোদ্ভবেরা এখানে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডিয়া নামে খ্যাত।

ভারতী, মাঘ ১৩০২

অভিভাষণ

সে আজ অনেকদিনের কথা, আমার একজন বান্ধবীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, একটি ছেলে তার মা ও মাসীর কাছে দাঁড়াইয়া আছে। মাসী যিনি, তিনি পরমা সুন্দরী। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "দুজনের মধ্যে কে বেশী সুন্দর বল দেখি?" সে মায়ের দিকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা!"

আজ এই সভানেত্রীর আসনে বসিয়া, সেই কথাটি আমার বড় মনে পড়িতেছে। এত সুযোগ্য বিদ্বজ্জন থাকিতে আমি যে এ সম্মান-আসনে বরিত হইলাম, দেশসন্তানগণের এই শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ সমাদরে, হৃদয় আনন্দ কৃতজ্ঞতায় অভিভূত! যদি ভাবনিরুদ্ধ ভাষার মধ্য দিয়া, এই স্নেহকৃতজ্ঞতার আবেগধারা সমবেত আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণেও স্পর্শ করিতে পারে, তবেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব!

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আমার অভিভাষণের প্রধান কথা; তাহা ছাড়া বড় কিছু ত বলিবার দেখি না। ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলন সভায় বড় বড় পণ্ডিতগণ যেরূপ অভিভাষণ দিয়া গিয়াছেন, আমার এমন কিছু ক্ষমতা নাই যে, তাহার উপর আর কিছু নূতন কথা বলিতে পারি; তবে সিংহাসনের মাহাত্ম্য রক্ষাকল্পে নূতন কিছু বলিতে না পারিলেও, পুরোনো কিছু অন্ততঃ বলিতেই হইবে। প্রবীণের রূপকথা ছাইভস্ম হইলেও চিরদিনই নবীনের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে,—এই কথা মনে রাখিয়া আমিও এই অসম-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে, সাহিত্য-সম্মিলন-অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বাংলার যে কতকগুলি প্রাচীন গৌরবকথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাংলার নারী-গৌরবের কোন উল্লেখ নাই। অথচ বঙ্গরমণীর দয়াদাক্ষিণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও—বাংলার সতী, বাংলার বালবিধবা নারী তাঁহাদের অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ-মহিমায় বিশ্ববরেণ্যা। এমন কি, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে বিধবাগণের নির্জলা একাদশীর প্রথা দেখা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে এ বিষয়

উল্লেখ করেন নাই জানি না ; — হয়ত বা বাংলার বিধিব্যবস্থাকারগণের এরূপ নির্ম্মল কাপুরুষত্ব লোকচক্ষে ধরিতে তিনি কষ্টবোধ করিয়াছেন।

যাহা হউক, তাঁহার এই নীরবতা আমার অদ্যকার অভিভাষণে ভাষা দিয়াছে। তবে তিনি যে কথা গোপন করিয়াছেন, আমি সে কথার উত্থাপন করিতে চাহি না। সাহিত্যাসনে বসিয়া আজ আমি, কেবল বঙ্গনারীর কথা নহে, সমগ্র ভারতনারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রভাব কিরূপ বিস্তার করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে যথাসম্ভব ধারাবাহিকক্রমে দু-এক কথা বলিব।

আমার পরম স্নেহভাজন আত্মীয় ঁমণিলাল গাঙ্গুলী তাঁহার "ভারতীয় বিদুষী" নামক গ্রন্থে, পুরাকালের রমণীগণের পাণ্ডিত্য, সাধারণ নর-নারীর জ্ঞানগোচর করিয়া একটি খুব বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন ; এজন্য সমগ্র ভারত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। আমি আজ তাঁহারই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া আমার অভিভাষণের প্রারম্ভ অংশ রচনা করিতেছি।

পণ্ডিতপ্রবর জাহ্নবীচরণ ভৌমিক প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে আমি এই প্রবন্ধোক্ত প্রাচীন অব্দ— প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়াছি।

ভারতে বৈদিক যুগ

এখনও অনেকের মুখে শুনা যায় যে, রমণীর বেদপাঠে অধিকার নাই ; কিন্তু বেদোপনিষদে যাঁহাদের সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারাও জানেন ইহা কিরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস। সভ্যতার সেই আদর্শ যুগে "কন্যাপ্যেবম্ পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতি যত্নতঃ" — এই প্রবচন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত। তপোবনে ঋষিবালকের পার্শ্বে ঋষিবালিকাও বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। হোমকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঋষিগণের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের মাতা, ভগিনী, পত্নী, কন্যা, কণ্ঠে-কণ্ঠ মিলাইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন ; কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বেদমন্ত্র রচনাও করিতেন। ঋগ্‌বেদসংহিতার বহু সূক্ত রমণীগণের রচিত। বিশ্ববারা, বাক্, লোপামুদ্রা, সূর্য্যা, অপালা, যামিদেবী, শাশ্বতী, উর্ব্বশী, ঘোষা এবং আরও অনেকেই ঋগ্বেদের বহুসংখ্যক সূক্ত প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত অনেক মন্ত্র, কাহার প্রণীত তাহা না জানিয়াও আমরা দৈনিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করি। নিম্নে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিশ্ববারা, ঋগ্বেদসংহিতায় পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করিয়াছেন। তাহা ভাষা-মাধুর্য্যে এবং ভাব-সম্পদে অতুলনীয়। সে সূক্তের ভাবার্থ এই,— "প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তেজ বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে দীপ্তি পাইতেছেন। দেবার্চ্চনারতা ঘৃতপাত্র সংযুক্তা বিশ্ববারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য

বিস্তার কর এবং হব্যদাতার মঙ্গলবিধানের জন্য তাহার নিকট প্রকাশিত হও"—ইত্যাদি।

ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু বেদের দেবতা। সেই দেবতাদেরও দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র সকলেই তাঁহার ইচ্ছায় চালিত, প্রভাবিত, নিজ নিজ কর্ম্মে রত। তাঁহারই আজ্ঞায় সূর্য্য তাপদান করেন, মেঘ বারিবর্ষণ করেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন, বায়ু প্রবাহিত হন। সেই বিশ্ববিধাতা পরম কারুণিক পরব্রহ্ম, জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় দুইই। যিনি তাঁহাকে জানিয়াছি বলেন, তিনি জানেন না; যিনি বলেন জানি না, তিনিই জানেন।

এই সরল সহজ ধর্ম্ম, একদিকে যেমন সত্য — অন্যদিকে তেমনই কবিত্বপূর্ণ। এই ধর্ম্ম ভারতের আদি ধর্ম্ম, এবং পৌত্তলিকতার মধ্যেও এই ধর্ম্মই ভারতের অস্থিমজ্জায় অন্তঃশিলাপ্রবাহে প্রবাহিত। যদি তুমি একজন প্রস্তরখণ্ড পূজারত কৃষককে বল, তুমি জড় পদার্থকে কেন পূজা করিতেছ? —সেও বলিবে, আমি ইহার মধ্যে সেই ভগবানকেই পূজা করিতেছি।

ঋগ্বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটি মন্ত্র বাক্‌দেবীর রচনা।

আমাদের দেশে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে যে চণ্ডীমাহাত্ম্যম্‌ গীত হইয়া থাকে, ঐ আট মন্ত্রের ভাব লইয়াই তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত। আমরা জানি যে, মাহাত্ম্য শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক, কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদ প্রচারের বহুপূর্ব্বে বাক্‌ অদ্বৈতবাদের মূলমন্ত্রটি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তপোবন-বিহারিণী ঋষিকন্যারই মনে সর্ব্বাগ্রে "ব্রহ্মময় জগৎ — জগৎই ব্রহ্ম" এই ভাবটি প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহা নারীজাতির পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। যে সত্যের উপর নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্য বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্মের কবল হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উদ্ধার করেন, সে সত্যের স্রষ্টা বাক্‌দেবী!

সূর্য্যাপ্রণীত সূক্তগুলি বরবধূর প্রতি আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা-জ্ঞাপক। তাহা একাধারে উপদেশ ও কাব্য। সূর্য্যা লিখিতেছেন—"এই কন্যারূপ পবিত্র পুষ্পটি পিতৃকুলরূপ বৃক্ষ হইতে তুলিয়া পতির হস্তে গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে ইন্দ্র, এই কন্যা যেন সৌভাগ্যবতী হয়। হে বধূ, তোমার নেত্রদ্বয় যেন নির্ম্মল হয়, তুমি পতির কল্যাণদায়িনী হও, তোমার মন যেন সদাপ্রফুল্ল থাকে — দেহ লাবণ্যময় হয় — দেবতার প্রতি তোমার ভক্তি যেন অচলা থাকে।" ইত্যাদি।

দার্শনিক যুগ

বৈদিক যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের অভ্যুদয়। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি দার্শনিক নারীগণ এ যুগের গৌরবস্বরূপা। জ্ঞানবুদ্ধিতে ইঁহারা পণ্ডিতদিগেরও

অগ্রগণ্যা। বৃহদারণ্যক গ্রন্থের বহু পৃষ্ঠা মৈত্রেয়ীর রচিত। তিনি পণ্ডিতপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। "অসতোমাসদ্গময় তমসোমাজ্যোতির্গময়" এই অমৃতময় প্রার্থনাবাণী একটি নারীকণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল।

মৈত্রেয়ী অপেক্ষাও বিদুষী ছিলেন আর একজন নারী। তিনি মৈত্রেয়ীরই আত্মীয়া। কোন একটি শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইলে রাজর্ষি জনক, বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিতেন। এই উপলক্ষে পণ্ডিতা রমণীগণও আমন্ত্রিতা হইয়া পুরুষের সহিত সমকক্ষভাবে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ একটি যজ্ঞে, দানের জন্য এক সহস্র গাভীর শৃঙ্গে দশটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যজ্ঞান্তে রাজা বলিলেন — "আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, এই স্বর্ণমুদ্রাসহ সহস্র গাভী তাঁহারই প্রাপ্য।" এই বাক্যে যখন কেহই দান গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, তখন পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের এই ধৃষ্টতা এক নারীর অসহ্য বোধ হইল। তিনি উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে চাহিয়া তেজোগর্ভ স্বরে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমিই কি এই জনারণ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী?" যাজ্ঞবল্ক্য দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ।" রমণী বলিলেন, "আচ্ছা, শুধু কথায় হইবে না — তাহার প্রমাণ চাই।" তখন এক মহাতর্কের সূচনা হইল। রমণী যাজ্ঞবল্ক্যকে নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কত কূটতর্ক উত্থাপিত হইল। ব্রাহ্মণকুমারীর প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্ধ হইতে লাগিলেন — সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী সে তর্ক বিস্ময়ের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সভায় সমকণ্ঠে ধন্য ধন্য রব উঠিল। এই নারীই গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর এই তর্ক উপনিষদের একটি প্রধান বিষয়। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম নহে — একটি নূতন ধর্ম্ম। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা বেদোপনিষদ-প্রতিপাদ্য বহু পুরাতন আর্য্যধর্ম্ম। উপনিষদ ঋগ্বেদের পরে রচিত।

পরবর্ত্তী সময়ে দেবহূতি, আত্রেয়ী, লীলাবতী, খনা, ভারতীদেবী প্রভৃতি অনেকেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

খনা ও লীলাবতীর নাম জানেন না, এমন লোক কেহ আমাদের দেশে নাই। উভয়েই গণিতশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। কথিত আছে, লীলাবতী গণিয়া গাছের পাতার সংখ্যা বলিয়া দিতেন। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ যখন জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে অজ্ঞ ছিল, তখন একজন ভারতরমণীর এ সম্বন্ধে এতদূর অভিজ্ঞতা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী রমণী ছিলেন; তিনি

স্বযং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমূহ আবিষ্কার করিতেন। খনার শ্বশ্রূ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহ আকাশের নক্ষত্র গণনার জন্য রাজাদিষ্ট হইয়া বধূর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ! তখনকার দিনে গণিত ও জ্যোতিষের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এই গল্প হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একজন রমণীর পাণ্ডিত্যযশ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ইহাঁর নাম উভয়ভারতী ; ইনি লোকবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

উভয়ভারতীর স্বামী সুপণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, মণ্ডনমিশ্র ছিলেন গৃহী। শঙ্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরাস্ত হইলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মণ্ডনের শিষ্য হইবেন ; মণ্ডন বলিলেন, তিনি পরাস্ত হইলে শঙ্করের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই মহাপণ্ডিত, তাঁহাদিগের তর্কের মীমাংসা করে কে ? এত বড় পণ্ডিত আর কে আছে ? মহা বিপদ ! শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "মণ্ডনমিশ্রের পত্নী পণ্ডিতা উভয়ভারতীই এই তর্কযুদ্ধের বিচারক হউন।" কি শ্রদ্ধা ! কি সম্মান ! তর্ক চলিল, মণ্ডনমিশ্র, পত্নীর বিচারে পরাজিত হইলেন। ভারতী অকুণ্ঠিত চিত্তে শঙ্করের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিবার পর, শঙ্করকে বলিলেন, "হে শঙ্কর, তুমি স্বামীকে পরাজিত করিয়াও পূর্ণ জয়লাভ কর নাই ; স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী, সুতরাং এখন যদি এই অপরার্দ্ধকে তর্কে পরাজিত করিতে পার, তবেই তুমি সম্পূর্ণ জয়ী হইবে।" শঙ্কর হাসিলেন, স্পর্দ্ধা বটে ! আবার তর্ক চলিল, শাস্ত্রীয় সমস্যার বিরাট আলোচনার একটা কলরব পড়িয়া গেল। কত পণ্ডিত দর্শকে সভা ভরিয়া উঠিল, তাহার ঠিক নাই। শঙ্করাচার্য্য, ভারতীদেবীর পাণ্ডিত্য ও যুক্তিসমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রেও নারীর সুগভীর সাধনা ও আন্তরিক চেষ্টা উপহসিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিত।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৮২০ হইতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ। ইহা বুদ্ধ-অভ্যুদয়ের অনেক পরে। গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। অশোকের রাজ্যকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপ্রভাব। তখন কত সুপণ্ডিতা ভারতরমণী বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন, বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে তাহা .জানা যায়।

ভারতে সাহিত্য যুগ

অতঃপর ধারাবাহিক সূত্রে আমরা মহিলাপণ্ডিতার অভ্যুদয় দেখিতে পাই না। খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী সময়ে উজ্জয়িনীরাজের সভা-উজ্জ্বলকারী কবি

কালিদাসের আবির্ভাব-কালে আমরা বিদ্যাবতী রমণীগণের সহিত পরিচয় লাভ করি। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েও অনেক খ্যাতনামা কবির অভ্যুদয় দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতিই শ্রেষ্ঠ কবি। যাঁহাদের কাব্য কালের ধ্বংস উপেক্ষা করিয়া এখনও পর্য্যন্ত জগতে ভারতের সাহিত্য-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে — ইয়োরোপ পর্য্যন্ত যে যুগের কবিত্ব যশঃ সৌরভে মুগ্ধ, সেই যুগকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সাহিত্যযুগ বলা যাইতে পারে।

কালিদাসের অভ্যুদয়কাল, প্রথম হইতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে।

তখন যে নারীগণ সুশিক্ষিতা, বিদ্যাবতী, কলানিপুণা এবং সাহিত্যের উৎসাহদাত্রী ছিলেন, তখনকার কাব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠার মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ যুগেও বিদ্যাবতী রমণীগণ মনের মত বরলাভের জন্য স্বয়ম্বরা হইতেন বলিয়া কথিত। শুনা যায়, বিক্রমাদিত্যের কন্যা নাকি অতিশয় বিদ্যাবতী রমণী ছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করিবেন, তাঁহারই গলায় তিনি বরমাল্য দিবেন। কালিদাসের পাণ্ডিত্য এই সূত্রেই নাকি প্রকাশিত হয়। তিনি কবিত্বে কেবল রাজাকে নয়, রাজকন্যাকেও মুগ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তলাভ করেন। ইহা যদি-বা গল্পকথা হয়, তথাপি তখন যে বিদ্যাবতী রমণীগণের কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহা আমরা এই গল্প হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি।

নবম খৃষ্টাব্দের কবি রাজশেখর কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী কার্ণাটিবিজয়াঙ্কা নামক একজন স্ত্রী-কবির উল্লেখ করিয়াছেন। পত্নী অবন্তীসুন্দরীকে কবি অলঙ্কার শাস্ত্রনিপুণা বলিয়াছেন।

মুসলমান যুগ

এইবার মুসলমান যুগের কথা বলিব। ইহাকে আমার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ বলা যাউক। এ যুগে যুদ্ধবিগ্রহ নররক্তপাতের মধ্যে একদিকে যেমন বীর্য্যবতী রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, অপর দিকে সাহিত্যসাধিকা রমণীও নিতান্ত বিরল নহেন।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতেই ঐতিহাসিক সূত্রে আমরা মহিলাগণকে সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই।

কি আর্য্যাবর্ত্ত — কি দাক্ষিণাত্য, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই সময়ে রমণী কবির গীতাবলীতে মুখরিত। চিতোরের রাণী মীরাবাঈ-রচিত ভক্তিরসমণ্ডিত

পদাবলী রাজপুতানার মাঠে ঘাটে এখনও গীত হইতেছে।

মধ্যভারতে মালবপ্রদেশে রূপমতী ও বাজবাহাদুরের উপাখ্যান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সে দেশের অনেক প্রদেশে রূপমতী-রচিত গান এবং কবিতার আবৃত্তি এখনো চলিয়া আসিতেছে। মিথিলারাজ চণ্ডসিংহের মহিষী করমেতিবাই প্রভৃতি অন্যান্য রমণীগণ এ সময়ে স্বদেশী গীতিকাব্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহের পুরুষ-রাজকবির পার্শ্বে প্রধানাবাই নামে একজন রমণী-কবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। কাব্যরচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঞ্জোর রাজসভায় মধুরবাণী নামে একজন রমণী সভাকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত নৈষধকাব্য ও কুমারসম্ভব সে দেশে বহু প্রশংসিত। দাক্ষিণাত্যে এই সময় এক কুম্ভকার স্ত্রী-কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম মল্লী। ইঁহার রচিত রামায়ণ কাব্য সে দেশের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বিদ্যালযের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে সে সময় মোহনাঙ্গিনী, অভয়া, তাঁহার ভগিনীগণ ও নাচী প্রভৃতি আরও অনেক স্ত্রী-কবির নাম পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজও এ সময় স্ত্রী-কবি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। নবাব ওমরাহ্‌দিগের অন্তঃপুরমধ্যে তখন কাব্য- ইতিহাসের সমধিক চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। দিল্লীর সম্রাট বাবরসাহের কন্যা গুলবদন বেগম রাজ্য পরিচালনা বিষয়ে ভ্রাতা হুমায়ুনকে ত পরামর্শ দিতেনই, তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ হুমায়ুননামা গ্রন্থ তাঁহারই রচনা। নুরজাহানের বিদ্যাবুদ্ধির কথা জগদ্বিখ্যাত। কথিত আছে তিনি আতর প্রস্তুত প্রণালীর আবিস্কর্ত্রী।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা একজন সুপণ্ডিতা কবি-রমণী ছিলেন। তাঁহার খুব বড় পুস্তকাগার ছিল; ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে তাহা পূর্ণ থাকিত। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন। সমস্ত জীবনই সাহিত্য-চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, তিনি তাঁহার পিতৃশত্রু শিবাজীর অনুরাগিণী হইয়া চিরজীবন নীরবে তাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি এই কথার সাক্ষ্যস্বরূপ। কবিতার ছত্রে ছত্রে নিরাশ প্রেমের আকুলতা হাহাকার করিতেছে। জেবুন্নেসা লিখিতেছেন ;—

"প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হইয়া মরুপ্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল, — আমার ইচ্ছা হয় আমি তেমনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াই। কিন্তু আমার পা যে সরমসম্ভ্রমের শিকলে বাঁধা।

এই যে বুলবুল সারাদিন গোলাপের কাছে কাছে ঘুরিয়া তাহার কাণে কাণে প্রেমালাপ করিতেছে, এ আমারই কাছে প্রেম শিখিয়াছে।

এই যে আমার সম্মুখে কাচের ফানুসের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক, ইহার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া শত শত পতঙ্গ যে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে,

সে আত্মত্যাগ তাহারা আমার কাছেই শিখিয়াছে।

মেদিপাতার স্নিগ্ধ শ্যামলতা যেমন তাহার ভিতরে রক্তরাগকে লুকাইয়া রাখে, তেমনি আমার শান্তমূর্ত্তি আমার মনানলের জ্বলন্ত রাগ গোপন রাখিয়াছে।" ইত্যাদি। জেবুন্নেসা সপ্তদশ শতাব্দীর মহিলা।

ভারতের উত্তরদক্ষিণ প্রদেশের ন্যায় সে সময় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলও রমণী-গীতিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মুসলমান যুগেই পুরুষদিগের কণ্ঠের সহিত বঙ্গরমণীগণের কোমল কণ্ঠের গীতধ্বনি মিলিত হইয়াছে। এই গীতাবলী অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত।

আমাদের ধর্ম্মসঙ্গীতই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। মানবহৃদয়ের স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য প্রভৃতি যত কিছু অনুরাগ এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হয়। আরো স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য একটি কথা বলা আবশ্যক। ভারতের সভ্যতা — ভারতের সাহিত্য — ভারতের সমাজ — সকলই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান অধিকারে যখন ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য আক্রান্ত হইল, তখন ভারত তাহার ধর্ম্মকে আরও প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। তাই তাহার নিতান্ত দুর্দ্দিনেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে অসহায় হয় নাই। —তাহার সভ্যতা ধর্ম্মস্তম্ভের আশ্রয়ে রক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার সাহিত্য করুণ গীতিতে মনোমুগ্ধকরভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। অবৈধ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দিনের পর দিন নব নব কবি উঠিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া আপনাদের দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন, ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে জন্মান্তরের কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া সহস্র দুঃখদৈন্যের মধ্যেও সমাজকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। এইখানেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় ও ভারত সভ্যতায় প্রভেদ। তাই অধীনতার মধ্যেও ভারতের সমস্ত শক্তি লোপ পায় নাই — এই দুর্দ্দিনেও পুঞ্জীভূত ভক্তির মালা গাঁথিয়া দীনহীন ভারত আপনার সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। আর এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশই সর্ব্বাগ্রগণ্য।

বঙ্গদেশের গীতিকবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুইরকম কবিরই সমধিক প্রভাব দেখা যায়। শাক্ত শক্তির পূজক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতিজননী সেই শক্তি, — তাঁহার কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি নানা নাম। ইনি চৈতন্যময়ী, সর্ব্বশক্তিমতী, সন্তানবৎসলা। ইঁহাকেই জননীরূপে ভক্তিভরে ডাকিয়া শাক্ত-হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করে। সে কি গভীর ভক্তি! তাঁহার নিকটে দুঃখ জ্ঞাপনে কতখানি সান্ত্বনা — কত আনন্দ! যিনি শাক্তের বাণী শুনিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন। একদিন আমি শুনিলাম, আমাদের একজন দীনহীন ভৃত্য বেদনার্ত্ত হইয়া গান গাহিতেছে, "মাগো, মারবে তুমি মরব আমি, অপচ্চ হবে কার?"—সে মরিলে অপচ্চ যে তাহার মাতারই, তাহার মনে ইহাতে

সন্দেহমাত্র ছিল না।

বঙ্গদেশের শাক্তকবির মধ্যে রামপ্রসাদ যেন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার অভ্যুদয় বড় বেশীদিনের কথা নহে — অষ্টাদশ শতাব্দী মাত্র। আনন্দময়ী, গঙ্গামণি প্রভৃতি কযেকজন বিদুষী রমণী এই ভক্তিকাব্য রচনায় উচ্চে স্থান পাইয়াছেন। আনন্দময়ী-রচিত উমার বিবাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এখনকার দিনেও সেকালের রমণীদের কণ্ঠে তাহার অনেক পদ শোনা যায়।

ময়মনসিং-নিবাসী, পদ্মপুরাণ রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী-প্রণীত রামায়ণ পূর্ব্ববঙ্গে এখনো সমাদৃত।

বৈষ্ণব কবির গান, প্রেমের গান

ভগবানকে তাঁহারা প্রণয়ীরূপে ডাকেন। তাঁহাদের গীতিকবিতা ঈশ্বর-প্রেম হইলেও প্রেমিক নরনারীমাত্রেই তাহাতেই মুগ্ধ।

জয়দেবের পূর্ব্বে কোন খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় দেখিতে পাই না। জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। —গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের মধ্যে ইনি ছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইঁহার গীতগোবিন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ভক্তিভরে গীত হইয়া থাকে।

জয়দেব বাঙ্গালী হইলেও, তাঁহার কাব্যকলাপ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতিকাব্য মনোমুগ্ধকর সরল সহজ দেশভাষায়. প্রেমিক হৃদয়ের আকুল অভিব্যক্তি!

বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!

মাধুরী, ইন্দ্রমুখী, গোপী, রসময়ী, রামমণি প্রভৃতি অনেক রমণীই এই প্রেমগীতি রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়া আছেন। রামমণি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক এবং শিষ্যা ছিলেন, পরে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হন। চণ্ডীদাস রামমণিকে ভাবাবেশে কখনও গুরু, কখনও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মকে জাতিবর্ণনির্ব্বিভেদে প্রেমধর্ম্মরূপে প্রচার করেন। বঙ্গ-রমণী কবি মাধবী চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

মাধবীদেবীর পদগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্বেও পূর্ণ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিষয়, জগদানন্দের নবদ্বীপ যাত্রা, দোললীলা উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক বিষয় তাঁহার রচিত পদে পাওয়া যায়।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক রমণী-কবিই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। বৈজয়ন্তীদেবীর স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম "আনন্দ-লতিকা চম্পূ" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পত্নীকে তাঁহার পুস্তক-রচনার সহকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে প্রখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির কন্যা মানিনী-দেবীর স্মৃতিতন্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার ইঁহারই পুত্র।

পূর্ব্ববঙ্গে কোটালীপাড়ার শিবরাম সার্ব্বভৌমের যে চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে ছাত্রগণের সহিত তাঁহার কন্যা প্রিয়ম্বদাও শিক্ষালাভ করিতেন। বালিকার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক সহপাঠীর মনে পূর্ব্বানুরাগ জন্মে। ইনি ছিলেন একজন পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণসন্তান। বাংলা ভাষায় মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু বালিকা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে শিখিয়া, তাঁহার ক্ষোভের কারণ নিবৃত্তি করিল। এই পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার রঘুনাথমিশ্রের সহিতই প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয়।

মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা ও রূপকথা

আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি যে বিদুষী রমণী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন বিখ্যাত সাহিত্য-সাধিকার সহিত আমাদের দর্শনলাভ ঘটে না। — ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ে দেশে প্রেমধর্ম্মের একটা মত্ততার নূতন হাওয়া বহিয়া নরনারীর মনে যেরূপ কবিত্বরস সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, এ যুগে যে কেবল ঐরূপ অনুকূল অবস্থার অভাব এমন নহে, স্ত্রীশিক্ষারও নিতান্ত অভাব। যুদ্ধবিগ্রহে, পিণ্ডারী ও বর্গীর অত্যাচারে দেশ তখন ভীত, সন্ত্রস্ত। এই দুর্দ্দিনেও কিন্তু মেয়েরা একেবারে রচনানিবৃত্ত হন নাই; ছেলে-ভুলান ছড়া ও রূপকথার মালা গাঁথিয়াই তাঁহাদের মনের ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে দু-একটী উদ্ধৃত করিলাম—

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ল'
বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

খাজনা দিতে কাঁকন কোথা!
মা ধরেছেন কোঁকে!
রাধা ব'লে নাম রেখেছেন
জন্ম গেল দুখে। ইত্যাদি

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদী এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে
তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যে খান,
এক কন্যে গোসা করে
বাপের বাড়ী যান!
তেলিদের তেল হলুদ
মালিদের ফুল;
এমন খোঁপা বেঁধে দিব
হাজার টাকা মূল!

সম্ভবতঃ কোন রমণী বর্ষাকালে কন্যার খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে এই উদ্ভট কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ মেয়েলি ব্রতকথা, পৌরাণিক কাহিনীর মূল উপাদান লইয়া ছড়ার ছাঁদেই রচিত। পড়িতে বেশ ভালই লাগে। ছোট ছোট মেয়েরা, যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, আলিপনা পূজা—ইত্যাদি ব্রত খেলায় পুতুলখেলার মতই আনন্দ পায়।

সাতভাই চম্পা, উমনো ঝুমনো, পর পর মা গয়না পর ইত্যাদি রূপকথায়, বালক-বালিকার মন অতি সহজেই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বেদনা-সজাগ হইয়া ওঠে। উল্লিখিত ছড়া ও কথাকাহিনীগুলি যে অষ্টাদশ শতাব্দীরই রচনা, ভাষা-প্রমাণে এইরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

মেঘদূতে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘম্ শ্লিষ্ট সানুং" এই শ্লোকটির উপর ভিত্তি রচনা করিয়া নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগে কেহ কেহ বলিতে চান উজ্জয়িনী রাজার সভাকবি কালিদাস ছিলেন বাঙ্গালী। কারণ বাংলা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন বিভাগে আষাঢ়ে গগনসানুস্তরে মেঘের এরূপ ঘটা দেখা যায় না।

মহাজনের পন্থাই আমরা অনুসরণ করিলাম; ধৃষ্টতা মাপ করিবেন।

আবহমানকাল হইতে মুখে মুখে প্রচলিত এই সকল মেয়েলি রচনার অনেক রূপান্তরও ঘটিয়াছে এবং স্থান কাল ভেদে নব নব রচনাতে ইহার কলেবরও পুষ্ট হইয়াছে।

Idea-ই সাহিত্যের মূল উপাদান। মনের কোনরূপ প্রবল ভাব বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু নদীনির্ঝর যেমন সরল সুন্দর পথ না পাইলে বন্ধুর পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হয়, ভাব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এই সব মেয়েলি রচনার মধ্যে শিক্ষাসম্মার্জ্জিত ভাষার বা উচ্চাঙ্গ কবিত্বের বিকাশ না থাকিলেও, উদ্ভটভাবেই ইহা মধুর রসে ভরপুর। ইহার ভিতর যা-কিছু আছে, তার চেয়ে যা-কিছু নাই, তাহাই বেশী করিয়া অনুভব করি। যেমন—

ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না।

একটি বালিকা ময়নাপাখীকে সম্বোধন করিয়া তার মনের নিবেদন আবেদন জানাইতেছে। উক্ত ছোট্ট উক্তিটুকু হইতে বুঝা যায় যে তখনকার দিনে সতীনের জ্বালা প্রায় অনেককেই সহিতে হইত।

সঙ্গীতে যেমন কীর্ত্তনসুর, মেয়েলি-সাহিত্য ঐরূপ বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পত্তি, ইহাতে ছেলেবুড়ো উভয়েরি মন ভোলে। এই সব ছড়াকাহিনী আধুনিক উপন্যাস রচনারও অনেক উপাদান উপকরণ দিয়াছে।

তখনকার দিনে সাধারণভাবে বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপ্তি না থাকিলেও, সম্ভ্রান্ত ঘরে লেখাপড়ার একটা চালচলন ছিল। অন্ততঃ আমার ত এইরূপ অভিজ্ঞতা। যেমন বড় বাড়ী, উত্তম বসনভূষণ, তেমনি তখনকার দিনে পড়াশুনাও ছিল বোধ হয় সম্ভ্রমশীলতার একটা ছাপ।

১৩২২ সালের পুরাতন ভারতীতে আমি "সেকেলে কথা" নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি; যদি কেহ ইচ্ছা করেন ত সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন। তবে উক্ত প্রবন্ধে লিখিত বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর কথকতা এরূপ কৌতুকজনক যে, শ্রোতৃবর্গের প্রীতি-সম্পাদনার্থে সেই অংশটুকু মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদের অন্তঃপুরে সেকালেও লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজিপুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা শুভ্রবসনা গৌরী বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাংলা ভাল জানিতেন, ইহা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু

ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল। কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা না-ও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই, কিন্তু কাকিমার নিকট ইঁহার প্রভাত বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, তাহা সযত্নে স্মৃতিরুত্থিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে রয়েছেন। আহা! সারানিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন! মরি! মরি! আহা! প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে! বিহঙ্গবিহঙ্গীর কলরব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হতে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না। সূর্য্যদেব অরুণরথে সমাসীন হ'য়ে উদয় হতে ভয় পাচ্ছেন! সৃষ্টিতে প্রলয় আসে—আসে! সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন; সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণপক্ষীর স্মরণ করলেন! পক্ষী আগত হলে বল্লেন—'হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা করলে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই! হে অগতির গতি ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কার? অতএব দেব, দানব, নর ও রাক্ষস সকলের প্রতি কৃপাবান হয়ে, তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর—নচেৎ সৃষ্টি এখনই লোপ পায়!' পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান করে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাক্‌লেন—কুক্‌কুহুকু! কুক্‌কুহুকু! ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে।"

যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে লজ্জিত বোধ না করিয়া; এই সুখের মিলন ভঙ্গজনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান করিলেন, সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুটপক্ষী এখন অস্পৃশ্য এবং বিজাতীয়ের খাদ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি যে গল্পটী, হুবহু আমার খুল্লতাত-পত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে খুব ছেলেবেলার কথা, যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম।

সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত প্রাণ তখন কুক্‌কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন পাখী ডাকিয়া উঠিবে, সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখনও মনে করিয়া ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

শিল্পকলা

এখন দেখা যাক্, সেকালের মহিলাগণ কলাবিদ্যায় কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা নানারূপ চারুশিল্প—যেমন চিকণ সূচীর কাজ, বস্ত্রে ফুল তোলা, মাটির ও সোনার নানারূপ খেলনা প্রভৃতি নির্ম্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তখনকার কাঁথা এক একখানি কাশ্মীরী জামিয়ারের মতই সুন্দর ছিল। এখন আর সেরূপ সুন্দর কাঁথা দেখিতে পাই না। বয়নেও তাঁহারা নিপুণতা দেখাইয়াছেন। আসাম অঞ্চলের মেয়েরা এখনও বয়নবিদ্যার জন্য বিখ্যাত। কেবল সঙ্গীতবিদ্যা এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবগুণ্ঠনরুদ্ধ ছিল, এমন কি ঘরের পুরুষদিগের নিকটও কোন ভদ্রমহিলা তখনকার দিনে গান গাহিতেন না। কিন্তু গান গাওয়াটা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যাহার গলা নাই সেও মনের আনন্দে চীৎকার করিয়া গানের সাধ মিটায়। উক্তরূপ নিষেধবাক্যে অন্তঃপুরের সুকণ্ঠীগণের কণ্ঠ যে রোধ হইয়া গিয়াছিল এমন কথা বলিতে পারি না। অবসরকালে তাঁহারা গানের মজলিসে অন্তঃপুরকক্ষ জম-জমাট করিয়া এই নিষেধবাক্যের প্রতিশোধ লইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ গীত শিক্ষা করিতেন, বৈষ্ণবী, কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীদিগের নিকটে, এবং যাত্রাভিনয় দেখিয়া। অনেকেই তখন খুব সুন্দরভাবে গীতাভিনয় করিতে পারিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাদের পতিগণের সে অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিত কি না, সে কথা অবশ্য বলিতে পারিলাম না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের আর কুত্রাপি প্রকাশ্যভাবে গান গাওয়া রমণীগণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিবাহ-উৎসবে, মন্দিরে পূজা উপলক্ষে, শোক-প্রকাশের সময় সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহারা গান গাহিয়া থাকেন। বিবাহ-উৎসবে স্ত্রীপুরুষ দুই দলের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্ত মহিলারা প্রায়ই রাস্তাঘাটে দলে দলে গান করিতে করিতে চলিয়া যান।

আমাদের দেশে ত্রিপুরার রাজারা খুব প্রাচীন রাজা। সেকালের নাট্যকাব্যে রমণীগণের যেরূপ নৃত্যগীতের পরিচয় পাওয়া যায়, এখনো রাজমহিলাগণ সেইরূপ নৃত্যগীতকুশলা।

ইংরাজী শিক্ষার যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ইংরাজী শিক্ষার যুগ আরম্ভ। এখন ক্রমশঃ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরুষের সমকক্ষভাবে মহিলাগণ বি-এ, এম-এ উপাধি লাভ করিতেছেন। অবরোধপ্রথাও বহুমাত্রায় শিথিল হইয়া আসিয়াছে। সাহিত্যরচনায় তাঁহারা পুরুষদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছেন। কাব্য, উপন্যাস, কথকতা ও মাসিকপত্র-সম্পাদনা প্রভৃতি সাহিত্যের বহু বিভাগে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। সামাজিক ক্ষেত্রেও এখন স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ কন্যাগণ শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, ডাক্তার প্রভৃতি নানাকাজে সম্ভ্রমের সহিত জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া, কেবল নিজের নহে, পরিবারবর্গেরও অভাব মোচন করিতেছেন।

রাজনৈতিক সভামণ্ডপেও কোমলকণ্ঠের উত্তেজনা-বাণী এবং জাতীয় সঙ্গীত শ্রোতৃবর্গকে পুলক-মুগ্ধ করিয়া তোলে। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কখনও তাহা ভুলিবেন না। অধিকাংশ সভাসমিতি এখন ভারতীর বাণী ও বীণাঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠে।

হিন্দু-অন্তঃপুরেও মেয়েদের পক্ষে গান গাওয়াটা আজকাল নিষিদ্ধপদবাচ্য নহে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখন ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শিক্ষাও একটি প্রথা হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমতী প্রতিভাদেবী-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসঙ্ঘে প্রথমে ব্রাহ্মবালিকারই সংখ্যা অধিক ছিল, পরে হিন্দুবালিকাগণেও সঙ্ঘ ভরিয়া যায়।

শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণীর কর্ত্তৃত্বে এখন আর একটি সঙ্গীত সম্মিলনী স্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, স্কুলেও আজকাল বালিকাদিগকে গীতবাদ্য শিখানো হয়।

শুনা যায় আজকাল বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে বরপক্ষীয়েরা, কন্যা সঙ্গীতবিদ্যার কিছু শিখিয়াছেন কিনা, তাহা জানিতে চাহেন!

একজন হিন্দুরমণীর মুখে শুনিলাম, তাঁহার কন্যা বেশ ভাল গাহিতে পারে, তাই শ্বশুর ভাসুর পর্য্যন্ত নববধূকে কাছে বসাইয়া তাহার গান শোনেন। তাঁহারা ইহা লজ্জার কথা বলিয়া মনে করেন না।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, কোন কোন স্কুলে মেয়েদিগকে আজকাল অস্ত্রপরিচালনা-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বীরাষ্টমী উৎসব মণ্ডপে সেদিন কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা অস্ত্রখেলায় আশ্চর্য্যরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিল।

সমাজের কত পরিবর্ত্তন!

আর একটি কথা বলিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিব।

নারীজাতির একটি প্রধান কার্য্য সন্তান গঠন করা—অর্থাৎ তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা। যে সময় নারী সমাজে উপেক্ষিত, অবরুদ্ধ, শিক্ষাহীন উৎপীড়নের মধ্যে কালযাপন করিয়াছেন, তখনও তাঁহারা স্বধর্ম্ম ভুলেন নাই। তাঁহারা সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মাতা ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সমাজের সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, স্বামী এবং সন্তানের মঙ্গলকার্য্যে হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

অধিকাংশ বড় লোকের জীবনে আমরা তাঁহার মাতার প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। রামমোহন রায়ের মাতা, বিদ্যাসাগরের মাতা কিরূপ তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তাহা উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের জীবনচরিত পাঠে জানা যায়। কিন্তু পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীর জীবনী বাহিরে অজ্ঞাত। তিনিও দেবধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী একজন তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। শৈশবে বৃদ্ধা আত্মীয়াদের নিকট শুনিতাম যে, ঠাকুরমার মৃত্যুকালে আকাশে স্বর্ণ সিংহাসন দেখা গিয়াছিল, তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সেই সিংহাসনে গিয়া উঠিলেন। দেবদেবীগণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সিংহাসন বহন করিয়া অদৃশ্য হইলেন। ইহা অবশ্য কল্পনা কথা। তবে তিনি যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ছেলেবেলায় আমি তাঁর এই স্বর্গারোহণ গল্পটি বড়ই মুগ্ধভাবে শুনিতাম। পিতৃদেব যে ধর্ম্মের জন্য মহাত্যাগী হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ ইহার মূলে আমরা তাঁহার মাতাকেই কারণরূপে প্রত্যক্ষ করি।

বর্ত্তমান কালে ৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতা যে কিরূপ মহীয়সী রমণী ছিলেন সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। মাতৃবলে বলীয়ান হইয়াই স্বর্গীয় দেশপূজ্য আশুতোষ বঙ্গের বদ্ধমূল সংস্কারের উপর কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতা ৺জগত্তারিণী দেবীই দ্বিতীয়বার পৌত্রীকে সম্প্রদান করেন। শুনিয়াছি বাংলার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রাণান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও এ কার্য্য সাধিত করিতে পারেন নাই—কিন্তু মাতৃতেজে তেজস্বিতা লাভ করিয়া আশুতোষ তাহা অকুতোভয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ একাল ও সেকালের সন্ধিস্থল! নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতার অনেক ভাল জিনিষও আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহা হইবারই কথা! তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, তাহা চিরস্থায়ী—স্থানকালভেদে তাহার রূপান্তর ঘটে মাত্র। সেদিন আসিবেই আসিবে, যখন নব সভ্যতার প্রচ্ছদপটের উপর পুরাতন সভ্যতার মণিরত্নগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। এখন যাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, একদিন তাহা সত্য মহিমায় প্রতিভাত

হইবেই—যতদিন তাহা না হয়, আমরা যদি বা স্বরাজ লাভ করিতে পারি, তথাপি যথার্থ স্বাধীন জাতি হইতে পারিব না। এই গৌরবময় নবযুগের ভবিষ্যচিত্র কল্পনানেত্রে অহরহ আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

জননি গো!—একি হেরি কল্পনা-স্বপনে
যেন মহা ইন্দ্রজাল সহসা নিশার ভাল
আলোকে আলোকময় নবীন তপনে।
অপূর্ব্ব সুন্দর সবি পুরোনো গৌরব-ছবি
অভিনবরূপে আজি বিভাসিত এ নয়নে!
তব কুসন্তান যত অন্যায় অধর্ম্ম রত
এনেছে দুর্ভাগ্য যারা হীন স্বার্থ আচরণে;
নাশিতে তাদের কর্ম্ম লইয়া মহান ধর্ম্ম
শোভিছে তোমার অঙ্কে দেবাত্মা মহাত্মাগণে!
বিজ্ঞানে জগতাচার্য্য করিছে বিস্ময় কার্য্য
বিতরিছে মহাজ্ঞান ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে!
মহত্ত্বে নাহিক ছেদ নারী শূদ্রে গাহে বেদ
মানুষের অধিকার বর্জ্জিত মানুষ সনে।
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী নারীরূপে মূর্ত্তিমতী
জ্বালিছেন নব জ্যোতি তোমার এ নিকেতনে।
নারক বাল্মীকি ব্যাস কলকণ্ঠ কালিদাস
সমচ্ছন্দে পাশে বন্দে সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ মনে!
সত্য-কলি সম্মিলিত নব যুগ সমুদিত
স্বপ্ন নহে—সত্য ইহা তোমার কুমারী ভণে।

এবার উপসংহারে সকলের স্বস্তি কামনা করিয়া, এবং যাঁহারা এই অভিভাষণ রচনায় আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলাম। ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি! *

মাতৃমন্দির, ফাল্গুন ১৩৩৬

* উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সভানেত্রীর অভিভাষণ। কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০।

পরিশিষ্ট

রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র

কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুন্‌তে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী, নিরাভরণা, শ্বেতাম্বরী, ক্ষীণতনুযষ্টি, উজ্জ্বলমূর্ত্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বল্লেন মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কি মনে হয়? মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় বিচার বল্‌তে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—যেমন, রূপে, এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে—তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তা হলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়? সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রী-পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন কর্ত্তে পারচে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ কথা কেউ বল্‌বে না যে তবে তাদের লেখাপড়া শেখান বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বল্‌তে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তি চর্চ্চা করা অকর্ত্তব্য। অতএব, স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোন দরকার নেই।

আমার ত বোধ হয় না, কবি হতে ভূরি পরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যে রকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিল তা নয়। অনেক বড় কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত। স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয়নি। মনে করে দেখ, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সঙ্গীতবিদ্যা শিখ্‌চে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত পিয়ানো

ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরচে কিন্তু তাদের মধ্যে কটা Mozart কিম্বা Beethoven জন্মাল ? অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই Musician। এমন ত ঢের দেখা যায় বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এ রকম প্রতিভা কোন মেয়ে সচরাচর পায় না ? আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (energy)। তাতে অনেক বল আবশ্যক। তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে— কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাক্‌লে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চট্‌পটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষদের মত বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার ত এই রকম বিশ্বাস। তুমি বলবে এখন পর্য্যন্ত এই রকম চলে আস্‌চে— কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে। সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা আছে।

আসলে, শিক্ষা যাতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, তা কেবল বই পড়ে হতে পারে না—তা কেবল কাজ করে হয়। বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন সংগ্রাম কর্ত্তে হয়—সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম কর্ত্তে হয়—যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয় তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে। তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির আবশ্যক হয়, সুতরাং চর্চ্চা হয়, এবং সেই অবিশ্রাম আঘাতে স্নেহ দয়া প্রভৃতি কতকগুলি কোমলবৃত্তি স্বভাবতই কঠিন হয়ে আসে। মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক্— এই কার্য্যক্ষেত্রে কখনই পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে নাব্‌তে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্ব্বলতা। আর একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানব জাতি থাক্‌বে কিম্বা তার থাকবার সম্ভাবনা থাক্‌বে—ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন কর্ত্তেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ, যে এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে বুদ্ধ থাক্‌তে হয়— নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্চে যে বাহিরের কাজ মেয়েরা কর্ত্তে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে রকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই রকম দুর্ব্বল অবস্থা হয়েছে—সে কোন কাজেরই কথা নয়। কেননা গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্ত্ত তা হলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাট্‌ত কি করে ?

যদি এ কথা ঠিক হয় যে বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হয়, তবে এ কথা

নিশ্চয় যে মেয়েরা কখনই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথা থেকে হয়েছে—তার কারণ অন্বেষণ কর্ত্তে গেলে দেখা যায়—আমাদের দেশের লোকেরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে নি, এই জন্যে তাদের বুদ্ধির দৃঢ়তা হয় নি। তাদের সমস্ত মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। এক রকম আধাআধি রকমের সভ্যতা হয়েছিল। য়ুরোপের আজ যে এত প্রভাব তার প্রধান কারণ, কাজ করে তার বুদ্ধি হয়েছে—প্রকৃতির রণক্ষেত্রে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে তার সমস্ত বুদ্ধি বলিষ্ঠ হয়েছে। আমরা চিরকাল কেবল বসে বসে চিন্তা করেছি। জীবতত্ত্ববিৎ বলেন, যখন থেকে প্রাণীরাজ্যে বুড়ো আঙ্গুলের আবির্ভাব হল, তখন থেকে মানব সভ্যতার একরকম গোড়াপত্তন হল। বুড়ো আঙ্গুলের পর থেকে সমস্ত জিনিষ ধরে ছুঁয়ে ভেঙ্গে নেড়েচেড়ে আঁকড়ে আর অনুভব করে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করে দেখ্‌বার উপায় হল। কৌতূহল থেকে পরীক্ষার আরম্ভ হয়, তার পরে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হতে থাকে। এই পরীক্ষার বুড়ো আঙ্গুল পুরুষদের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার কর্ত্তে হয়। মেয়েদের তেমন কর্ত্তে হয় না। সুতরাং—।

যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, এক সময় আস্‌বে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা, উপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে সমানরূপে লিপ্ত হবে—সুতরাং তখন পরিবার সেবার অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাক্‌বার আবশ্যক হবে না—বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখোচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপ ভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন কর্ত্তে পার—কিন্তু সন্তানকে ত ছাড়বার যো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে—এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায়ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বস্‌বে তখন সমকক্ষভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়ের পক্ষে কি রকমে সম্ভব হবে? এই রকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার সেবা করা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে—এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থা-ভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাক্‌তেই হবে তখন কাজে কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর কর্ত্তেই হবে। এক সন্তান ধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে—তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার যো নেই!

অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা

আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্ব্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতা গ্রহণকে একটা ধর্ম্ম মনে করত—তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফল্‌তে পারত না—অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন কি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ব সম্পাদন কর্ত্ত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না। রাজভক্তি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়—সেগুলিকে যদি অধীনতা, হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারো অনুগামী হই, তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম্ম মনে করে যদি কারো অনুগামী হই, তা হলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে ব্যবহারের দ্বারা সে স্ত্রীর অধোগতি হয় না—বরং তার মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে, তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।

আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বল্‌চে আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়! তাতে করে কেবল এই হচ্চে যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ-বন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্চে। অথচ সে বন্ধন ছেদন করবার কোন উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে, তারা নিজেকে দাসী মনে কর্‌চে—সুতরাং তারা আপনার কর্ত্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণ ভাবে কর্ত্তে পারচে না। দিনরাত খিটিমিটি বাধ্‌চে—নানাসূত্রে পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করচে। এ রকম অস্বাভাবিক অবস্থা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তা হলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছেদ হবে কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক—তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বে পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম, তা' স্বাধীন ভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম্ম। ছোট বালকের পক্ষে পিতা মাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তার পক্ষে পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম্ম—সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের

অধীনতা কেবল তাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য, পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মত আশ্রিত হতে পারলেই ভাল থাক্‌ত কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্ত্তব্য নিয়ম উল্টে দেওয়া যায় না। যাইহোক্‌, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্ম। আজকাল এক রকম নিস্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্চে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্চে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে ত স্বামীর অধীন নয়, সে কর্ত্তব্যের অধীন।

স্ত্রীপুরুষের অবস্থা পার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত—কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড় সঙ্কোচ ভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী, এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বল্লেন—মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ কর্ত্তে পারে, তখন পুরুষ উঠে বল্‌তে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ কর্ত্তে পারত—কিন্তু তা হলে এখন পুরুষদের যে সমস্ত কাজ কর্‌তে হচ্চে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনি মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না কর্ত্তে হত, তা হলে সে পুরুষের অনেক কাজ কর্ত্তে পারত। কিন্তু এ "যদি"কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিম্বা আর কোন বিদ্রোহী রমণীর কর্ম্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।

রমাবাইয়ের বক্তৃতার চেয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠ্‌ল না। রমাবাই বল্‌তে আরম্ভ কর্ত্তেই তারা ভারি গোল কর্ত্তে লাগ্‌ল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা কর্ত্তে শুনে বীরপুরুষেরা আর থাক্‌তে পারলেন না—তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ কর্ত্তে আরম্ভ করলেন ;— তর্জ্জন গর্জ্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত ক'রে জয়গর্ব্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা কর্ত্তে লাগ্‌লুম আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে, কিন্তু ভদ্র রমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ এখনো কারো জন্মায় নি। তবে বলা যায় না,

নীচ লোক সর্ব্বত্রই আছে ; এবং নীচশ্রেণীয়-হীনশিক্ষা ভীরুদের এই একটা মহৎ অধিকার আছে যে,—পঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা অসঙ্কোচে স্নাত দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ কর্ত্তে পারে ; মনে জানে, এরূপ স্থলে সহিষ্ণুতাই ভদ্রতার একমাত্র কৌলিক ধর্ম্ম। মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবালকবর্গের প্রতি এতটা কথা বলা অসঙ্গত হয়ে পড়ে—আমি কেবল প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা বলে রাখ্‌লুম। আক্ষেপের বিষয় এই যাদের প্রতি এ কথা খাটে, তারা এ ভাষা বোঝে না, এবং তাদের যে ভাষা তা ভদ্র সম্প্রদায়ের শ্রবণের ও ব্যবহারের অযোগ্য।

পুণা।
জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৬।

শ্রীঃ—

ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬

রমাবাই

গত বারের ভারতীতে রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া সমস্তই রমাবাইয়ের জাতির উপর আক্রমণ। ইহা নিতান্তই ভুল।

লেখক রমণীগণের পুরুষ-আশ্রয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সঙ্গতবাক্য। আমাদের দেশে কোন মেয়ের দল আজ কাল নাকীসুরে "আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়"—এরূপ কথা বলিতেছেন কিনা—তাহা জানি না। কিন্তু রমাবাই তাঁহার বক্তৃতায় এরূপ ভাবের কথা বলেন নাই। রমাবাই পুরুষ-আশ্রয়ের বিপক্ষ মতাবলম্বী নহেন; পতিভক্তি অকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না—তবে আশ্রয়ের নামে যে সকল পুরুষ-অত্যাচার সমাজে অহরহঃ সংঘটিত হয়, তাহা রমাবাই মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন না। সুতরাং তাহার প্রতিকার তাঁহার বিবেচনায় অত্যাবশ্যক। আমার বিশ্বাস—ইয়োরোপ, আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার লইয়া যে মহা আন্দোলন চলিয়াছে, পুরুষ-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছাই সেই আন্দোলনের সূচনামূল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পুরুষের অত্যাচার সহিতে কুণ্ঠিত—আশ্রয় লইতে নহেন। যে দিন তাহা হইবে, সে দিন জগতে মনুষ্য জাতি লোপের সূত্রপাত হইবে—কেননা সেদিন স্ত্রীলোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিবে না, বিবাহ বন্ধনের অর্থই পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ।

আর একটি কথা, স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ—এ কথা তিনি যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা প্রসঙ্গে। তিনি বলেন শিক্ষাতেই যখন স্ত্রীলোক যথার্থ পুরুষের সহধর্ম্মিণী, সঙ্গিনী হইতে পারে—তাহার কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইতে পারে, কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার উপরই যখন জাতীয় মহত্ত্ব নির্ভর করিতেছে—তখন কেন পুরুষগণ তাহাদের শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী? তাঁহারা কি মনে করেন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন! তাহারা সর্ব্বতোভাবেই পুরুষের সমকক্ষ—কেবল মদ্যপানে নহে। ইহা হইতে এই 'সমকক্ষের' অর্থ আমরা

এই বুঝিয়াছিলাম—স্ত্রীলোকেও পুরুষের মত জ্ঞান ধর্ম্মে সমান অধিকারী। কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের জীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য আছে,—নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিতে তাহারও অধিকার আছে।

তবে লেখক উক্ত 'সমকক্ষ' কথা যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি রমাবাই তদর্থেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন—তিনি নিতান্ত একটা অপহৃত কথা বলেন নাই, সুতরাং তাহা হইলেও লেখক যত সহজে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন তত সহজে তাহা হাসিয়া উড়ান যায় না। স্ত্রীলোকের এক রকম গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তি নাই, এ কথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। ইয়োরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ কত অল্প দিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী-নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন? কাব্য উপন্যাসের বিশেষ প্রভেদ প্রধানতঃ একের ভাষা গদ্যময়—অন্যের ভাষা ছন্দময়। কবিত্ব কল্পনা ও মনুষ্য চরিত্রজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সৃজনশক্তির রূপভেদ থাকিলেও ক্ষমতার বিকাশে কেহ হীন নহে। ইহা ত গেল একটা সাধারণ কথা—কিন্তু কাব্যেও যে রমণী তাঁহার সৃজনবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, তাহাও নহে। মিশেষ হেমান্স, মিশেষ ব্রাউনিং কোন অংশেই বার্ণস্ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি নহেন, তবে রমণীদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কোন সেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তেমনি উপন্যাস-রাজ্যে কোন পুরুষ জর্জ্জ এলিয়টকে এখনো অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা নহে—স্ত্রীলোক যে বুদ্ধিতে পুরুষের অসমকক্ষ, এখন আর এমনটা নিতান্ত জোর করিয়া বলা যায় না—অন্ততঃ দু এক কথায় ইহা আর মীমাংসার বিষয় নহে। সুতরাং রমাবাইয়ের মুখে একথা অশোভন নহে, বিশেষ স্ত্রীলোকে যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের কোন পুরুষ তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হইয়া সাত সমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পারে গিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন? এখানে রমণী হৃদয় ও পুরুষের কার্য্যক্ষমতা একত্র মিলিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের শারদা-সদন তাঁহার নিজের অদম্য যত্নের ফল। তাহার নিয়মাবলী আমরা এই উপলক্ষে বামাবোধিনী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। উদ্দেশ্য—সাধারণরূপে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাবিধান, বিশেষরূপে উচ্চবর্ণের ও অন্যান্য নিরাশ্রিতা বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন, এতদুদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার "শারদা সদন" নামক বিদ্যালয় নূতন উইলসন কলেজের পশ্চাৎভাগে চৌপাটী নামক স্থানে স্থাপিত

হইয়াছে। "শারদা সদনের" কার্য্যনির্ব্বাহার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

২। নিয়ম—যে কোন বিদ্যার্থিনী বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষর-কারিণীর নামে লিখিত আবেদন পাঠাইবেন অথবা সমক্ষে যাইয়া দেখা করিবেন। সাহায্যকারীমণ্ডলীর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মত হইলে জানান যাইবে। যাঁহারা লিখিত আবেদন পাঠাইবেন, তাঁহারা নাম গ্রাম জেলা সমস্ত ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন, তাঁহাদিগকে একজন স্ত্রীলোক অথবা গাড়ী পাঠাইয়া আনান যাইবে ও পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যার্থিনী—বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চবর্ণের বিধবা ও অন্যান্য নিরাশ্রয় উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকদিগকে স্থান দেওয়া যাইবে, তৎপর অন্যান্য বিদ্যার্থিনীদিগকে গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যার্থিনীদের বয়স ২০ বৎসরের ন্যূন হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যার্থিনীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সাহায্যকারী-মণ্ডলী বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র ভাল বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাহারা গৃহীত হইবেন না।

৪। শিক্ষা—বিদ্যার্থিনীদের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে সাধারণ ও বিশেষ এই দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

সাধারণ শিক্ষা—মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সেইরূপ ব্যাকরণ, ভূগোল বিদ্যা, খগোল বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়নশাস্ত্র, বনস্পতিশাস্ত্র, প্রাণিশাস্ত্র, ভূগর্ভশাস্ত্র, আরোগ্যশাস্ত্র, শারীর-শাস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকানুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন নীতি, মর্য্যাদা, ব্যবহার, গৃহব্যবস্থা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষা—সেলাই কাজ, বুনন কাজ, উলের কাজ, চিত্র লেখা, চিনা বাসনে ছবি ও চিত্র আঁকা, মাটীর বাসন চিত্র করা, সুন্দর বাঁশের কাজ ও কিন্‌ডারগার্টেন নামক বালশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৬। বেতন—যাহারা বেতন দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট হইতে লওয়া যাইবে। যাহারা বেতন দিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে ফ্রি ভরতি করা যাইবে।

৭। নিরাশ্রয় বিদ্যার্থিনীদিগকে আশ্রয় দান—সাহায্যকারীমণ্ডলী যাহাদিগকে আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ মনে করিবেন, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক ও বিদ্যালয়ে থাকিতে দিবেন। এই প্রকার বিদ্যার্থিনীদিগের মধ্যে বিধবাদের বিষয় প্রথম বিবেচিত হইবে।

৮। বিদ্যালয়বাসিনী—যাহারা সাধারণরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভিন্ন অন্য খরচ দিতে

হইবে। যাহারা সকল খরচ দিতে সমর্থ, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই সকল খরচ গ্রহণ করা যাইবে।

৯। ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য—বিদ্যার্থিনীদের ধর্ম্মমত ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে পণ্ডিতা রমাবাই কিম্বা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিবেন। সাহায্যকারীমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজনের নাম :—রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রেনেডে (পুনা), ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডকার (পুনা), রাও বাহাদুর শঙ্কর পণ্ডিত (আহমদনগর), রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম (আহমদাবাদ), অনারেবল কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেল্যাঙ (বোম্বাই), রাও সাহেব বাবন আবজি মোদক (বোম্বাই), ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাম (বোম্বাই), ডাক্তার সদাশিব বামন কাফ (বোম্বাই)।

পণ্ডিতা রমাবাই,
বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা।

ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬

টীকা

১. Proctor, Richard Anthony, astronomer; b. Chelsea, Eng., Mar 23, 1837; ed. King's Coll., London U., 1855, St. John's Coll., Cambridge; m. Mrs. Robert J. Crawley, 1881. Came to U. S., 1881. Founder popular sci. mag. *Knowledge*, 1881. Author : *Saturn and His System*, 1865; *Handbook of the Stars*. 1866; *Half-hours with the Telescope*, 1868; etc, also numerous articles. Research on rotation of Mars; demonstrated resisting medium surrounding sun using its effect on trajectory of prominences. Died N. Y. C., Sept 12. 1888. [p. 1378]

২. Lesseps, Ferdinand Marie, b. at Versailles, France, Nov. 19, 1805. French engineer and diplomat. He was ambassador at Madrid in 1848, and was sent on a special mission to Rome in 1849 in connection with the safe return of Pope Pius IX to the Vatican. However, he is chiefly known as the planner and engineer of the Suez Canal, on which work was commenced in 1859, and which was opened in 1869. De Lesseps was organizer and supervisor of the company building the canal and raised over one hundred million francs by popular subscription in France. He afterward formed a company for the purpose of cutting a canal through the Isthmus of Panama; work on this project began in 1881. The scheme collapsed, and a judicial inquiry into the affairs of the company resulted in a prison sentence for de Lesseps in 1893, but the sentence was never carried out. Died near Paris, Dec. 7, 1894. [Vol. 2, p. 2442]

৩. অক্ষয়কুমার দত্ত : 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ। ইংরাজি ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত।

৪. Encke, Johann Franz, German astronomer; b. Hamburg, Germany, Sept 23, 1791; studied math. and astronomy under K. F. Gauss at U. Göttingen; Ph.D (hon.), Berlin University, 1825; m. Amalie Becker, Arty. officer in Napoleonic War, 1813-15; became asst. Seeberg Obs., Gotha, 1816, dir., 1822; named astronomer Berlin Acad., 1825; dir. Berlin Obs. (which was rebuilt under his direction, 1832-35), 1825-63; became prof. astronomy U. Berlin, 1844;

issued 4 vols. *Astronomische Beobachtungen*. Author : *Die Entfernung der Sonne von der Erde, aus dem Venusdurchgang von 1761 hergeleitet,* 2 vols., 1822-24; also numerous articles published as *Gesamte mathematische und astronomische Abhandlungen*, 3 vols., 1888-89. Editor : *Berliner Astronomisches Jahrbuch*, 37 vols., 1830-66. Computed orbit of comet of 1680; computed orbit and period of comet discovered by Pons in 1818 (Encke's comet); calculated solar parallex from past transit of Venus, 1761, 69; research on smaller planets, including their orbits and perturbations from larger planets. Died Spandau, Aug. 26, 1865. [p. 524]

৫. Hopkins, William, English mathematician, geologist; b. Kingston, Eng., Feb 2, 1793; grad. Cambridge U., 1827, M.A., 1830; m. Miss Braithwaite; m. 2d, Caroline Boys; pvt. tutor Cambridge U., after 1827. Recipient Wollaston medal, 1850; prize established in his honour by Cambridge Philos. Soc. Fellow Royal Soc., 1837. Pres. Geol. Soc., 1851. Author : *Elements of Trigonometry*, 1833; *Abstract of Memoir on Physical Geology*, 1836; *Theoretical Investigation of Motion of Glaciers*, 1842. Studied melting temperatures of substances under pressure, concluding that conducting power of strata or melting temperature increases with depth in earth; used astron. phenomena of precession of equinoxes to test whether earth's interior is solid or molten. Died Oct. 13, 1866. [p. 826]

৬. Thomson, Sir William, 1st Baron Kelvin of Largs, Brit. physicist; b. June 26, 1824; attended U. Glasgow, 1834-40; studied at Peterhouse, U. Cambridge, 1841-45; Fellow, 1845-52; 1873-1907; prof. natural philos., U. Glasgow, 1846-99 (resigned 1899); refused 3 times Cavendish professorship of physics at Cambridge U., knighted, 1866. Author : *Electrostatics and Magnetism*, 1874; *Mathematical and Physical Papers*, 5 vols.; *Popular Lectures and Addresses*, 3 vols. 1889-94; famous for researches in electrodynamics, thermodynamics, thermoelectricity, and properties of matter; laid foundation for theory of electric oscillations, which formed basis for wireless telegraphy; invented mirror galvanometer; studied secular cooling of earth, changes of form during rotation of elastic spherical shells; famous for dictum : "I can never satisfy myself until I can make a mechanical model of a thing." Died Dec.

17, 1907. [p. 1670]

৭. Thomson, James, Brit, engr,; b. Belfast, Ireland, Feb. 16, 1822; M.A., Glasgow (Scotland), 1839, LL.D., 1870; LL.D., Dublin, 1878; D.Sc., Queen's U., Ireland, 1875; prof. civil engineering Queen's Coll., 1857-73; prof. civil engineering, Glasgow, Scotland, 1873-‹'9. Invented Vortex water-wheel, 1850; studies on whirling fluids which lead to improvement of blowing fans, river currents, grand currents of atmospheric circulation, continuity of gaseous and liquid states of matter. Died May 8, 1892. [p. 1669]

৮. Bunsen, Robert Wilhelm, German chemist; b. Göttingen, Germany, Mar. 31, 1811; Ph.D., U, Göttingen, 1830; postgrad. (state scholar) Paris, Switzerland, Salzburg, Venice, 1832; Prof. U., Marburg, 1838-51, U. Breslau, 1851-52, U. Heidelberg, 1852-89. Honored by Deutsche Elektrochemische Gesellschaft when it changed its name to Deutsch Bunsen Gesellschaft, 1901. Fellow Royal Soc., 1858. Corr. chemistry sect. French Acad. Scis, 1853. Author : *Flammenreaktionen*, 1866. Developed spectrum analysis (with Kirchoff) 1859; outlined principles of chem. analysis by spectral methods; showed that under certain conditions each element emits definite and characteristic spectrum; conducted (with Roscoe) extensive investigations on measurements of light intensities and developed normal light unit, 1857; designed new types of lab. equipments, including gas burner, 1855, zinc-carbon galvanic battery, filter pump, 1868. Died Heidelberg, Germany, Aug 16, 1899. [p. 272]

৯. Laplace, Pierre Simon, Count, then Marquis de, French mathematician, astronomer, physicist; b. Mar. 28, 1749. Prof. math. at École militaire, Paris, 1768; prof. math., École normale, Paris. Mem., French Acad. Scis., 1773; member Académie française, 1816 (pres. 1817); Fellow, Royal Soc., 1789; grand officer, Legion of Honour. Author : *Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planetes*, 1784; *Traité de méchanique céleste*, 1799-1825; *Essai philosophique sur les probabilités*, 1814; because of his work in mathematical astronomy, has often been called the Newton of France; studied perturbations of planets and demonstrated stability of solar system; showed mean motions invariable or subject only to small periodic perturbations; discovered causes

of inequality of motions of Jupiter and Saturn; corrected Newton's theory of velocity of sound in gases; with Lavoisier, conducted experiments of specific heat and heat of combustion, showed respiration a form of combustion, and laid foundations for thermochemistry; made great contributions to theory of probability. Died Paris, France. Mar. 5, 1827. [p. 998-999]

১০. Bischof, Karl Gustav Christoph. German, chemist, geologist; b. nr. Nürnberg, Bavaria, Jan.18, 1792; m. Sophie Hesse; prof. chemistry and tech. Erlanger U., from 1819. then in Bonn, from 1822. Studied inflammable gases in coal mines; research on internal terrestrial heat. Died Bonn, Nov. 30, 1870. [p. 181]

১১. Palmieri, Luigi, Italian physicist; b. Faicchio, Italy, Apr. 22, 1807; degree in architecture, Naples, Italy. Named prof. physics Royal Naval Sch., Naples, 1845; joined staff Mt. Vesuvius Obs., 1848, became dir., 1854. Author : *Les Lois et critiques de l'électricité atmosphériques*, 1885. Invented rain gauge, seismograph, seisomometer; observed eruption of Mt. Vesuvius, 1872. Died Naples, Sept. 9, 1896. [p. 1303]

১২. Airy, George Biddell, English astronomer; born July 27, 1801, grad. Cambridge U., 1823, LL.D. 1842; D.C.L., Oxford U., 1844; LL.D., Edinburgh .U. Appointed fellow Cambridge U., 1824, Lucasian prof. math., 1826, Plumian prof. astronomy, also dir. Cambridge Obs., 1828. Author : *Report on the Progress of Astronomy*, 1832; 11 vols., including treaties on Trigonometry, circa 1825; *Partial differential Equations*, 1866, *Sound and Atmospheric Vibrations*, 1868; worked primarily in celestial mechanics, especially lunar and planetary motion; discovered Airy's spirals in connection with light polarization through quartz crystals; perfected theory of tides given by Laplace (1774), 1847; determined mass and density of earth, 1855; headed Brit. expdn. to observe transit of Venus across Sun, 1874; opposed Faraday's lines of force theory (mathematically justified by Maxwell), temporarily Kept J.C. Adams from investigations which would have led to discovery of planet Neptune. Died Jan. 2, 1892, [p. 20]

১৩. Kant, Immanuel. b. at Königsberg, in East Prussia, April 22, 1724; died there, Feb. 12, 1804. German philosopher, one of the most influential thinkers of modern times, founder of the 'critical

philosophy'. His early education was obtained in his native city, where he entered the university in 1740 and began the study of theology. Took his degree in 1755 and settled as docent at the university. In 1770 he was made professor of logic and metaphysics, a position which he held until his death. During his university career he lectured not only on logic and the various branches of metaphysics, but also, at various times, on anthropology, physical geography, and mathematics.

His real literary activity began in 1755 with the treatise on cosmic physics, *Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels* (General History of Nature and Theory of the Heavens), in which he suggested for the first time the 'nebular hypothesis' later developed by Laplace. The first of his great philosophical works, the most important in modern philosophy, appeared in 1781. This is the *Kritik der reinen Vernunft* (Critique of Pure Reason). His second great work, the *Kritik der praktischen Vernunft* (Critique of Practical Reason), appeared in 1788. Finally, the third *Critique*, an inquiry into the faculty of judgment, appeared in 1790 under the title *Kritik der Urteilskraft* (Critique of the Power of Judgment).

The heart of Kant's argument is his attempt to show that in order to constitute an awareness of objects our sensations must be organized into certain definite patterns such as space, time, quality, quantity, substance, causality, and the like, and consequently we know before we experience an object that it must exhibit these forms. From the characteristics of these forms Kant thinks he can account for the basic principles of our knowledge of the physical world, especially those of Euclidean geometry and Newtonian physics. [p. 2245, Vol.2]

১৪. Herschel, Sir William (originally Friedrich Wilhelm), Brit, astronomer; b. Hanover, Germany (then possession of George II of Eng.), Nov. 15, 1738; hon. doctorate U. Edinburgh, U. Glasgow. Musician, Hanovarian army; deserted army because of poor health and Seven Years War, smuggled himself into Eng., 1757; composer, music teacher at Doncaster, circa 1761, Halifax, 1765, Bath, 1766-82; became interested in astronomy; began to build telescopes and other instruments, 1773; made finest and most

powerful telescopic equipment of his time; discovered planet Uranus, 1781, 1st new planet to be discovered in historic times, doubled extent of known solar system; discovered 2 Uranian satellites, 1787; discovered and named 2 new satellites of Saturn, 1789; discovered over 800 double stars, showed that some of these at least are binary or phys. double-stars which rotate about each other in accord with Newton's law of gravity, thus supplied 1st direct evidence of validity of law of universal gravitation outside our solar system; 1st to suggest that sun itself moves and calculated that its motion is toward a point in constellation Hercules; catalogued and studied some 2500 nebulae and/or star clusters; author numerous papers and sci. memoirs pub. largely in *Philos. Trans. of Royal Soc.*; *Memoirs of Royal Astron. Soc.* Died Slough, Buckinghamshire, Eng., Aug. 25, 1822. [p. 791]

১৫. Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinard von., German physiologist, physicist; b. Potsdam, Germany, Aug, 31, 1821. Prof. physiology, U. Königsberg, 1849-55; prof. physiology and anatomy, U. Bonn, 1855-58; prof. physiology U. Heidelberg, 1858-71; prof. physics U. Berlin, 1871-88. Author: *Handbuch der physiologischen Optik*, 1855-66; many scientific articles, invented (independently) the opthalmoscope, 1851, and opthalmometer; investigated color vision and color blihdness, reviving Young's three color theory of vision and expanding it (now known as Young- Helmholtz theory); developed Riemann's non-Euclidean geometry; studied electrical oscillations, 1869-71; did research on theory of electrical double layer and on electrolysis; denied doctrine of "innate ideas". Died Charlottenburg, Sept, 8, 1894. [p. 782]

১৬. Clairaut, Alexis Claude, French mathematician; b. Paris, May 7, 1713. Mem. Maupertuis's expdn. to Lapland to measure a degree of meridian, 1736. Specialized in celestial mechanics, correctly determined shape of earth; connected gravity of points on surface of rotating ellipsoid with compression and centrifugal force at equator (Clairaut's theorem), 1743; calculated path of Uranus before its discovery; 1st to obtain reasonable figure for mass of Venus, 1757; calculated perihelion of Halley's comet and predicted its return, 1759. Died Paris, May 17, 1765. [p. 338]

Camus, Charles Étienne Louis, French mathematician; b. Crecy-en-Brie, France, Aug, 25, 1699; went with Maupertuis and Clairaut to measure a degree of meridian in Lapland, 1736; named royal architect, 1739. Fellow Royal Soc., 1764. His measurements of latitude showed oblateness of earth at poles. Died Paris, France, May 4, 1768. [p. 294-95]

Lemonnier, Pierre Charles, French astronomer, b. Paris, France, Nov. 23, 1715; m. Madmoiselle de Cussy; became prof. philosophy Coll. Harcourt, Paris; astronomer to Louis XV. Author : *Histoire Céléste* 1741; *Nouveau Zodiaque* 1755. Made lunar observations for 50 years; recorded observations of Uranus (before its discovery as planet); recorded Saturn's influence on Jupiter's orbit. Died Héril, nr. Bayeux, France, May 31, 1799. [p. 1024]

১৭. Outhier, Renauld, French astronomer; b. Aug 16, 1694. Mem. French Acad. Scis. (corr.) 1731, Royal Soc. Berlin. Helped verify flattening of earth at poles. Died Bayeux, France, Apr.12, 1774. [p. 1294]

Celsius, Anders, Swedish astronomer; b. Uppsala, Sweden, Nov. 27, 1701; builder and dir. Uppsala Obs., 1740; on French expdn. to measure degree of meridian in Lapland, 1736. Author : *Nova methodus distantium solis a terra determinandi*, 1730. Regarded as founder of Swedish astronomy; invented centigrade thermometer, 1742. Died Uppsala, Apr. 25, 1744. [p. 314]

১৮. La Condamine, Charles Marie de, French physicist, math. geographer; b. Paris, Jan 28, 1701; joined army at age of 17; left to study sci.; became asst. chemist French Acad. Scis., 1730; made various voyages along coasts of Africa and Asia, equatorial S. Am.; went (with Godin and Bouguer) to measure arc of meridian, Peru, 1735; made 1st sci. exploration of Amazon. Author: *Histoire des pyramides de Quito*, 1751; *Journal du Voyage fait par ordre du roi à l'Équateur,* 1751. Discovered earth to be an oblate spheroid which supported Newton's ideas; advocated inoculation against smallpox. Died Paris, Jan 28, 1774, [p. 984]

Bougeur, Pierre, French mathematician, hydrographer, born, February 16, 1698. Became professor of Hydrography, Le Havre, France, 1730; made (with Pingre, Camus, Cassini) new observa-

tions to verify meridian degree between Paris and Amiens, France, 1757. Made 1st quantitative measurements of comparative luminosities of sun and moon. Died Paris, Aug 15, 1758. [p. 217]

১৯. Bouvard, Alexis. French astronomer; b.Contamines, France, June 27, 1767; computed new tables for Uranus (previously thought to be a star) in unsuccessful attempt to settle discrepancies; 1st to point out irregularities in Uranus' orbit, 1821, (Leverrier's and Adam's discovery of Neptune, 1846, confirmed Bouvard's 1821 hypothesis); discovered 8 comets, assisted Laplace in preparation of *Traité de Mécanique Céleste* (1799-1825). Died Paris, June 7, 1843, [p. 221]

২০. Le Verrier, Urbain Jean Joseph, French astronomer; b. Saint-Lô, Normandy, France, Mar. 11, 1811. Worked at Administrn. Tobaccos. to 1836; tchr. Collège Stanislas, 1836-37; asst. in astronomy École Polytechnique, from 1837; Faculty Scis., U. Paris, from 1846; dir. Paris Obs., 1854-70, 72-77. Early sci., career in chem. research; turned to astronomy, calculated variations of planetary orbits for 200,000 year period (demonstrated stability of solar system); constructed tables of movements of sun, moon, planets (especially Mercury); postulated existence of planet between Mercury and sun (Vulcan), 1845; studied irregularities in motion of Uranus, and on basis of calculations predicted existence of unknown planet (later named Neptune); (unknown to Le Verrier) J.C. Adams in Eng. also obtained same result. Died Paris, Sept. 23, 1877. [p. 1032]

২১. Adams, John Couch, English astronomer; b. Laneast, Eng., June 5, 1819; grad, Cambridge U., 1843. Became fellow St. John's Coll., Cambridge, 1843; prof. math. St. Andrew's U. Aberdeen, Scotland, 1858-59; Lowndean prof. astronomy and geometry Cambridge U., 1859-92, dir, obs., 1861. Author : *An explanation of the observed irregularities in the motion of Uranus*, 1846; researched terrestrial magnetism, gravitational astronomy. Died Cambridge, Eng., Jan, 21, 1892. [p.11]

২২. Ptolemy, Claudius, Alexandrian astronomer, mathematician, geographer; flourished 2nd Century A.D. Author : *Almagest* (Great Collection), *Analemma*, *Planispherum*, *Optics*, *Geometry*, *Geography*. Collated, expounded math. and astronomical systems

developed by Greeks; relying on work of earlier astronomers, especially Hipparchus, and his own work, devised mathematical structures (epicycles and deferents) to predict future positions of planets; in Ptolemaic system, earth is at rest with sun, moon, planets and stars revolving about it; his *Almagest* claims only to enable prediction of future planetary positions, not necessarily to present a true picture of world; it was major work of math. astronomy until Copernicus. Also studied trigonometry, astrology, orthogonal and stereographic projection; attempted a theory of refraction; performed many optical experiments.[p. 1381]

২৩. Huygens, Christiaan, Dutch mathematician, astronomer, physical scientist; b. The Hague, Netherlands, Apr. 14, 1629; studied law and math. at Leyden and Breda. Author : *Theoremata de quadratura hyperboles ellipsis et circuli*, 1651; *Horologium Oscillatorium*, 1673; preferred Descartes's vortices to Newton's attractions and absolutes, invented pendulum clock, 1655; maintained light is wave motion in the aether, opposing Newton's corpuscular theory, 1690. Died The Hague, June 8, 1695. [p.850]

২৪. Dulong, Pierre Louis, French chemist, physicist; b. Feb. 12, 1785; practiced medicine Paris, France; later worked on botany, then chemistry in Berthollet's Lab.; research (with Petit) on refractive indices and specific heats of gases; formulated Dulong's and Petit's law that specific heats of elements are inversely proportional to their atomic weights and of the constancy of atomic heats, 1819. Died Paris, July 18, 1838 [p. 490]

Petit, Pierre, French physicist, mathematician; b. Montlucon, France, Dec. 31, 1598; moved to Paris, 1633; pupil, friend defender of Descartes; corresponded with Blaise and Étienne Pascal. Fellow Royal Soc., 1667. Author : *Sur la nature des cométes*, 1665. Inventor machine for measuring steller distances, also cylindrical adding machine. Died Paris, Aug 20. 1677. [p. 1336]

২৫. Langley, Samuel Pierpont, Am, astronomer, physicist; b. Aug 22. 1834; asst. Harvard Observatory, 1865; established Astrophysical Observatory and the Nat. Zool. Park, Washington; secy. Smithsonian Institute, Washington, from 1887. First to give clear explanation, substantiated the expt., of way in which birds can soar without

appreciable motion of their wings; carefully wrought aerodynamic principles showing how air would support thin wings of particular shapes (work theoretically correct, but used structural materials of insufficient strength, so planes were not able to make successful flights), designed a motor-driven model flying-machine which made a flight of 3000 ft. Died Feb, 27, 1906. [p. 996]

২৬. Fabricius, David (original surname Goldschmidt), German astronomer; b. Esens, Germany, Mar. 9, 1564; author : *Calendarium historicum* ..., 1590; *Letters to Kepler*, probably with Tycho Brahe (whose abilities in astron. observations Fabricius equalled) in Prague, 1597-99, 1601; criticized Kepler's finding on Mars' elliptical path; one of 1st to use telescope for observations; discovered 1st variable star, Mira Ceti, 1596; observed fixed stars. Murdered by a parishioner, Osteel, Germany, May 7, 1617. [p. 540]

২৭. Carrington, Richard Christopher, English astronomer; b. Chelsea, London, Eng., May 26, 1826; B.A., Trinity Coll., Cambridge, Eng., 1848. Observer, Durham (Eng.) U., 1849-52; built pvt. obs. at Redhill, Surrey, Eng., 1853-61. Author : *Results of Astronomical Observations Made at the Observatory of the University, Durham, from October 1849 to April 1852*, 1855. Research on motions of sun spots; 1st observation of solar flare. Died Nov. 27, 1875. [p. 304]

২৮. Stewart, Balfour, Scottish physicist, meteorologist; b. Edinburgh, Scotland, Nov. 1, 1828; Asst. to Prof. Forbes, Edinburgh U., from 1856; dir, Kew (Eng.) Obs., 1859-71., Author : *Treatise on Heat*, 1866; *The Conservation of Energy*, 1872; investigated sun spots; made calculations as to periodic irregularities in terrestrial, solar phenomena. Died Dec. 19, 1887. [p. 1610]

২৯. Wilson, Alexander, Scottish astronomer; b. St. Andrews, Scotland, 1714; M.A., St. Andrews U., 1733, M.D. (hon.) 1763. Asst. to surgeon and apothecary, London, 1737-39; 1st prof. practical astronomy U. Glasgow, 1760-84. Author : *Thoughts on General Gravitation and Views Thence Arising as to the State of the Universe.* Discovered that sun-spots are cavities in luminous matter surrounding sun, 1769. Died Edinburgh, Oct. 18, 1786. [p. 1806]

৩০. Lockyer, Sir Joseph Norman, English astrophysicist, astronomer;

b. Rugby, England, May 17, 1836. Chief of 8 Govt. eclipse expdns., 1870-1905; dir. Solar Physics Obs., South Kensington, 1885-1913. Author : *Contributions to Solar Physics*, 1873; *Star-gazing, Past and Present*, 1878; *Recent and Coming Eclipses*, 1897; pioneer in spectroscopic study of sun; discovered (with Frankland) helium in sun's atmosphere, 1868; founder editor *Nature* Journal, 1869. Died Salcombe Regis, Devon, England, Aug. 16, 1920. [p. 1058-59]

৩১. Janssen, Pierre Jules César, French astronomer; b. Paris, Feb. 22, 1824; ed.U. Paris; made various solar eclipse expdns., became prof. gen, sci., sch. architecture U. Paris, 1865; named dir. Meudon Obs., Paris, 1876. Author : *Atlas des photographies solaires*, 1904. Made spectroscopic observations of planets and sun; 1st to use photography regularly to study sun. Died Meudon, Dec. 23, 1907. [p. 874]

৩২. Gould, Benjamin Apthorp, Am. astronomer; b. Boston, Sept. 27, 1824; grad. Harvard, 1884, LL. D (hon.) 1885; Ph. D, under Gauss, U. Göttingen, 1848; LL.D., Columbia, 1887. Established and conducted *Astron. Jour.*, 1849-51, re-established, 1886; in charge of longitude dept. U.S. Coast Survey, 1852-67; organized and directed Dudley Obs., Albany, N.Y., 1855-59, prepared standard catalogue, applying for 1st time systematic corrections to various star catalogues, 1862; did greatest work in observation of stars of southern hemisphere; 1st astronomer to use telegraph in geodetic work, made 15 determinations before method introduced in Europe. Author : *Reports on the Discovery of the Planet Neptune*, 1850; *Resultados Del Observatorio Nacional Argentino en Cordoba* (most important work, contains zone catalogues giving positions of 73,160 stars and gen. catalogue of 32, 448 stars in So. hemisphere), 1876-96. Died Cambridge, Nov. 26, 1896. [p. 686]

৩৩. Gilbert (or Gilberd), William, English physician, natural philosopher; b. Colchester, Eng., May 24, 1544; A.B., St. John's Coll., Cambridge, 1560, M.A., 1564, M.D., 1569; settled in London, practiced medicine, 1573; apptd. physician to Queen Elizabeth, 1601, to James I, 1603; became fellow Royal Coll. Physicians, circa 1576. Author : *De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure*, 1600. Pioneer in study of magnetism;

showed that compus needle when freely suspended points downward towards earth (magnetic dip); showed also that there is dip effect in neighborhood of spherical magnet; held that earth was great spherical magnet and that compass points not to heavens but to magnetic poles of earth: 1st to use terms electric force, electric attraction and magnetic pole, thus is considered father of electricity; agreed with Copernicus that earth rotated on its axis. Died London or Colchester, Nov. 30, 1603. [p. 654]

৩৪. Hipparchos, Greek astronomer, mathematician; b. Nicaea, Bithynia (now Isnik, Turkey), circa 190 B.C.; made observations mainly from Rhodes. Author : *Geography, On Things Borne Down by their Weight* (both lost), a commentary on Aratus and Eudoxus. Earliest known systematic astronomer, greatest astronomer of antiquity; discovered precession of equinoxes, eccentricity of sun's apparent orbit, inequalities in moon's orbit; 1st to classify stars according to brightness; made 1st known comprehensive map of sky, listing more than 850 stars; determined parallax of moon; 1st to use latitude and longitude as designation for place; believed to have made observations and conclusions upon which Ptolemy based his geocentric theory. Died 125 B.C. [p. 806]

৩৫. Brahe, Tycho, Danish astronomer ; b. Dec. 14, 1546; studied philosophy and rhetoric U. Copenhagen, 1559-62, law U. Leipzig, 1562-65, chemistry U. Augsburg, 1569-71 or 72; became interested in astronomy, 1560; under patronage of King Frederick II built an important astron. obs. on island of Hveen (now Ven), beginning 1576, equipped it with unprecedentedly large and accurate instruments which he used to survey entire sky; settled in Prague at invitation of Emperor Rudolph II, there engaged young Johannes Kepler as his asst. Author : *Astronomiae Instauratae Progymnasmata*. 1602/3; *De Mundi Aetherii Recentioribus Phaenomenis*, 1588; *Epistolae Astronomicae*, 1596. One of the greatest naked-eye astronomers; by his systematic survey of the sky, he improved almost every important astronomical measurement, and frequently obtained results correct to within 2 minutes of arc; never accepted Copernican system; instead, created Tychonic solar system, which postulated that planets other than earth rotate around sun, and that the sun, in turn, rotates about immobile earth;

observed a nova or exploding star in constellation Cassiopeia, Nov. 1572; this, along with his study of comets, struck a blow against Aristotelian notions that heavens are perfect and unchanging. Died Prague, Oct. 24, 1601. [p. 229-230]

৩৬. Fawcett, Millicent. [Maiden name, Garrett.] b. June 11, 1847. English feminist; wife of Henry Fawcett (1833-84. English statesman and political economist). She is remembered chiefly as a leader of the woman suffrage movement (as distinct from the militant suffragettes led by members of the Pankhurst family). She was president of the National Union of Women's Suffrage Societies (1897-1918) and a founder of Newnham College at Cambridge University. Author : *Some Eminent Women of Our Time* (1889), *Women's Suffrage* (1912), *Women's Victory* (1919), and *What I Remembered* (1924). Died London, Aug. 5, 1929. [vol. 2, p. 1524]

[শুধুমাত্র স্বল্প-পরিচিত ও বর্তমানে বিস্মৃত বৈজ্ঞানিকদের জীবন ও কীর্তির আভাস দেওয়া হল। আরিস্টটল, কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মের আলোচনা করা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। এঁদের বিষয়ে প্রত্যেকেই আমরা অল্পবিস্তর জানি। Allen G. Debus সম্পাদিত বিখ্যাত বিজ্ঞান-কোষ *World Who's Who in Science* (প্রথম সংস্করণ, শিকাগো, ১৯৬৮) থেকে জীবনীগুলো নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নামের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উক্ত কোষগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করা গেল। টীকা নং ২, ১৩ এবং ৩৬ নেওয়া হয়েছে C. L. Barnhart এবং W. D. Halsey সম্পাদিত *The New Century Cyclopedia of Names* নামক অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে (প্রথম সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪)]।